পঞ্চোপাসনা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ., পিএইচ.ডি., এফ.এ.এস.

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও কারমাইকেল অধ্যাপক,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কে. এল. মুখোপাধ্যায়
৬।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

কে. এল্. মুখোপাধ্যায়, প্রকাশক

৬১।১এ বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন

কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়

নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

পরমারাধ্যা মাতৃদেবী স্বর্গীয়া কিরণশশী দেবীর
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে

ভূমিকা

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়গুলিকে সাধারণতঃ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইহাদের নাম গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর। আপেক্ষিক গুরুত্ব হিসাবে ইহাদিগের পর্যায়ক্রম তিন,—বৈষ্ণব ও শৈব প্রথম, শাক্ত দ্বিতীয় এবং সৌর ও গাণপত্য তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত। বিচ্ছিন্নভাবে এই সকল উপাসকগোষ্ঠী গণপতি, বিষ্ণু, শিব, শক্তি ও সূর্য প্রভৃতি দেবতা বা তাঁহাদের বিভিন্ন প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছিল। উপাসকেরা যেমন পৃথক্‌ভাবে নিজ নিজ ইষ্টদেবতার একভক্ত পূজক ছিলেন, তেমন আবার তাঁহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্ব স্ব ব্যবহারিক ও ধর্ম-জীবনে একত্রে, উক্ত পঞ্চদেবতার পূজাপরায়ণ ছিলেন। সুতরাং পঞ্চদেবতার উপাসকমণ্ডলী একৈকক্রমে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর বলিয়া বর্ণিত হইলেও, কালক্রমে তাঁহাদের এক বিশিষ্ট অংশ স্মার্ত পঞ্চোপাসক নামে পরিচিত হন।

বহুদিন হইতে মাতৃভাষার মাধ্যমে পঞ্চোপাসনার বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করিবার আমার ইচ্ছা ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনা করিবার সময় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ও প্রামাণিক পুরাতন সাহিত্য হইতে এতৎসম্বন্ধীয় অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশের পুরাকালের বহু দেবস্থান ও দেবমূর্তিনিচয়ের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্যও আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অখণ্ড ভারতের উল্লেখযোগ্য চিত্রশালাগুলির প্রাচীন মূর্তি ও অন্যান্য প্রত্ন-সংগ্রহ অনুশীলন করিবার সুযোগও আমি পাইয়াছিলাম। আমার *Development of Hindu Iconography* নামক গ্রন্থের দুইটি সংস্করণে এবং ইংরাজী ও বাংলা

ভাষায় লিখিত অন্যান্য প্রবন্ধাবলীতে আমি আমার সামান্য অর্জনের যৎকিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে পঞ্চোপাসনার ইতিহাস প্রণয়নের ইচ্ছা আমি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে (১৯৫৪-৫৫) ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণে প্রথম প্রকাশ করি। কিন্তু উহার পর ১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় এযাবৎ সে ইচ্ছার পূর্ণ রূপদান করিতে পারি নাই। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশমান *Journal of the Department of Letters* (New Series) এর দ্বিতীয় সংখ্যায় এই গ্রন্থের মাত্র প্রথম দুইটি অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯৫৯ সালের ৩১শে আগষ্ট অবসর গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুত কার্য সম্পাদনে তৎপর হই। আরও দ্বাদশটি অধ্যায় লিখিয়া এবং পূর্ব প্রকাশিত প্রথম দুইটি অধ্যায় পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত করিয়া চতুর্দশ অধ্যায়যুক্ত এই গ্রন্থ আমি কয়েক মাস পূর্বে প্রকাশকের হস্তে সমর্পণ করি।

বাংলা ভাষায় ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় প্রথম রচনা করেন। তাঁহার "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থ দুইভাগে বঙ্গীয়াব্দ সন ১২৭৭-৮৯ সালে (ইং ১৮৭০-৮২), কিছু কম শত বৎসর পূর্বে, প্রকাশিত হয়। ইহা বঙ্গীয় বিদ্বজ্জন সমাজের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহার আরও দুইটি পরিবর্ধিত সংস্করণ বাহির হয়। তখনকার দিনের পক্ষে ইহা সবিশেষ পর্যবেক্ষণমূলক ও তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ ছিল। দত্ত মহাশয়ের গ্রন্থের প্রথম প্রকাশের কিছু কম অর্ধশতাব্দী পূর্বে কলিকাতাস্থ এসিয়াটিক সোসাইটির তদানীন্তন মুখপত্র *Asiatick Researches*এর ষোড়শ (1828) ও সপ্তদশ (1828) সংখ্যায় হোরেস হেম্যান উইলসন মহোদয় *Religious Sects of the Hindus* সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্যপূর্ণ বৃহৎ প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধগুলি

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে *A Sketch of the Religious Sects of the Hindus* নামে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় লিখিত উপরোক্ত গ্রন্থদ্বয় মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে দত্ত মহাশয় উইলসন-প্রদর্শিত পথই অনেকাংশে অনুসরণ করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহার গ্রন্থে তিনি নিজের ব্যাপক অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণার সদ্ব্যবহার করিতে কার্পণ্য করেন নাই। এ প্রসঙ্গে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের *Hindu Castes and Sects*এর নামও করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থে হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়গুলির বিবরণ গৌণ এবং হিন্দু জাতি-বিভাগের বিবর্তনের আলোচনা মুখ্য স্থান অধিকার করিয়াছিল। উক্ত গ্রন্থাবলী বিশেষ তথ্যসমৃদ্ধ ও সুলিখিত হইলেও ইহাদিগের রচনাশৈলী পূর্ণভাবে এযুগের আদর্শরূপে গণ্য হইতে পারে না। ঐ সকল চিন্তা-শীল গ্রন্থকারগণ প্রধানতঃ সাহিত্যগত প্রমাণপঞ্জীর এবং কখনও কখনও নিজেদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অবশ্য তদানীন্তন যুগে এই জাতীয় আলোচনায় বিংশ শতাব্দীতে অনুসৃত বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োগ ব্যাপক ছিল না। এতদ্ব্যতীত প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ ব্যবহার করিবার সুবিধাও তাঁহারা পান নাই, কারণ সেযুগে এই জাতীয় প্রমাণাবলী অল্পই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা সত্ত্বেও হোরেস হেম্যান উইলসন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণ তাঁহাদের রচিত পুস্তকগুলিতে যে পরিশ্রম, সমীক্ষা ও ভূয়োদর্শনের পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন উহা আমাদিগের মনে গভীর শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ই প্রথম ইতিহাস বিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ ও সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণসমূহের তুলনামূলক বিচার করিয়া বৈষ্ণব শৈবাদি ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রামাণিক

গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার নাম *Vaisṇavism, Śaivism and Minor Religious Systems*; ইহা জার্মানীর Strassburg সহর হইতে Trübner's Oriental Seriesএ Encyclopaedia of Indo-Aryan Research (Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde) এর অন্যতম গ্রন্থরূপে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ইহা ভাণ্ডারকর ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, পুনা হইতে পুনর্মুদ্রিত হয়। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের গ্রন্থ বহু তথ্যপূর্ণ, ভাবসমৃদ্ধ ও সুরচিত ছিল, এবং এজন্য ভারততত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত সমাজে ইহা সমধিক আদর ও সম্মান পাইয়াছিল। স্যার চার্লস এলিয়ট তাঁহার তিন ভল্যুমে বিভক্ত বিরাট্ গ্রন্থ *Hinduism and Buddhism* (1921) এর দ্বিতীয় ভল্যুমের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রধান প্রধান হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করেন; তিনি অনেক ক্ষেত্রে ভাণ্ডারকরের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। এলিয়টের গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভারত-তত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের *Materials for the Study of the Early History of the Vaishṇava Sect* এর প্রথম সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ভাণ্ডারকর মহাশয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণসমূহ অংশতঃ ব্যবহৃত হইলেও, রায়চৌধুরী মহাশয়ই প্রথম বৈষ্ণব ধর্ম সংক্রান্ত এজাতীয় নিদর্শনাবলীর সহিত সাহিত্যগত প্রমাণসমূহের তুলনা করিয়া এই ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করেন। ইহার পরিমার্জিত ও বিশেষরূপে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বিদ্বজ্জন সমাজে এই গ্রন্থ প্রভূত সম্মান ও প্রশংসা লাভ করে। বম্বে হইতে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ডি. এ. পাই মহাশয়ের *Religious Sects in India among the Hindus* নামে একটি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য

ছিল এই যে ইহাতেই প্রথম সাম্প্রদায়িক চিহ্নাবলীর কতকগুলি রঙীন চিত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার Bombay, Victoria and Albert Museumএর Assistant Curator ও Secretary ছিলেন। সে সময়ে উক্ত চিত্রশালার জন্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর তিলকলাঞ্ছনাদি শোভিত অনেকগুলি মডেল সংগৃহীত হইয়াছিল। উহাদিগের অনেক কয়টির এবং 'নামম্' চিহ্নগুলির মুদ্রিত চিত্র এই গ্রন্থের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।

ভাণ্ডারকর ও রায়চৌধুরী মহাশয়ের গ্রন্থ প্রথম প্রকাশনের পর কিঞ্চিন্ন্যূন গত অর্ধশতাব্দী কালের মধ্যে কয়েকটি নূতন প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ববিদিত সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত এ জাতীয় তথ্যাবলী নূতন নূতন ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল কারণে পূর্বসূরিদিগের দ্বারা নির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া পুরাতন ও নূতন তথ্যসমূহের সাধ্যমত সদ্ব্যবহারপূর্বক আমি মাতৃ-ভাষায় পঞ্চোপাসনার ইতিবৃত্ত রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। অনেক ক্ষেত্রে আমি আমার পূর্ববর্তীদিগের মত গ্রহণ করিয়াছি, আবার কোনও কোনও স্থলে আমি তাহাদিগের মত গ্রহণ করিতে পারি নাই। যেখানে যেখানে তাঁহাদিগের সহিত আমার মত পার্থক্য হইয়াছে, সেই সেই স্থলে আমি যুক্তির দ্বারা আমার মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ আমি ইহা বলা আবশ্যক মনে করি যে যে সকল প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্যগত প্রমাণ আমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছে, উহাদের অধিকাংশই আমার পূর্ববর্তীদিগের সময়ে অপরিজ্ঞাত ছিল। আমি এখানে মাত্র একটি বিষয়ের প্রতি সহৃদয় পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'বীরবাদ' ও 'ব্যূহবাদের' সম্বন্ধে আমার মীমাংসা সম্ভবপর হইত না, যদি না আমি মোরা শিলালেখের প্রকৃত তাৎপর্য বায়ু পুরাণের একটি উক্তির সাহায্যে আমার পূর্বপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলীতে ব্যাখ্যা করিতে না পারিতাম। হিন্দু মূর্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে

আমার দীর্ঘদিন যাবং অনুশীলনও আমাকে এই গ্রন্থরচনায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও আমি অকুণ্ঠচিত্তে পূর্বসূরিদিগের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি, কারণ তাঁহারা পথিকৃৎ, মার্গপ্রদর্শক।

বিভিন্ন উপাসনা ও উপাসকদিগের কথা বলিতে গিয়া আমি প্রতি ক্ষেত্রে উপাস্য দেবতার আদি রূপ ও উহার বিবর্তন সম্বন্ধে ইতিহাস-সম্মত আলোচনা কবিয়া উহাব বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রচেষ্টায় উপাস্য দেবতানিচয়ের বাহ্য নিদর্শন-উহাদের মূর্ত ও অমূর্ত প্রতীকসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহায়ক হইয়াছে। সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রমাণপঞ্জীর সাহায্যে আমি ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়েব উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস সংক্ষেপে প্রদান করিতে প্রয়াস পাইযাছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-যোড়শ শতাব্দী পর্যন্তই এই ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; গ্রন্থের পরিসর বৃদ্ধিব ভয়ে আমি সাধারণতঃ পববর্তীকালের এ জাতীয় ইতিবৃত্ত সঙ্কলনেব চেষ্টা কবি নাই। বৈষ্ণব ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রী, ব্রহ্ম, সনকাদি, রুদ্র ও গৌড়ীয় নামক পাঁচটি প্রধান শাখার ঐতিহ্যই এ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। প্রখ্যাত মহাবাষ্ট্রীয় বৈষ্ণব সাধু নামদেব ও তুকারামের প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। তুকারাম সপ্তদশ শতাব্দীর ও নামদেব তাহাব কিছু পূর্বকালের লোক ছিলেন। মহারাষ্ট্রদেশে বৈষ্ণবধর্মমতের সম্প্রসাবণে তাঁহাদের অবদান অপরিসীম সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁহাবা কোনও বিশিষ্ট বৈষ্ণব শাখাব প্রবর্তক ছিলেন না। শৈব ধর্মসম্প্রদায়গুলির আলোচনা প্রসঙ্গে আমি কোনও কোনও ক্ষেত্রে পূর্বনির্দিষ্ট সময় সীমা অতিক্রম করিয়াছি, কারণ দক্ষিণ ভারতীয় দুই একটি শৈব সম্প্রদায় ইহাব অব্যবহিত পবে পূর্ণ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। শক্তি উপাসনার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইলেও ইহার সুগঠিত রূপ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কাজেই ইহার বিবৃতি প্রদানে আমাকে

পূর্বনির্দিষ্ট কালসীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায় দুইটির উদ্ভব ও স্থিতিকাল উপরের তিনটি সম্প্রদায়ের তুলনায় গৌণ, সুতরাং এক একটি অধ্যায়ে আমি উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতে চেষ্টা কবিয়াছি। সবশেষ অধ্যায়ে আমি অল্প পরিসরে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি ; পূর্বপ্রকাশিত এ জাতীয় গ্রন্থাদিতে এ প্রসঙ্গ আলেচিত হয় নাই। অবশ্য Farquharএর *An Outline of Religious Literature of India* এবং Monier-Williamsএর *Hindu Religious Life and Thought* নামক সুরচিত গ্রন্থদ্বয়ে এবিষয়ে কিছু আলোচনা আছে। কিন্তু আমি সবিনয়ে নিবেদন করি যে আমিই প্রথম এ প্রসঙ্গ সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণেব সাহায্যে বিস্তৃততর ভাবে অনুশীলন করিয়াছি। যে সকল সংস্কৃত শ্লোকাদি গ্রন্থমধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি উহাদের সরল বঙ্গানুবাদ দিয়াছি, মাত্র কয়েকটি সহজবোধ্য উদ্ধৃতির অনুবাদ দিই নাই। পাদটীকার ব্যবহাব খুব অল্পই কবা হইয়াছে, তবে আমার ভিন্ন ভিন্ন উক্তিব সমর্থক প্রমাণ আমি কোথাও কোথাও বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করিয়াছি। যে গ্রন্থপঞ্জী পুস্তকের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি, আমি উহার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থবাজির সাধ্যমত সদ্ব্যবহার করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠকবর্গের সুবিধার নিমিত্ত একটি বিস্তৃত বিষয়সূচী গ্রন্থারম্ভে দেওয়া হইয়াছে। ইহার শেষভাগে একটি শব্দসূচী দেওয়া হইল ; ইহা যতদূর সম্ভব পূর্ণাঙ্গ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের দ্বারা ব্যবহৃত তিলকাদি লাঞ্ছন পাঁচটি চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে, এবং এই 'নামম্' চিহ্নগুলির ঐতিহ্য ও ব্যাখ্যাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই জাতীয় গ্রন্থে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা বলা যায় না। স্বল্পপরিসর ভূমিকা মধ্যে গ্রন্থের অন্যান্য আভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি সহৃদয় পাঠকবর্গেব মনোযোগ আকর্ষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমার বিশ্বাস যে তাঁহারা

বিশ্লেষণী দৃষ্টির সাহায্যে আমার বিভিন্ন মীমাংসার যৌক্তিকতা বিচার করিবেন।

এখন আমি এই গ্রন্থ রচনা প্রয়াসের সহিত সংযুক্ত কতিপয় ভদ্র-মহোদয়ের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা কর্তব্য মনে করি। প্রথমেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও মনীষী শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়কে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। তাঁহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে এই গ্রন্থরচনায় বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছে। নূতন দিল্লীর জাতীয় চিত্রশালার প্রত্নসংগ্রহের সুযোগ্য সংরক্ষক আমার পরম প্রীতিভাজন বিশিষ্ট বন্ধু শ্রীযুক্ত সি. শিবরামমূর্তি মহাশয় আমার অনুরোধে প্রথম দুইটি চিত্রপটের চিত্রগুলি স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া এবং ঐগুলি আমার গ্রন্থে মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিয়া আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। চিত্রগুলির ব্যাখ্যান তিনি ইংরাজীতে দিয়াছিলেন; আমি উহা বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। কুশলী চিত্রশিল্পী পরম কল্যাণীয় শ্রীমনোরঞ্জন সেন ইহাদিগকে মুদ্রণোপযোগীরূপে সজ্জিত করিয়া ও শেষ তিনটি চিত্রপটের বিষয়বস্তু সযত্নে অঙ্কিত করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীমনোরঞ্জন সেন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রপটের বিষয়-গুলির কিছু অংশ ডি. এ. পাই মহাশয়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থের এবং কিছু অংশ Mrs. S. C. Belnosএর *The Sandhyā or the Daily Prayers of the Hindus* (Allahabad, 1851) এর চিত্রাবলীর আদর্শে আমার নির্দেশানুযায়ী অঙ্কিত করিয়াছেন। এজন্য উক্ত গ্রন্থ-কারদ্বয়ের নিকট আমি ঋণী। এসিয়াটিক সোসাইটির সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী সাধারণভাবে আমাকে সাহায্য করিয়া, এবং আমার প্রাক্তন ছাত্র পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান প্রতাপাদিত্য পাল এই গ্রন্থের শব্দসূচী প্রণয়নে আমাকে সাহায্য করিয়া, উভয়ে আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মলাট ও প্রচ্ছদপটের চিত্রাদির ব্লক

আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। এগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত আমার অন্য গ্রন্থ *Development of Hindu Iconography*র জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী মহাশয় আমার এই গ্রন্থের জন্য ঐগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। সর্বশেষে আমি ইহার প্রকাশক 'ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়' প্রকাশন সংস্থার সুযোগ্য স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত কানাইলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার সুদক্ষ সহকারী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র করকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁহাদের সজাগ তৎপরতা ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ে ইহার প্রকাশ সম্ভবপর হইল। নাভানা প্রেসের কর্তৃপক্ষ বিশেষ যত্নসহকারে ইহার মুদ্রণকার্য সম্পাদন করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন।

মাতৃভাষায় এজাতীয় গ্রন্থরচনায় আমার এই প্রথম প্রয়াস। সুতরাং কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। তবে সবিনয়ে নিবেদন করি যে ভাষা সম্বন্ধে আমি যথেষ্ট সজাগ থাকিতে এবং আমার বক্তব্য সহজবোধ্যভাবে বলিতে চেষ্টা করিয়াছি। বিশেষ সাবধানতা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর ও অন্যজাতীয় প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। আমি একারণ একটি শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র গ্রন্থশেষে সংযোগ করিলাম। সর্বনামের বানান সম্বন্ধে অনবধানতা বশতঃ কয়েকটি ত্রুটি লক্ষ্য করিলাম। মহেঞ্জো দরোর পরিবর্তে সর্বত্র মহেঞ্জো-ডারো ও হরপ্পা কোথাও হরপ্পা আবার কোথাও হরাপ্পা রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ ভ্রম গৌণ হইলেও না হওয়াই উচিত ছিল। বিদেশী পণ্ডিতগণের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা অক্ষরে দিয়াছি। কিন্তু Quackenbos, Fleet, Mc. Crindle প্রভৃতি কয়েকটি নাম বোধ সৌকর্যার্থে ইংরাজী অক্ষরেই লিখিয়াছি; সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করা সম্ভবপর হয় নাই। কিছু কিছু ভুল হয়ত আমার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। আশা করি সেগুলি

গৌণ ; তথাপি সেজন্য আমি কুণ্ঠিত। সর্বশেষে আমার বিনীত নিবেদন এই যে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মসম্প্রদায়গুলির ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস রচনার এই প্রচেষ্টা যদি সামান্যরূপেও ইহার পাঠকবর্গের এবিষয়ক কৌতূহল উদ্রেক ও নিরসন করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

২৮ মনোহরপুকুর রোড
কলিকাতা-২৯
"বিজয়াদশমী", ১৩৬৭

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

(বিভিন্ন তিলক চিহ্নগুলির পৃথক ব্যাখ্যা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত চিত্র-সমূহের সহিত দেওয়া হইয়াছে)

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চোপাসনার পটভূমিকা

পঞ্চোপাসনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুশীলন করিতে হইলে, যে পটভূমিকার উপর এই সকল সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। ভারতবাসীদিগের প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের সর্বপ্রথম লিখিত ইতিকথা আমরা বেদ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করি। তৎকালীন আর্যেরা যে সকল বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করিতেন, তাহার আচারানুষ্ঠান মুখ্যতঃ নানা প্রকার যজ্ঞক্রিয়ায় পর্যবসিত ছিল। নানাবিধ দেবতার উদ্দেশ্যে বিধিমতে অনুষ্ঠিত সকাম যাগ-যজ্ঞই ছিল বৈদিক ঋষি ও তাঁহাদের যজমানগণের সাধারণ ধর্মকার্য। বিবিধ অনুষ্ঠানপূর্ণ এই ধর্মাচরণকেই গীতাতে 'ক্রিয়াবিশেষবহুল' ও 'ভোগৈশ্বর্যের এবং আসক্তির অভিমুখীন' অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের ধর্মকার্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে (২, ৫৩-৪)। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আর্যদের ধর্মানুষ্ঠানের যে বিবরণ পাওয়া যায়, উহা সেকালকার সমস্ত ভারতীয়দিগের ধর্মজীবনের পূর্ণ পরিচয় নহে। ভারতবাসীদিগের ভিতরে যে প্রধান দুই ভাগ ছিল—আর্য ও অনার্য, ইহার কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। সেই সময়কার অনার্যদিগের ধর্মক্রিয়া কিরূপ ছিল তাহা সবিশেষ জানিবার প্রকৃষ্ট উপায় নাই। বেদ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহার আংশিক রূপ কখনও কখনও নির্ণয় করা যায় বটে, কিন্তু উহা অনার্যদিগের বিরুদ্ধপক্ষের দ্বারাই বর্ণিত রূপ। বৈদিক ঋষিরা অনার্যদিগকে 'রাক্ষস', 'যাতু', 'যাতুধান', 'অনাস', 'মূরদেব', 'শিশ্নদেব' ইত্যাদি নানাবিধ নিন্দাসূচক আখ্যা দিয়াছেন। সর্বশেষ আখ্যাটির অনেক আধুনিক পণ্ডিত কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা যদি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একশ্রেণীর অনার্যগণদ্বারা আচরিত একটি বিশিষ্ট ধর্ম-

কার্যের বিষয়ে আমরা কিছু জানিতে পারি। এই অনার্যেরা যে সৃজন-শক্তির মূল উৎস এক 'পিতৃদেবতা'র জননযন্ত্র (লিঙ্গ)-কে ঐশীশক্তির প্রতীক বলিয়া পূজা করিত উহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না। 'মূরদেব' কথাটির অর্থ কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত 'মূর্তিপূজক' বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই অর্থ সঠিক বলিয়া গৃহীত হইলে, সে সময়কার অনার্যদিগের মধ্যে মূর্তিপূজা যে উহাদের ধর্মকার্যের অন্যতম প্রধান অঙ্গরূপে প্রচলিত ছিল ইহা অনুমিত হইতে পারে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে পরবর্তীকালে এই দুইটি অনুষ্ঠানই বিশেষ বিশেষ ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ন্যূনাধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় প্রাক্-আর্যদিগের ধর্মজীবন সম্বন্ধে ইহাই সম্যক্ ও সবিশেষ পরিচয় নহে। আরও কিছুর ইঙ্গিত ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্যেতর, যথা—বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি,—প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা যায়। ইহারও বহুপূর্ববর্তী কালের প্রাক্‌বৈদিকযুগের এমন অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে যেগুলি হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম প্রান্তের প্রাক্ আর্য অধিবাসিগণের ধর্মজীবন সম্বন্ধে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারি। ঋগ্বেদে জুগুপ্সিত শিশ্নদেবদিগের কথা এইমাত্র বলা হইয়াছে। সিন্ধু উপত্যকায় এবং বেলুচিস্তানের নালপ্রদেশে এমন কতকগুলি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে যেগুলির 'লিঙ্গ' বা 'যোনির' প্রতীক ব্যতীত অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সঙ্গত মনে হয় না। অনেকেই স্বীকার করেন যে এইগুলি এখানকার প্রাচীন অধিবাসিগণের পূজানুষ্ঠানে ব্যবহৃত হইত। পৌরাণিক শিবের আদিপুরুষের পরিচয় আমরা এখানকারই কয়েকটি শিলমোহর হইতে প্রাপ্ত হই, এবং ইহাও অনুমান করিতে পারি যে শিশ্ন-প্রতীক (লিঙ্গ) পূজা এই কালের আদি-শিবের পূজার একটি অঙ্গ ছিল। শিবোপাসনা প্রসঙ্গে পরবর্তী এক অধ্যায়ে আলোচিত হইবে যে এই লিঙ্গ-পূজাই কি করিয়া শিব-পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল

পৌরাণিক ও তান্ত্রিক যন্ত্রপূজার (শক্তিপূজার অন্যতম অঙ্গ) আদিমতম নিদর্শন বোধ হয় সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার ছোট বড় প্রস্তরগুলিতেই দেখা যায়। আর একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানকার শিলমোহরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ নানা চিত্র ও ছোট কিংবা কিছু বড় মৃন্ময় বা প্রস্তরনির্মিত মূর্তিবিশেষ এবং অন্য বহু প্রকার নিদর্শন আমাদিগকে স্পষ্টই জানাইয়া দেয় যে সেকালের সিন্ধুতটবাসিগণ দেবতা ও দেবতা-প্রতীকসমূহের পূজা করিত। তাহাদের ধর্মকার্যে যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ার কোনও স্থান ছিল না। ইহাদের দ্বারা আচরিত পূজানুষ্ঠানই দেশের আদিম জনসাধারণের ধর্মানুষ্ঠানকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে।

আর্যদিগের ইন্দ্র, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, রুদ্র, বরুণ ইত্যাদি দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই দেবতাগুলির অনেকেই যে প্রাকৃতিক শক্তিবিশেষের স্থূল ও ব্যক্ত বা 'ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক' রূপ-কল্পনা তাহা সহজেই স্বীকার করা যায়। দেবতাদিগের উদ্দেশ্যে যজ্ঞবেদীতে প্রজ্বলিত অগ্নিমধ্যে ঘৃতসংযুক্ত সমিধ, চরু, পুরোডাশ, পশুমাংস, সোমরস ইত্যাদি খাদ্য ও পানীয় যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণ ও সামগান সহকারে উপহার প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াই যাগ-যজ্ঞের প্রধান অঙ্গরূপে পরিচিত ছিল। উক্তরূপ দেব যজন কার্যে 'ভক্তি' বা 'পূজার' ভাবের কোনও বিশেষ স্থান ছিল না বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। এই অনুমানের সমর্থক যুক্তি সম্ভবতঃ প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যের অংশগুলিতে 'ভক্তি' বা 'পূজা' বা তদর্থক কোনও শব্দের অনুল্লেখ। 'ভক্তি' কথাটি মনে হয় সর্বপ্রথম শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই পাওয়া যায়। উহার শেষ সর্গের সর্বশেষ শ্লোকটি এই :

> যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
> তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

এই একেশ্বরবাদপূর্ণ ছন্দোবদ্ধ উপনিষদের ঋষি বলিতেছেন যে 'উক্ত গ্রন্থে লিখিত তত্ত্বাদি মহাত্মাগণ কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে প্রকাশ করেন যাঁহারা দেবতাতে ও গুরুতে পরাভক্তিশীল'। এইরূপ গুণবিশিষ্ট শিষ্যেরাই উপনিষদ্ তত্ত্বগ্রহণে অধিকারী, অপরে নহেন। ভক্তি কথাটির মূলগত অর্থ হইল সত্তাবিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা সমন্বিত তীব্র আকর্ষণমূলক মনোবৃত্তি। আবার বৈয়াকরণিকদিগের মতে ভক্তির অন্যতম অর্থ দ্রব্যবিশেষের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। 'আপূপিক', 'পায়সিক', ইত্যাদি পদের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল, 'যাহাদের নিকট পিঠা (অপূপ), পায়স অত্যন্ত প্রিয়', অর্থাৎ 'যাহারা পিঠা ও পায়স এই দুটি ভক্ষ্যদ্রব্যের প্রতি অতিমাত্রায় আসক্তিপরায়ণ'। 'আপূপিক' ও 'পায়সিক' কথা দুইটির ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ভক্তিঃ' ('যাহাদের উহা ভক্তির পাত্র') সূত্র-প্রকরণে বর্ণিত আছে। কিন্তু এরূপ অর্থ যে উচ্চতর 'ভক্তি' সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে উহা বলা বাহুল্য। উক্ত সূত্রের অন্য অংশে যে ভক্তি কথাটির অন্যরূপ প্রয়োগের উল্লেখ বর্তমান তাহা আমরা 'বাসুদেব'-ভক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দেখাইব। সেখানে ভক্তি কথাটির অর্থ নিজের আরাধ্য দেবতাবিশেষের প্রতি অন্তর্নিহিত শ্রদ্ধা-সমন্বিত প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসার ভাব। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এই অর্থে ব্যবহৃত 'ভক্তি' কথাটিতে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্তমান। প্রথমটি হইল, আধ্যাত্মিক সত্তা-সম্বলিত একমাত্র আরাধ্য দেবতাতে ভক্তকর্তৃক অর্পিত আস্তিক্যবুদ্ধি; দ্বিতীয়, ভক্তের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই মঙ্গলময় দেবতার অমোঘ ইচ্ছা ও শক্তি সদাই কল্যাণপ্রসূ ও অমঙ্গলনাশক; এবং তৃতীয়, তাঁহার সহিত তাঁহার ভক্তগণের যে বন্ধন তাহা মূলতঃ ধর্মনীতিরই বন্ধন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থের প্রাচীনতম স্তরে যে বহুদেবতায় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, উহা প্রথমতঃ ভক্তি ভাবের বা উহার

প্রধানতম বৈশিষ্ট্য একেশ্বরবাদিত্বের প্রসারের পক্ষে প্রতিকূল ছিল। তবে ক্রমশঃ যে ঋষিদিগের চিত্তে এক এবং অদ্বিতীয় মহত্তম সত্তারই অস্তিত্বের আভাস জাগিয়া উঠে তাহা আমরা ঋগ্বেদের প্রথম এবং দশম মণ্ডলের কয়েকটি মন্ত্র হইতে জানিতে পারি। বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমার মতে বিপ্রগণ একই সর্বোত্তম সত্তাকে (এপ্রসঙ্গে সূর্য দেবতা ইঁহার প্রতীকরূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন) ইন্দ্র, মিত্র, অগ্নি এবং বরুণ প্রভৃতি নানাবিধ নামে বহুপ্রকারে বর্ণনা করিয়া থাকেন :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

(ঋগ্বেদ ১,১৬৪,৪৬)

এই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাই বেদান্তে ব্রহ্মন্ ও আত্মন্ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮২তম সূক্তে বিশ্বকর্মা দেবতার যে বর্ণনা দেওয়া আছে উহাও এই মন্তব্য সমর্থন করে। ভক্তির অন্য দুইটি বৈশিষ্ট্যের উপরে বর্ণিত প্রকৃতি বৈদিক দেবতাবাদে স্পষ্টরূপে বর্তমান ছিল না। ঋগ্বেদে বরুণ দেবতার বা দেবীসূক্তের বাগদেবীর কল্পনা প্রসঙ্গে আর্য ঋষির মনে ভক্তিবাদের আংশিক প্রকাশ দেখা গেলেও পরবর্তীযুগের পূর্ণ ভক্তিবাদের সম্যক্ বিকাশ তখনও হয় নাই। যাগযজ্ঞানুষ্ঠানই তখন ধর্মক্রিয়ার বিশিষ্ট অঙ্গ থাকাতে এক দেবতায় বা ঈশ্বরে ভক্তিপরায়ণ ভক্তের স্বকীয় ইষ্ট দেবতার আরাধনা বা পূজা-পদ্ধতির সম্যক্ প্রচলন হইতে পারে নাই। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ভক্তিবাদের প্রাচীন প্রকাশের সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল উহা মূলতঃ বৈদিক ধর্মাচরণে বিশ্বাসী উচ্চতর সমাজভুক্ত ভারতীয় আর্যসম্প্রদায় সম্পর্কেই প্রযোজ্য। অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের জনগণের এবং আদিম অনার্যগণের মধ্যে উহার কিরূপ বিকাশ ছিল তাহা সঠিক জানা না গেলেও কিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়। অনেক পণ্ডিত মনে করেন যে ভক্তিবাদের মূল বোধ হয়

শেষোক্ত ভারতবাসীদিগের মধ্যে নিহিত ছিল, এবং বেদবিহিত ধর্মাচরণ যখন ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্মচর্যার সহিত মিলিত হইয়া নূতন রূপ ধারণ করে তখনই ইহা কাণ্ড মূল ফলাদি বিশিষ্ট বিশাল মহীরূহে পরিণত হয়।

যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব, অপ্সর, কিন্নর প্রভৃতি 'ব্যন্তর' দেবতাগুলি ইতর সাধারণ জনেরই ভক্তি বা পূজার পাত্র ছিল; ইহা প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব অনুশীলন করিলেই অনুমান করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে 'ব্যন্তর' দেবতা বলিতে এই জাতীয় অবৈদিক দেবদেবীকেই বুঝাইত। প্রাচীন ভারতীয় লেখমালাও আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে ইহাদিগকে ভগবদাখ্যানে আখ্যায়িত করিয়া ভক্তেরা ইহাদের পূজা করিত। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত পোল বা পদম পবায়া (আগেকার নাগবংশীয় রাজাদিগের রাজধানী পদ্মাবতী) নামক স্থানে প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ ভগ্ন একটি যক্ষ মূর্তির পাদপীঠে ইহা উৎকীর্ণ দেখিতে পাই:—'গোষ্ঠ্যা মাণিভদ্রভক্তা গর্ভসুখিতা ভগবতো মণিভদ্রস্য প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপয়ন্তি'। ইহা খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লেখ বলিয়াই পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, এবং ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে ভগবান মণিভদ্রের মূর্তি তাহার ভক্ত-গোষ্ঠীর দ্বারা এস্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে যক্ষ মণিভদ্রের পূজা ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত ছিল। মথুরাতে বহু যক্ষ- ও নাগ-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, উহাদের অনেকগুলিই যে জনসাধারণের পূজার বস্তু ছিল তাহা সহজেই অনুমিত হয়। মথুরার নিকট ছারগাঁও নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি বৃহৎ নাগ-মূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কুষাণরাজ হুবিষ্কের রাজত্বকালে এই মূর্তিটি ভগবান নাগ দেবতার তৃপ্ত্যর্থে তাহার ভক্ত সেনহস্তী ও ভোনুক নামক বন্ধুদ্বয় কর্তৃক তাহাদের নিজ পুষ্করিণী পার্শ্বে প্রতিষ্ঠাপিত

হইয়াছিল। নাগ-পূজা যে পূর্বে কিরূপ প্রচলিত ছিল তাহা আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থের একটি আখ্যান হইতে জানিতে পারি। কথিত আছে যে ভগবান বুদ্ধের নিকটে তাঁহার উপদেশ গ্রহণে অভিলাষী কোনও অপরিচিত ব্যক্তির আগমন হইলে, তিনি তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেন যে সে 'নাগ' কি না। ইহাব অর্থ বোধ হয় এই যে তিনি জানিতে চাহিতেন যে আগন্তুক নাগ-পূজক বা নাগ-ভক্ত কি না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কালিয় দমনের যে আখ্যান আমরা হরিবংশ ও পুবাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাই, তাহার মূল কথা আমার মনে হয় যে তৎপ্রদেশে কৃষ্ণ-ভক্তি কর্তৃক নাগ-ভক্তির পরাজয়। প্রাচীন ভাবতে যক্ষ-নাগাদিব পূজার বহুল প্রচলনের বিষয় আরও অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে সুপ্রমাণ কবা যায়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয়-প্রথম শতকে নির্মিত ভবহুত, সাঁচী প্রভৃতির স্তূপবেষ্টনীতে উৎকীর্ণ বহুপ্রকার যক্ষ-যক্ষিনী, নাগ-নাগিনী, দেবতা-অপ্সরাব মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা এই প্রসঙ্গে শিল্পী কর্তৃক বুদ্ধানুবাগী হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অল্প অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে ইহাবাই আদিতে শিল্পীদিগের পিতৃপিতামহের, বা হয়ত তাহাদের নিজেদেবও ভক্তির পাত্র ছিল। পরে ভগবান বুদ্ধের পূজা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ব্যন্তব' দেবতাগুলিও বুদ্ধ-পূজক হিসাবে কল্পিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম দু তিনটি শতকের যে কোনও সময়ে রচিত মহামায়ূরী নামক বৌদ্ধগ্রন্থও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই গ্রন্থের মূলতত্ত্ব ভারতের (প্রধানতঃ উত্তব ভারতের) প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ স্থানের, এবং তত্তৎ স্থানেব পূজিত বাস্তু-দেবতাসমূহের নাম সঙ্কলন। অধিকাংশ বাস্তু-দেবতাই এ গ্রন্থে যক্ষ উপাধিতে ভূষিত, এবং ইহাও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত পূজার প্রতীকের যথার্থ পরিচয়। ভগবদ্গীতায় যে তামস ভক্তির উল্লেখ আছে, তাহা এই জাতীয় দেব-দেবীকেই আশ্রয় করিয়া বর্ধিত হইয়াছিল; ইহাই ভক্তির

আদিম রূপ, এবং ইহা হইতেই মনে হয় সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণ্য ধর্মগুলির ‘একভক্তি’র উন্মেষ ও বিকাশ সম্ভবপর হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে ‘নিদ্দেস’ নামে অন্যতম প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আমাদিগকে যে তথ্য প্রদান করে তাহার কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। ইহাতে একশ্রেণীর ভারতীয়দিগের ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে ‘হস্তী, অশ্ব, ধেনু, সারমেয়, বায়স, বাসুদেব, বলদেব, পূর্ণভদ্র, অগ্নি, নাগ, সুপর্ণ, যক্ষ, অসুর, গন্ধর্ব, মহারাজ, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দেব, দিসা, ইত্যাদির ভক্তের নিকট তত্তৎ বিভিন্ন সত্তাই পূজা ও ভক্তির পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইত।’ এই পূজাপাত্রের তালিকাটি একটু মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিলেই দেখা যায় যে বাসুদেব বলদেবাদির ভক্তগণকেও (ইহারা পরবর্তীকালের বৈষ্ণবদিগের আদি পুরুষ) হস্তী, অশ্ব, ধেনু, সারমেয়, বায়সাদির পূজকগণের সঙ্গে এক পর্যায়ে ফেলা হইয়াছে। শেষোক্ত ভক্তগোষ্ঠী যে আদিম স্তরের, এবং তাহাদের দ্বারা আচরিত animism-সংশ্লিষ্ট এই ভক্তির রূপই যে বাসুদেবাদির ভক্তগণকে নিজ নিজ বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ করিয়া তুলে, সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। হস্তী অশ্বাদিরূপে কল্পিত বিভিন্ন দেবতাই আদিম ভারতীয় উপাসকবৃন্দের অপরিশোধিত ভক্তির আধার ছিল,—পরে যখন ভিন্ন ভিন্ন উপাসকসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও বিকাশ সাধিত হয়, তখন হস্তী, অশ্ব, সারমেয়াদির কোন কোনোটি শেষোক্ত উপাসকগণের পূজার দেবতার বাহনরূপে পরিকল্পিত হইতে থাকে। যেমন সুপর্ণ অর্থাৎ গরুড বাসুদেব-বিষ্ণুপূজকের দেবতার বাহন, হস্তী ইন্দ্রের বাহন, সারমেয় বটুক ভৈরবের বাহন, অশ্ব সূর্যের বাহন, ইত্যাদি। যক্ষ, নাগ, গন্ধর্বাদির পূজকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। ‘মহারাজ’ বলিতে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বর্ণিত প্রধানতঃ চারিটি লোকপাল অথবা দিকপালকেই বুঝাইত। ইহারা যথাক্রমে উত্তরদিক্‌পতি যক্ষরাজ কুবের, পূর্বদিক্‌পতি গন্ধর্বরাজ ধৃতরাষ্ট্র,

দক্ষিণদিক্‌পতি কুম্ভাণ্ডদিগের রাজা বিঢ়ূদভ এবং পশ্চিমদিকপাল রক্ষ-রাজ বিরূপাক্ষ। পাণিনির অন্যতম সূত্র 'মহারাজাট্ঠঞ্' হইতে 'মহারাজিক' এই পদের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। 'মহারাজিক' শব্দের অর্থ 'মহারাজদিগের' ভক্ত, এবং মহারাজ বলিতে যে উপর্যুক্ত চারিটি লোক-পালকেই নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা একরূপ সুনিশ্চিত। ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মা, রুদ্র, ইঁহারা বেদ ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত ভারতীয় আর্যদিগেব দেবতা; তাঁহাদের মধ্যে দু একটির রূপকে কেন্দ্র করিয়াই যে পৌরাণিকযুগে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত উপাসকসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চোপাসনার অন্যতম একটি যে সৌবসম্প্রদায় কর্তৃক আচরিত সূর্যোপাসনা ইহা সকলেই জানেন, এবং ইহা ভারতবর্ষে বহু প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রের এবং অন্যান্য গ্রহাদির পূজা ইহারই অন্তর্ভুক্ত, সেজন্য চন্দ্র-পূজক বলিয়া কোনও পৃথক্ গোষ্ঠী নাই। বেদেব অন্যতম প্রধান দেবতা ইন্দ্র মহাকাব্য পুরাণাদিব যুগেও তাঁহার 'দেবরাজ' খ্যাতি হইতে বঞ্চিত হন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে কোনও বিশেষ ভক্তগোষ্ঠী স্থায়ীভাবে গঠিত হয় নাই ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। 'ব্রাহ্মণ' গ্রন্থাদিতে বর্ণিত ব্রহ্মার সম্বন্ধেও এই উক্তিই প্রযোজ্য। তবে ইহা একেবারে অসম্ভব নাও হইতে পারে যে নানাবিধ ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়েব উন্মেষ ও বিকাশের কালে ইন্দ্র ব্রহ্মাদি বৈদিক দেবতাব বিশিষ্ট পূজা প্রবর্তনেব চেষ্টা ভারতের কোনও কোনও অংশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর ভারতেব অংশবিশেষে যে ইন্দ্র-পূজার প্রচলন ছিল তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। মধ্য- ও পশ্চিম ভারতের কোনও কোনও স্থানে ব্রহ্মা-পূজকদিগের অস্তিত্বেব সন্ধান পাওয়া যায়। এখনও রাজস্থানের আজমীর প্রদেশস্থিত পুষ্করে ব্রহ্মার বিশাল মন্দির এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুষ্কর যে অতি প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র তাহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয়

শতকের পশ্চিম ভারতের অংশবিশেষের শাসনকর্তা খহরাত মহাক্ষত্রপ নহপানের জামাতা শক উষভদাতের (ঋষভদত্ত) নাসিক শিলালিপি হইতে প্রমাণিত হয়। আদি মধ্যযুগের আরও অল্প কয়েকটি ব্রহ্মা-মন্দিরের অস্তিত্বের কথা আমরা অন্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে জানিতে পারি। এই সব মন্দিরের গর্ভগৃহে স্থিত ব্রহ্মা-মূর্তির প্রতিষ্ঠাধিকারী সম্বন্ধে বৃহৎসংহিতাকার বরাহমিহির বলিতেছেন যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরাই ব্রহ্মার মূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী। এপ্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিতেছেন যে বিপ্রগণ নিজবিধি অনুসারে এই প্রতিষ্ঠাকার্য করিবেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের স্ববিধির ব্যাখ্যানকল্পে বৃহৎসংহিতার ভাষ্য-কার উৎপল বলিয়াছেন যে বেদ বিহিত কর্মই এই বিধি। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে এক সময়ে ব্রহ্মাকে আশ্রয় করিয়া অন্যান্য ভক্তসম্প্রদায়ের অনুরূপ সম্প্রদায় গঠনের চেষ্টা শুদ্ধ বেদাচারী-দিগের দ্বারা প্রবর্তিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে ইহা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য সম্প্র-দায়াদির ভক্তির দেবতার মত বৈশিষ্ট্যমূলক প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মা প্রজাপতি পৌরাণিক যুগের ব্রাহ্মণ্য হিন্দুগণের ধর্মজীবনে আদৌ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। এই অবিসম্বাদী সত্যটিরই একটি বিকৃত রূপ আমরা শৈবদিগের মধ্যে প্রচলিত একটি উপাখ্যান হইতে প্রাপ্ত হই। ইহা শিবের লিঙ্গোদ্ভব মূর্তির আবির্ভাব সম্পর্কে শৈব পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে। আখ্যানটি এই প্রকার. একবার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মধ্যে তর্ক হয় যে তাহাদের মধ্যে কে বড় এবং এই জগৎ-প্রপঞ্চের প্রকৃত স্রষ্টা ব্রহ্মা না বিষ্ণু। দেবতাদ্বয় যখন এইরূপ কলহে নিরত ছিলেন, তখন সহসা তাঁহাদের সমক্ষে অপার্থিব জ্যোতি-বিচ্ছুরণকারী এক বিশাল স্তম্ভের আবির্ভাব ঘটে। ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এই অগ্নিময় স্তম্ভটির যথাক্রমে শীর্ষ ও অধোদেশ (আদি ও অন্ত) নির্ধারণে যত্নবান্ হ'ন। বলা বাহুল্য যে এ প্রচেষ্টায় তাহারা সফলকাম হন নাই।

বিষ্ণু সাধুতার সহিত তাঁহার অকৃতকার্যতার কথা স্বীকার করেন, কিন্তু ব্রহ্মা মিথ্যা নিদর্শন দেখাইয়া বিষ্ণুকে বলেন যে তিনি স্তম্ভের শীর্ষদেশ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। এই সময়ে স্তম্ভ-মধ্য হইতে মহাদেবের আবির্ভাব হয় এবং তিনি উভয়কেই বুঝাইয়া দেন যে তিনিই দেবাদিদেব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রকৃত সৃজন পালন ও সংহার কর্তা। বিষ্ণুর সত্যভাষণে তিনি অত্যন্ত প্রীত হন এবং বিষ্ণু যে তাঁহার ন্যায় জনগণের ভক্তির পাত্র হইবেন এবং বিষ্ণুকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে তাহার নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্রহ্মার অসত্যভাষণে ও কপটাচরণে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি ব্রহ্মাকে অভিশাপ দেন যে ব্রহ্মার একভক্ত বা ঐকান্তিক পূজক জগতে কেহ থাকিবে না, এবং তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া কোনও ভক্তসম্প্রদায় গঠিত হইবে না। ইহাই হইল শৈব পুরাণাদিতে বর্ণিত ব্রহ্মা-পূজক সম্প্রদায় গড়িয়া না উঠিবার কাল্পনিক কারণ। তবে এই ব্রাহ্মণ্য দেবতা যে পৌরাণিক যুগের হিন্দুদের নিকট সাধারণভাবে শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, উহা আমরা তৎকালীন 'ত্রিমূর্তি' কল্পনায় (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব : স্রষ্টা-পাতা-সংহারকর্তা) তাঁহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে বুঝিতে পারি। কিন্তু মহাকাব্য পুরাণাদিতে লিখিত বহু আখ্যান হইতে ইহাও স্পষ্ট যে শৈব, বৈষ্ণব, শাক্তাদি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু জনগণের নিকট, তাঁহার স্থান বহুলাংশে গৌণ। তিনি 'প্রজাপতি,' ইহা 'ব্রাহ্মণ' যুগে তাঁহার অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্বের জের,—এবং এজন্যই তাঁহাকে স্রষ্টারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দুর নিকট সত্যকারের স্রষ্টা তিনি ন'ন। শিব, বিষ্ণু, শক্তি আদি বিশিষ্ট দেবতাই তত্তৎ ভক্তগণের নিকটে আদি স্রষ্টা রূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং এই সকল আদি দেবতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই যেন ব্রহ্মা সৃজনকার্যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

'নিদ্দেস' গ্রন্থের উপরে উদ্ধৃত অংশে শিবের নাম না থাকিলেও আমরা তাঁহাকে তথায় 'দেব' নামে অভিহিত দেখিতে পাই। এখানে

যে 'মহাদেব'-কে সংক্ষিপ্ত করিয়া 'দেব' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। বাসুদেব বলদেবাদির ভক্ত হিসাবে যেখানে তৎকালীন বিষ্ণুপূজকদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানে 'দেব'ভক্তের নামে শৈবদিগকে নির্দিষ্ট করা স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থানে 'দেব' 'শিব' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রধান দুইটি ধর্মসম্প্রদায়ের তৎকালীন অস্তিত্বের বিষয় আমরা এই সুপ্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থ (খৃষ্টপূর্ব যুগের) হইতে অনুমান করিতে পারি। নাগ যক্ষাদি ও সূর্যোপাসকদিগের নামও যে ইহাতে বলা হইয়াছে, উহা একটু আগেই দেখানো হইয়াছে। নাগ- ও যক্ষ-পূজকগোষ্ঠীর অন্যতম পবিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ যে কালক্রমে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন গাণপত্য সম্প্রদায়ের আকার ধারণ করিয়াছিল, উহা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। তাহা হইলে ইহা প্রমাণিত হইল যে 'পঞ্চোপাসনা'র অন্ততঃ তিনটির (বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর) উল্লেখ নিদ্দেস গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে। গাণপত্যের নাম এখানে না থাকিলেও উহার আদিরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত রহিয়াছে। কেবল 'শক্তি' বা 'দেবী' পূজার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ এখানে পাওয়া যাইতেছে না। কিন্তু ইহা হইতে অনুমান করা সঙ্গত হইবে না যে শক্তি-উপাসনা সুপ্রাচীন নহে। পরবর্তী যে অধ্যায়ে শক্তিপূজার ঐতিহ্য আলোচিত হইবে, সেখানে ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা হইবে। যে কারণেই হউক 'নিদ্দেসকার' ইহার কথা বলেন নাই। বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অনেকের ধারণা যে এই গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব যুগের (২য় বা ৩য় শতকের) রচনা। 'পঞ্চোপাসক' সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কয়েকটির অভ্যুত্থান যে ইহারও বহুপূর্বে আরম্ভ হইয়াছিল উহা আমরা সেগুলির ইতিহাস ও ক্রমবিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে দেখাইব।

অধ্যায় শেষে ইহার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন যে ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি সাধারণতঃ কোনও বৈদিক দেবতাবিশেষকে আশ্রয়

করিয়া আত্মপ্রকাশ করে নাই। শিব ও যক্ষনাগাদি লৌকিক দেবতা-গোষ্ঠী বা বাসুদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতানিচয়কে কেন্দ্র করিয়াই এই সকল উপাসকমণ্ডলী ক্রমশঃ গঠিত হয়। খৃষ্টপূর্ব যুগের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি নানাবিধ দেবতাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভাষ্যে পাণিনিব অন্যতম সূত্র 'দেবতা দ্বন্দে চ' (৬, ৩, ২৬) ব্যাখ্যা করিবার কালে এই বিভাগ দুইটির 'বৈদিক' ও 'লৌকিক' নামকরণ করিয়াছেন। প্রথমটির উদাহরণ-স্বরূপ তিনি ব্রহ্মা ও প্রজাপতির নাম করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় বিভাগ-ভুক্ত দেবতাগণের মধ্য হইতে শিব ও বৈশ্রবণ (যক্ষপতি কুবেরের অন্য নাম)-কে বাছিয়া লইয়াছেন। ব্রহ্মা-প্রজাপতিকে কেন্দ্র করিয়া কোনও ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠে নাই, কিন্তু শিব ও গণপতিকে (পরবর্তী অধ্যায়ে এই গণপতিই যে যক্ষনাগের সংমিশ্রণ সে কেথা বলা হইবে) কেন্দ্র কবিয়া ভক্ত সম্প্রদায় সংগঠিত হয়। বাসুদেব-কৃষ্ণ প্রভৃতি মহামানবগণও তাঁহাদের পূতচরিত্র ও কর্মগুণে দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন এবং তাঁহাদের ভক্তমণ্ডলী বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় রূপে পরিগণিত হন। পতঞ্জলির সময়ে ধনপতি (কুবের), রাম (বলরাম) এবং কেশবের মন্দির নির্মিত হইত, এবং এই সব মন্দিরে বিভিন্ন দেবতার ভক্তগণ সমবেত হইয়া বাদ্যভাণ্ড সহকারে নিজ নিজ উপাস্য দেবতার আরাধনা করিতেন (৪র্থ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। ধনৈশ্বর্যের দেবতা কুবের এবং শ্রীলক্ষ্মীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে যে নিধিধ্বজ উত্থাপিত হইত উহা আমরা খৃষ্টপূর্ব ২য়-৩য় শতকের একটি নিদর্শন হইতে জানিতে পারি। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম মহোদয় প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা) একটি কিঞ্চিৎ ভগ্ন নারীমূর্তি এবং বটবৃক্ষেব আকারবিশিষ্ট প্রস্তরনির্মিত একটি স্তম্ভশীর্ষ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এ দুটিই এখন কলিকাতাস্থ ভারতীয় চিত্রশালায় Indian Museum, Calcutta) রক্ষিত আছে। মূর্তিটি যে

শ্রীদেবীর এবং স্তম্ভটি যে তাঁহার বা তাঁহার অনুগৃহীত যক্ষপতি কুবের-বৈশ্রবণের মন্দিরের ধ্বজস্তম্ভ উহা আমি অন্যত্র প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি (*Development of Hindu Icnography*, 2nd Edition, pp. 105, 195, 374) ।

ধর্মসম্প্রদায়গুলির ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আরও একটি তথ্যের উল্লেখ প্রয়োজন। বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠাপন সংক্রান্ত অধ্যায়ে (সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, ৫৯ অধ্যায়) বৈষ্ণব, সৌর, শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্ম, এবং জৈন সম্প্রদায়সমূহের প্রধান প্রধান দেবমূর্তিগুলির বিভিন্ন মন্দিরের গর্ভগৃহসমূহে প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে কয়েকটি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া আছে। বরাহমিহির বলিতেছেন :

> বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্।
> মাতৃণামপি মণ্ডলক্রমবিদো বিপ্রান্ বিদুর্ব্রহ্মণঃ॥
> শাক্যান্ সর্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু-।
> র্যে যং দেবমুপাশ্রিত্য স্ববিধিনা তৈস্তস্য কার্যা ক্রিয়া॥

ইহার অর্থ, 'বিষ্ণুর (মূর্তি) ভাগবতগণ, সূর্যের মগেরা, শিবের (মূর্তি-শিবলিঙ্গ) ভস্মমণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ (অর্থাৎ পাশুপতেরা), মাতৃকাদিগের মণ্ডলক্রমবিদ্গণ (অর্থাৎ শাক্তেরা), ব্রহ্মার বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, সর্বহিতকারী প্রশান্তমন দেবতার (অর্থাৎ বুদ্ধের) শাক্যগণ (বৌদ্ধেরা), জিনদিগের দিগম্বর জৈনগণ---এই বিভিন্ন মূর্তিসকল তত্তৎ দেবতা-পূজকেরা সেই সেই দেবতা-মূর্তির (প্রতিষ্ঠা) ক্রিয়া নিজ নিজ সম্প্রদায় নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী করিবেন'। উৎপলাচার্য এই শ্লোকটির উপর যে ভাষ্য করিয়াছেন, উহা হইতে জানা যায় যে ভাগবতেরা পাঞ্চরাত্র বিধি অনুসারে বিষ্ণুর, মগদ্বিজেরা সৌরদর্শন বিধানানুযায়ী সূর্যের, পাশুপতেরা বাতুলতন্ত্র বা অন্য শৈবতন্ত্রনির্দেশানুসারে শিবের, (তান্ত্রিক) পূজাক্রমবিদ্ (শক্তি-পূজকগণ) নিজ নিজ কল্পবিহিত ব্যবস্থানুযায়ী

বিভিন্ন দেবীমূর্তির, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বেদোক্ত বিধিদ্বারা ব্রহ্মার, বৌদ্ধেরা পারমিতাক্রমানুসারে বুদ্ধের এবং জৈনেরা জৈনদর্শনানুযায়ী জিনদিগের মূর্তিসকল প্রতিষ্ঠা করিবেন। বৃহৎসংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী এবং উৎপল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক ছিলেন। ধর্মসম্প্রদায়গুলির উপরিলিখিত সংক্ষিপ্ত তালিকা হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে ব্রাহ্মণ্য পঞ্চোপাসনার মধ্যে অন্ততঃ চারিটির, যথা বৈষ্ণব, সৌর, শৈব এবং শাক্তের, সম্যক প্রচলন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে হইয়াছিল। গণপতির পূজা সে সময়ে কোনও না কোনও প্রকারে বর্তমান থাকিলেও, একটি বিশিষ্ট উপাসক সম্প্রদায় হিসাবে গাণপত্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব তখনও হয় নাই। ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করিয়া একটি পৃথক উপাসকমণ্ডলীর প্রবর্তন করিবার প্রচেষ্টার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার উল্লিখিত উদ্ধৃতি হইতে এ অনুমান কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয়। তবে সে প্রচেষ্টা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। ইহাও লক্ষ্য করিবার যোগ্য যে বৃহৎসংহিতাকার ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির সমপর্যায়ে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় দুটিকেও ফেলিয়াছেন। ইহাতে কোনও অসামঞ্জস্য হয় নাই, কারণ এই দুটি সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণের ধর্মাচরণের মূলসূত্র ছিল ভক্তিবাদ, এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মূর্তিপূজন ছিল তাহাদের অন্তর্নিহিত ভক্তির বাহ্য প্রকাশ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গণপতি—গাণপত্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে যদিও লম্বোদর গজাননের একাগ্নিকী পূজা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, এবং তাঁহার একভক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ভারতের আর তিনটি ব্রাহ্মণ্য উপাসক সম্প্রদায়ের মত শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই, তথাপি ইহা সত্য যে গুপ্তযুগের শেষভাগ হইতে তাঁহার পূজা সাধারণভাবে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রচলিত হয়। এদেশে এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতার পূজা প্রচলনের অনতিকাল পরেই ইহা চীন, জাপান, কাম্বোজ, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশে ন্যূনাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। আদিম যক্ষ নাগাদি 'ব্যন্তরদেবতার' পূজার সহিত ইহার প্রকৃতিগত ঐক্য ছিল প্রথম ও প্রধান কারণ। ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে গণপতি বৃহস্পতি বা ব্রহ্মণস্পতি দেবতার নামান্তর। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যখন 'গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে' (ঋগ্বেদ, ২, ২৩, ১৯) বলিতেছেন, তখন যে তিনি প্রমথাধিপ, প্রলম্বজঠর গজমুখ দেবতার কথা ভাবিতেছেন না ইহা সুনিশ্চিত। বেদের গণপতি বিদ্যার ও বিদ্বান পণ্ডিতের দেবতা, প্রাকৃত জনের নহেন। কিন্তু পৌরাণিক গণপতি সর্বতোভাবে জনসাধারণের দেবতা, এবং ইহাও তাঁহার প্রতিষ্ঠার অন্যতম কারণ। ইহার অপর একটি হেতু ছিল এই যে তিনি কেবল বিঘ্নরাজ বা বিঘ্নবিনাশন বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিলেন না, পরন্তু সিদ্ধিদাতা হিসাবে তাঁহার খ্যাতি ছিল। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনও শুভকার্য আরম্ভ করিলে উহা যে সুশৃঙ্খলে ও বিনাবাধায় সুসম্পন্ন হইবে এবং কর্মকর্তা বাঞ্ছিত সিদ্ধিলাভ করিবেন, এ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। এজন্য তিনি পৌরাণিক দেবতামণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াও বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদিগের দেবতাসমূহের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন।

তাঁহার অদ্ভুত আকৃতিও তাঁহাকে জনগণের মধ্যে বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

গণেশের হস্তীমুণ্ড, খর্ব ও স্থূল তনু এবং প্রলম্ব জঠরের কারণ কি? 'গণপতি,' 'গণেশ' ইত্যাদি নামের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'গণের অধিপতি।' এই 'গণ' কে বা কাহারা? পৌরাণিক শিব দেবতার ইহারা 'গণ' বা অনুচর, প্রমথ বলিয়াও ইহারা পরিচিত। বরাহমিহির গণপতিকে প্রমথাধিপ আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যেহেতু তিনি শিব-গণদিগের মধ্যে প্রধান, সেইহেতু তিনি শিবের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনীতে তিনি কি প্রকারে শিব-পার্বতীর পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন তাহার কাল্পনিক ইতিহাস নানাভাবে বর্ণিত হইয়াছে। অপর পক্ষে শিবের বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রদেবতার সহিত মরুৎগণের পিতা-পুত্র সম্বন্ধ আমরা ঋগ্বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত দেখিতে পাই। মরুতের সংখ্যা যে বহু তাহা উহার সহিত যুক্ত 'গণ'-শব্দ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। মরুৎগণের সহিত রুদ্রের সম্বন্ধও হয়ত অংশতঃ বা পরোক্ষভাবে পৌরাণিক শিব এবং গণপতির আত্মীয়তাসম্পর্ক নির্ণয়ে সহায়তা করিয়াছে। সে যাহাই হউক গণেশ যেহেতু প্রধান শিবানুচর সেহেতু শিবগণদিগের আকৃতি হইতেই তাঁহার আকৃতি পরিকল্পিত। এখানে শিবগণদিগের আকৃতি কিরূপ ছিল তাহার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূমারার শিব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষগুলিতে (এগুলি এখন কলিকাতার ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আছে) শিবানুচরদিগের প্রতিকৃতি খোদিত আছে। ইহারা প্রায় সকলেই খর্বকায়, স্থূলতনু, ও প্রলম্বজঠর; কেহ বৃষমুখ, কেহ শ্যেনমুখ আবার কেহ বা হয়গ্রীব; কাহারও বা জঠরদেশে একটি রাক্ষসমুখ চিহ্নিত রহিয়াছে। এই প্রস্তর-খণ্ডগুলির অন্য একভাগে গজানন গণেশের পূজামূর্তি খোদিত দেখা

২

যায়। এই শিব-মন্দিরটি যে আনুমানিক ষষ্ঠ শতাব্দীতে (গুপ্তযুগের শেষের দিকে) নির্মিত হইয়াছিল ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

ভূমারা শিব-মন্দিরের পূর্বে ও পরে নির্মিত কোনও কোনও মন্দিরে আমরা গণ ও গণপতির মূর্তি উৎকীর্ণ দেখিতে পাই। এই প্রসঙ্গে আনুমানিক পঞ্চম শতকে নির্মিত কানপুরের নিকট ভিতর-গাঁও নামক স্থানে অবস্থিত ইষ্টকনির্মিত মন্দিরগাত্রে একটি পোড়ামাটির ফলকে (terracotta plaque) উৎকীর্ণ গণপতিমূর্তিটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। এখানে যে শিবের অন্যতম গণের মূর্তি হিসাবেই ইহাকে দেখানো হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মোদকভাণ্ডহস্ত গজানন উড়িয়া চলিয়াছেন ও তাঁহার পশ্চাতে অন্য গণাদি তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। বাদামী, ঈলোরা প্রভৃতি মন্দির সংস্থাতেও গণ ও গণপতির প্রতিকৃতি খোদিত আছে। মথুরাতে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর দাগবিশিষ্ট রক্তপ্রস্তরে (spotted red sandstone) নির্মিত একটি গণপতিমূর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহা অপেক্ষাকৃত কৃশাকৃতি, এবং নগ্ন ; আর সব বিষয়ে ইহার গণপতির অন্যান্য সাধারণ মূর্তি হইতে বিশেষ পার্থক্য নাই। দেবতা ভোজনবিলাসী ও মোদকপ্রিয়, সেজন্যই তাঁহার একটি হস্তে মোদকভাণ্ড, এবং তিনি তাহাতে শুণ্ড অর্পণ করিয়া মোদকাস্বাদনে রত। তাঁহার হস্তস্থিত অন্যান্য দ্রব্যগুলির মধ্যে এগুলির নাম করা যাইতে পারে, যথা, মূলক, পরশু, সর্প, দন্ত (তিনি একদন্ত, অপর দন্তটি নিজ হাতে উপড়াইয়া লইয়া যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে একসময়ে ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে) ; আবার লেখনী, পুঁথি ও অক্ষমালাও মূর্তিভেদে তাঁহার হস্তে দেখা যায়। শেষোক্ত জিনিস তিনটি হইতে তাঁহার বিদ্যাচর্চা ও যোগাদিব সহিত সম্পর্ক সূচিত হয়। এই শেষের রূপটি যে গণপতি নামে অভিহিত বৈদিক বৃহস্পতির সহিত তাঁহার নামসাদৃশ্য হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে এ অনুমান সঙ্গত। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

ব্যাস রচিত মহাভারতের লেখক হিসাবে গণেশ সম্বন্ধে যে কাহিনী উক্ত গ্রন্থের কোনও কোনও সংস্করণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে যে এই রূপ-কল্পনাই বর্তমান সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই রূপটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন, কারণ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে মহাভারতের উক্ত কাহিনী প্রক্ষিপ্ত, এবং গণেশের প্রাচীনতম মূর্তিগুলিতে লেখনী বা পুস্তকের অস্তিত্ব নাই। সাধারণের দেবতা গণপতিকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করিবার অভিপ্রায়েই মনে হয় উল্লিখিত নাম-সাদৃশ্যের সুযোগ লইয়া ব্রাহ্মণ কিংবদন্তীকার এইরূপ কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন, এবং লেখনী-পুস্তক-হস্ত রূপে দেবতা পরিকল্পিত হইয়াছিলেন। সিদ্ধিদাতা বলিয়া গণেশের প্রসিদ্ধির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দেবতার এই বৈশিষ্ট্য ভারতের বণিকসমাজের নিকটেও তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও পূজাভাজন করিয়া তুলিয়াছিল। ব্যবসায়ী-মহলে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা যে বহুদিন হইতে এদেশে বর্তমান ছিল উহার একটি সুপ্রাচীন নিদর্শন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঘাটিয়ালা গ্রামে (যোধপুর, রাজপুতানা) প্রাপ্ত খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ-কালের (৮৬১ খৃঃ অঃ) একটি শিলালিপি হইতে প্রতীহাররাজ কক্কুক কর্তৃক রোহিন্সকূপ নামক গ্রামে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র (হাট বা বাজার) স্থাপনের কথা জানিতে পারা যায়। নবপ্রতিষ্ঠিত বাজারের এক প্রান্তে প্রতীহার নৃপতির দ্বারা একটি স্তম্ভনির্মাণের কথাও লিপিটিতে লিখিত আছে। এই স্তম্ভটির শীর্ষদেশে চারিটি গণেশমূর্তিকে পৃষ্ঠ-সংলগ্নভাবে (addorsed) ও উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক কয়টিতে এক একটি মূর্তির মুখ করিয়া দেখানো হইয়াছে। ঘাটিয়ালার আরও দুতিনটি তৎকালীন লেখতে আমরা রোহিন্সকূপে বা রোহিন্সকে এবং মড্ডোদরে (বর্তমান মণ্ডোর) কক্কুক কর্তৃক স্তম্ভ স্থাপনের বিষয় বর্ণিত দেখিতে পাই। ইহার একটিতে লিখিত আছে (লেখগুলি স্তম্ভগাত্রেই উৎকীর্ণ) যে রোহিন্সকূপ পূর্বে আভীরগণ কর্তৃক অত্যন্ত

উৎপীড়িত হইত, এবং কল্কুক এই বিঘ্ন দূর করিয়াই তথায় ব্যবসায়-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। স্তম্ভোৎকীর্ণ লিপিগুলিতে গণেশ যে বিঘ্ননাশক এবং ব্যবসায়ে সাফল্য আনয়নকারী দেবতা তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত মধ্যযুগের নৃত্যরত অনেক গণেশমূর্তির 'প্রভাবলী'র উপরদিকের মধ্যভাগে সপল্লব আম্রগুচ্ছ খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অঙ্কিত করিবার হেতু এই যে আম্র সর্বোৎকৃষ্ট ফল, এবং গণপতি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিগণকে যেন ঐরূপ উৎকৃষ্ট ফলই (সাফল্য ও সিদ্ধি) প্রদান করিয়া থাকেন।

গণপতির আর একটি নাম 'বিনায়ক'। অথর্বশিরস্ উপনিষদে রুদ্র দেবতাকে অন্য বহু দেবতা ও 'ব্যন্তর' দেবতার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই ব্যন্তর দেবতাগুলির অন্যতম ছিলেন 'বিনায়ক'। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে গণেশ্বর এবং বিনায়ক বলিয়া পরিচিত এমন একদল দেবতার কথা বলা হইয়াছে, যাঁহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল জনগণের কার্যাদির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা, এবং লোকেরা স্তবস্তুতির দ্বারা তাঁহাদের তুষ্টিসাধন করিলে তাহাদের অমঙ্গল নাশ করা। মানব-গৃহ্যসূত্রে 'শালকটংকট', 'কুষ্মাণ্ডরাজপুত্র', 'উস্মিত' ও 'দেবযজন' নামে চারিটি বিনায়কের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এগুলি উপদেবতা, কারণ উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে জনগণ ইহাদের দ্বারা আবিষ্ট হইলে নানারূপ অসঙ্গত কার্য করে, দুঃস্বপ্ন দর্শন করে এবং বিবিধ শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ হইতে বঞ্চিত হয়। এই সব বিনায়কাবিষ্ট লোকদিগের কি প্রকারে উপদেবতার প্রভাব হইতে মুক্ত করা যায় তাহার বিশদ বিবরণ এই গ্রন্থে লিখিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতেও বিনায়ক, বিনায়কাবিষ্ট এবং বিনায়ক মুক্তির প্রায় অনুরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুইটি বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে বিনায়ক মাত্র একটি, বহু নহেন এবং এই এক বিনায়কই নিম্নলিখিত ছয়টি নামে পরিচিত :—যথা, 'মিত', 'সম্মিত', 'শাল',

'কটংকট', 'কুষ্মাণ্ড' ও 'রাজপুত্র'। বিনায়ক মুক্তির বিধিও এখানে কিঞ্চিৎ জটিলতর। আর একটি নূতন তথ্যের সন্ধান যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে পাওয়া যায়; এখানে বিনায়ক অম্বিকাপুত্র। গ্রন্থ দুইটির বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির বর্ণনাটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের; এখানে বিনায়ক এক এবং অম্বিকা বা দুর্গার সন্তান। বিভিন্ন গণদেবতা হইতে এক গণেশ্বর বিনায়কের অভ্যুদয় ইহাদ্বারাই সূচিত হইয়াছে। এই গণদেবতা আদিতে অনেকাংশে উপদেবতার পর্যায়ভুক্ত এবং জনসাধারণের অনিষ্টকারী; কিন্তু যথানিয়মে তাঁহার তুষ্টি সম্পাদন করিলে তিনি সকলের হিতকারী। বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকাতেও তাঁহাকে মূলতঃ বিঘ্ন-উৎপাদনকারী বিঘ্নরাজ বলিয়াই বর্ণিত করা হইয়াছে, তাঁহার পূর্ণতুষ্টি সাধিত হইলেই তিনি বিঘ্নবিনাশক সিদ্ধিদাতা। গণপতি বিনায়কের এই বিশিষ্ট রূপটি আমাদিগকে তাঁহার পিতা রুদ্র-শিবের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বৈদিক রুদ্রও আদিতে প্রকৃতির ভীষণ প্রকাশসমূহের প্রতীক, কিন্তু মন্ত্র-যজ্ঞাদির দ্বারা পরিতুষ্ট হইলে তিনি 'শিব' বা মঙ্গলদায়ক। শিব কখনও কখনও নিজে 'গণেশ্বর' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; তাঁহার প্রধান অনুচরবর্গই যে 'ভূত', 'প্রেত', 'প্রমথাদি' একথা এই অধ্যায়ের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে। এই সব উপদেবতাগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় পারস্কর গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম যথাক্রমে 'ষণ্ড', 'মর্ক', 'উপবীর', 'সৌণ্ডিকেয়', 'উলূখল', 'মলিম্লুচ', 'অনিমিষ', 'হস্তমুখ', 'সর্ষপারুণ', 'কুমার', ইত্যাদি, এবং ইহারাও আদিতে জনগণের অহিতকর; বিধিসঙ্গতভাবে ইহাদের তুষ্টিসাধন করিলে, ইহারাও সকলের মঙ্গলদায়ক। মানব গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত বিনায়ক চতুষ্টয়ের এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃত্যুক্ত এক বিনায়কের ছয়টি ভিন্ন রূপের সহিত ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য।

অমরকোষের স্বর্গবর্গ অধ্যায়ে গণপতির প্রতিশব্দগুলি এই ভাবে

লিখিত আছে, যথা: বিনায়ক বিঘ্নরাজ দ্বৈমাতুর গণাধিপাঃ। অপ্যেকদন্ত হেরম্ব লম্বোদর গজাননাঃ॥ অমরকোষ একটি সুপ্রাচীন অভিধান গ্রন্থ; অনেকে মনে করেন যে ইহা গুপ্তযুগের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থোক্ত বিভিন্ন প্রতিশব্দগুলিতে গণপতি বিনায়কের আকার ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার প্রায় সবগুলিরই কিছু পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, মাত্র দ্বৈমাতুর ও হেরম্ব সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। দুর্গা (অম্বিকা) এবং তাঁহার অন্য এক উগ্র রূপ চামুণ্ডা, এই দুজনে গণেশকে পালন করিয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি, এবং এজন্যই তিনি দ্বৈমাতুর নামে খ্যাত। আবার 'হে' অর্থাৎ শিব তাঁহার সমীপে সর্বদা থাকিতেন, এজন্য তিনি হেরম্ব বলিয়া পরিচিত ছিলেন। পরে দেখানো হইবে যে হেরম্ব তাঁহার মূর্তিবিশেষের নাম, এবং হেরম্বোপাসক নামে একটি বিশিষ্ট গাণপত্য সম্প্রদায় শঙ্করাচার্যের সময়ে বর্তমান ছিল। সে যাহা হউক, অমরকোষের সাক্ষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে বিচিত্র আকৃতিবিশিষ্ট এই দেবতার পূজা গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের ভূমারা শিব-মন্দিরের গাত্রে লম্বোদর গজাননের পূজা মূর্তির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিবগণদিগের অন্যতম গণরূপে প্রদর্শিত তাঁহার প্রাচীনতর মূর্তির কথাও বলিয়াছি। এই সকল প্রমাণের সাহায্যে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে গুপ্তযুগ হইতেই ইহার পূজার ন্যূনাধিক প্রসার হইয়াছিল। বৃহৎসংহিতার প্রতিমা-লক্ষণ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইহার প্রতিমার বর্ণনা এইরূপভাবে দেওয়া হইয়াছে: প্রমথাধিপ গজমুখঃ প্রলম্বজঠরঃ কুঠারধারী স্যাৎ। একবিষাণো বিভ্রন্মূলককন্দং সনালদলকন্দং॥ মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত বৃহৎসংহিতায় ৫৭ অধ্যায়ে এই শ্লোক উদ্ধৃত নাই, এবং কার্ন (Kern) সম্পাদিত ঐ গ্রন্থের ৫৮ অধ্যায়ের শেষে ইহা উদ্ধৃত হইলেও ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে ইহা সত্য।

গুপ্তযুগের যে সব শিলালিপি ও তাম্রশাসন এ পর্যন্ত পাওয়া গিয়াছে সেগুলির কোনওটিতেও এই দেবতার পূজার উল্লেখ নাই, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এসব নেতিবাচক (negative) সাক্ষ্যের দ্বারা গুপ্তযুগে গণপতি পূজার প্রচলনের অসম্ভাব্যতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় না। বৃহৎসংহিতার ভাষ্যকার উৎপলাচার্য প্রতিমা-লক্ষণ অধ্যায়ের ভাষ্যের শেষে শিল্পশাস্ত্র-রচয়িতা কাশ্যপের গ্রন্থ হইতে চতুর্ভুজ গণপতির নিম্নলিখিত বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন: একদংষ্ট্রো গজমুখশ্চতুর্বাহুর্বিনায়কঃ। লম্বোদরঃ স্থূলদেহো নেত্রত্রয়বিভূষিতঃ॥ উৎপল খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর, শিল্প-শাস্ত্রকার কাশ্যপ যে তাঁহার কত পূর্বে বর্তমান ছিলেন উহা সঠিক বলা যায় না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে নিম্নলিখিত গণেশ-গায়ত্রী দেখিতে পাওয়া যায়: ওঁ বিঘ্ন-রাজায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি, তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ। মহানারায়ণ উপনিষদেও উক্ত মন্ত্র অন্যান্য দেবদেবীর গায়ত্রী-মন্ত্রের সহিত উদ্ধৃত আছে। তবে উক্ত আরণ্যক গ্রন্থের এই খণ্ডটি এবং উপনিষদের এই অংশটি অনেক পণ্ডিতের মতে প্রক্ষিপ্ত অংশ এবং আরণ্যক উপনিষদের আদিযুগের বহু পরে রচিত। এই মত গ্রহণ না করিলে আমাদিগকে বলিতে হয় যে আরণ্যক রচনার কালের পূর্বেই গণপতির বিশিষ্ট মূর্তি-কল্পনা রূপায়িত হইয়াছিল। কিন্তু এতৎসম্পর্কিত অন্যান্য পারি-পার্শ্বিক তথ্য যাহা এই অধ্যায়ে পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, উহা দ্বারা শেষোক্ত অনুমান সমর্থিত হয় না। এই গণেশ-গায়ত্রী গুপ্তযুগে গণপতি বিনায়কের সাধারণ পূজা প্রচলনের কালেই রচিত হইয়াছিল এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে স্থান পাইয়াছিল।

এখন বিভিন্ন প্রকারের গণেশমূর্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া গাণপত্য সম্প্রদায় ও তাহার ছয়টি বিভাগের সম্বন্ধে কিছু বলিব। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ, সুপ্রভেদাগম, অংশুমদ্ভেদাগম, উত্তর-কামিকাগম, রূপমণ্ডন, শিল্পরত্ন প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেবতার মূর্তিভেদের

বিশদ বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলির মধ্যে অনেকাংশে মূলগত ঐক্য থাকিলেও এগুলিতে অনেক পার্থক্যও দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েকটি বর্ণনার সহিত অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন গণেশমূর্তিগুলির বিশেষ মিল দেখা যায়, আবার অপর কয়েকটির সহিত ইহাদের সামঞ্জস্য খুবই অল্প। সুপ্রভেদাগম গ্রন্থে গণেশের গজমুখ হইবার কারণ এইরূপ কল্পিত হইয়াছে। শিব ও উমা একদা হিমালয়স্থ অরণ্যে একটি গজ-দম্পতির মিলন অবলোকন করিয়া উক্তরূপ ধারণ করিয়া পরস্পর মিলিত হন। ইহার ফলেই উমাগর্ভে গজাননের জন্ম হয়। গণেশের বিশিষ্ট আকৃতির মূল কারণ কি ছিল উহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই দেবতার হস্তীমুণ্ডের ব্যবস্থা অন্য এক কারণেও হওয়া অসম্ভব নহে। খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের বহু পূর্ব হইতেই যক্ষ-নাগাদি ব্যন্তর দেবতার পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যক্ষের রূপবর্ণন প্রসঙ্গে মূর্তিশাস্ত্রকারগণ উহাকে 'তুন্দিল' অর্থাৎ লম্বোদর এই আখ্যা দিয়াছেন। আর 'নাগ' শব্দটির অন্যতম অর্থ হইল হস্তী (হস্তিনাপুরের অন্য প্রতিশব্দ যে নাগসাহ্বয় ইহা সর্বজনবিদিত)। গণেশের মূর্তিতে এই দুইটি ব্যন্তর দেবতারই আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কিয়ৎ পরিমাণে সন্নিবিষ্ট আছে। অতএব, আগমোক্ত কাহিনী যে একটি পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সত্যের কারণ দেখাইবার জন্য বিকৃত ও কষ্টকল্পিত প্রচেষ্টা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পুরাণ ও শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বিনায়ক, গণাধীশ, বিঘ্নেশ, প্রমথাধিপ, গণেশ, বীজগণপতি, হেরম্ব, বক্রতুণ্ড, বাল বা তরুণ গণপতি, ভক্তবিঘ্নেশ, বীরবিঘ্নেশ, শক্তিগণেশ, ধ্বজগণাধিপ, পিঙ্গলগণপতি, উচ্ছিষ্টগণপতি, বিঘ্নরাজ গণপতি, লক্ষ্মী গণেশ, মহা গণেশ, ভুবনেশ গণপতি, নৃত্য গণপতি, ঊর্ধ্বগণেশ, প্রসন্ন গণেশ, উন্মত্ত বিনায়ক ও হরিদ্রা গণেশ এই ২৪টি বিভিন্ন গণেশমূর্তির কথা বর্ণিত আছে। এই নামগুলি বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত, এবং বলা বাহুল্য যে ইহাদের অনেকগুলিরই বর্ণনানুরূপ মূর্তি পাওয়া যায় নাই।

বাহুল্যভয়ে প্রত্যেকটির গ্রন্থে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উদ্ধৃত হইল না।

সাধারণতঃ গণপতি মূর্তিগুলি তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—'স্থানক' (দাঁড়ানো) 'আসন' (বসা) এবং 'নৃত্যরত'। প্রথম ভাগেরটি অপেক্ষাকৃত কম দেখিতে পাওয়া যায়, 'আসন' মূর্তি অনেক পাওয়া গিয়াছে। বাংলাদেশে এই দেবতার নৃত্যমূর্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। 'স্থানক' গণেশ কোনও ক্ষেত্রে 'সমপাদ স্থানক' ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান (standing erect), আবার কোথাও বা দ্বিভঙ্গ কিংবা ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় প্রদর্শিত হন। 'আসন' মূর্তিগুলিতে দেবতার বাম পদ আকুঞ্চিত এবং পীঠোপরি রক্ষিত, এবং দক্ষিণ পদ পীঠ গাত্র প্রলম্বিত বা অন্যরূপে ন্যস্ত। দ্বিভুজ গণপতি অপেক্ষাকৃত কম, চতুর্ভুজ গণপতিরই আপেক্ষিক বাহুল্য। আবার ষড়ভুজ এবং অষ্টভুজ মূর্তিও বিরল নহে। নৃত্যরত ভঙ্গীতে প্রদর্শিত দেবতার ভুজাধিক্য লক্ষণযোগ্য। দ্বিভুজ গণেশের এক হস্তে মোদকভাণ্ড এবং অন্যহস্তে পরশু, অক্ষমালা, বা মূলক; চতুর্ভুজ গণপতির হস্তগুলিতে এই চারিটি দ্রব্য সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, আবার প্রকারভেদে অঙ্কুশ, পাশ, দণ্ড ইত্যাদিও দেখা যায়। নৃত্যমূর্তিগুলির ছয় বা আটটি হস্তে এই দ্রব্যগুলির কোনও কোনওটির পরিবর্তে শূল, সর্প, নীলোৎপল, ধনুঃ, শর ইত্যাদিও বিন্যস্ত থাকে। গণপতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূষিকবাহন, এমনকি তাঁহার নৃত্যরত মূর্তিগুলিও তাঁহার এই অদ্ভুত বাহনোপরি নৃত্যরত ভঙ্গিমায় প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলাদেশে শিবের মধ্যযুগীয় নৃত্যমূর্তিগুলি প্রায়ই দেবতার বাহন বৃষভাকার নন্দীর পৃষ্ঠোপরি নৃত্যরত; এদেশে উক্ত ভঙ্গিমার গণপতি মূর্তিও নিজ বাহন মূষিকের উপর নর্তনশীল। নৃত্য গণেশ যে শিব নটরাজের একরূপ অদ্ভুত অনুকরণ তাহা এই ভঙ্গীর দুইটি দেবতা-মূর্তির তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দক্ষিণদেশীয় নটরাজ শিবের 'দণ্ডহস্ত' মুদ্রাটির সম্পূর্ণ অনুকৃতি

গণপতির এই জাতীয় মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়। শিব ত্রিনয়ন—গণেশও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ত্রিনেত্র। শিবের পার্বতীর সহিত অনেক মূর্তি, যথা উমাসহিত-মূর্তি, উমা-মহেশ্বর মূর্তি, সোমাস্কন্দমূর্তি প্রভৃতি পাওয়া যায়, গণেশেরও শক্তিগণেশ লক্ষ্মীগণেশ উচ্ছিষ্টগণেশ ইত্যাদি মূর্তিভেদে শক্তি-সাহচর্য দেখা যায়। উন্মত্ত বা উন্মত্তোচ্ছিষ্ট গণেশ-মূর্তি একটু আদিরসাশ্রিত। এই প্রকার গণপতির একভক্ত সম্প্রদায় (ইহাদের সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলা হইবে) বামাচারপরায়ণ ছিল বলিয়া গ্রন্থভেদে বর্ণিত আছে। গণেশের মূষিকবাহনের কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হেরম্ব গণপতির বাহন সিংহ। মূর্তি-শাস্ত্রে বর্ণিত হেরম্ব গণপতির রূপ অতি বিচিত্র। ইহা পঞ্চগজমুখ-বিশিষ্ট—চারিটি মুখ এক এক করিয়া চারিটি দিক অভিমুখী, ও পাঁচেরটি আকাশমুখী করিয়া ইহাদিগের উপর স্থাপিত—ইহা একটি শক্তিশালী সিংহোপরি অবস্থিত, ইহা দশভুজ, ইহার হস্তগুলিতে পাশ, দণ্ড, অক্ষমালা, পরশু, মুদ্গর, মোদক, বরমুদ্রা, অভয়মুদ্রা ইত্যাদি প্রদর্শিত, এবং ইহার বর্ণ স্বুবর্ণ পীত। এই প্রকার মূর্তি দাক্ষিণাত্যে বিরল নহে, গোপীনাথ রাও তাঁহার Elements of Hindu Iconography নামক গ্রন্থে নেগাপটমের নীলায়তাক্ষীয়ম্মণ মন্দিরে রক্ষিত ব্রোঞ্জ-নির্মিত হেরম্ব গণপতির মূর্তি প্রকাশিত করিয়াছেন (Vol. 1, Pls. XIII, XIV)। কিন্তু এই প্রসঙ্গে পূর্ববঙ্গের রামপালের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত এবং মুন্সীগঞ্জের একটি বৈষ্ণবমঠে রক্ষিত ও পূজিত এইরূপ একটি মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার *Catalogue of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum* নামক পুস্তকে ইহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন (pp. 146-47, Pl. LVIb)। এই মূর্তি প্রস্তরনির্মিত, এবং অনেকাংশে ইহা গোপীনাথ রাও বর্ণিত হেরম্বমূর্তির অনুরূপ হইলেও ইহার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহার 'প্রভাবলী'র

উপরিভাগে ছয়টি ক্ষুদ্রাকৃতি গণেশমূর্তি খোদিত আছে। ভট্টশালী মহাশয় এই বৈচিত্র্যটি লক্ষ্য করেন নাই এবং সেজন্য ইহার কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই ক্ষুদ্র মূর্তিগুলি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি বিভাগের ছয় উপাস্যদেবতার (ছয় প্রকার গণপতি যথা মহা, হরিদ্রা, উচ্ছিষ্ট, নবনীত, স্বর্ণ এবং সন্তান) প্রতীক। আমাদের এই উক্তি সত্য হইলে ইহা অনুমান করা যায় যে মূল হেরম্বগণপতির মূর্তিটি বাংলাদেশের এই অংশে অবস্থিত মধ্যযুগীয় গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকবৃন্দের ভক্তির নিদর্শন।

এখন গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক। গণপতি দেবতার একভক্ত সম্প্রদায় কখন হইতে প্রথম প্রবর্তিত হয় তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে মনে হয় এই অদ্ভুতাকৃতি দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া ধর্মসম্প্রদায় গুপ্তযুগের শেষভাগে গঠিত হয়। ইহার সাধারণ-ভাবে পূজার বহুল প্রসার তৎকালে ও তৎপরবর্তী কালে হইলেও, সে পূজা যে অন্যান্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ এবং স্মার্তমতাবলম্বী-দিগের মধ্যেই প্রধানতঃ নিবদ্ধ ছিল উহা একরূপ সুনিশ্চিত। গণপতির ঐকান্তিক উপাসক গাণপত্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে সেজন্য সাহিত্যগত প্রমাণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। যে স্বল্প প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। আনন্দগিরি বা অনন্তানন্দগিরি তাঁহার শঙ্কর-দিগ্বিজয় কাব্যে এবং মাধব বিদ্যারণ্য বিরচিত শঙ্করদিগ্বিজয় কাব্যের ডিণ্ডিমাখ্য ভাষ্যে (ভাষ্যকার) ধনপতি গাণপত্য সম্প্রদায়ের ছয়টি শাখার সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রসঙ্গটি এইরূপে গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শঙ্করাচার্য রাজা সুধন্বা প্রভৃতি শিষ্য সহিত অদ্বৈত-মত স্থাপনার্থ এবং নানারূপ পাষণ্ডধর্মাবলম্বীদিগকে বৈদিক মতে পুনরানয়নের জন্য দেশভ্রমণে বাহির হন। দেশভ্রমণ করিতে করিতে তিনি গণবর নামক নগরে স্থিত কৌমুদীনদীতীরবর্তী গাণপত্যাশ্রমে

আগমন করেন। সেখানে বিঘ্নেশ গণপতির মন্দির বর্তমান ছিল। তিনি তথায় মাসাবধিকাল অবস্থান করেন এবং আশ্রমবাসিগণের ধর্মচর্যা সম্বন্ধে কৌতূহলী হন। তিনি দেখেন যে এই গণপতিদেবতার একভক্ত গণ ছয়টি শাখায় বিভক্ত (গাণপত্যমিতি খ্যাতং ষড়ভির্ভেদৈঃ সমন্বিতম্)। প্রথম শাখাটি মহাগণপতির উপাসক। ইহাদের মতে মহাগণপতিই জগৎপ্রপঞ্চের স্রষ্টা, এবং ব্রহ্মদেব ও অন্যান্য দেবতা প্রলয়কালে বিনষ্ট হইলে একমাত্র মহাগণপতিই পুনঃ সৃষ্টি পর্যন্ত বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি গজানন ও একদন্ত এবং তাঁহার শক্তির সহিত চিরবিহারে রত। তাঁহার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাবলে তিনি ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণকে সৃজন করেন; তাঁহার যে সব একভক্তেরা তাঁহার গায়ত্রীমন্ত্র (এ মন্ত্রের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে) জপ করিয়া তাঁহার ধ্যানপরায়ণ হয় তাহারা সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দরসে নিমগ্ন হয়। শঙ্করাচার্যসমীপে এই মতের ব্যাখ্যানকারীর নাম গিরিজাসুত। ভগবান শঙ্করাচার্য এই মহাগণপতিভক্ত গিরিজাসুতের মতবাদ যে ভ্রান্ত এবং বেদোক্ত অদ্বৈত মতই যে সর্বজনগ্রাহ্য উহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দেন। ইহার ফলে গিরিজাসুত তাঁহার শিষ্যাদিসহ নিজেদের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন ও মত এবং কার্যকলাপ পরিত্যাগ করিয়া আচার্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং পঞ্চপূজাশীল, পঞ্চযজ্ঞ-পরায়ণ এবং গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ হন (...ইত্যুক্তঃ সগণঃ শিষ্যতাং গতঃ। ত্যক্তচিহ্নো গুরোস্তস্য শঙ্করস্য মহাত্মনঃ॥ পঞ্চপূজাপরো নিত্যং পঞ্চযজ্ঞ পরায়ণঃ। গুরুশুশ্রূষনাসক্তঃ সমভূদগিরিজাসুতঃ॥ শঙ্কর-দিগ্বিজয়, আনন্দাশ্রম সিরিস সংস্করণ, পৃঃ ৫২৬, শ্লোক ৩৫৭-৫৮)। এখানে লক্ষণীয় যে গণপতির ঐকান্তিক পূজা পরিত্যাগ করিয়া গিরিজাসুত স্মার্ত পঞ্চোপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অন্যতম স্মৃতিগ্রন্থ গীতায় বর্ণিত পঞ্চযজ্ঞ (দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, এবং জ্ঞানযজ্ঞ, গীতা ৪, ২৮) পরায়ণ হইলেন। ইহার পর হরিদ্রা

গণপতির উপাসক গণপতিকুমার আচার্য সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতার গুণগ্রাম ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ত্রয়োবিংশ সূক্তের প্রথম শ্লোকের নিজকৃত ব্যাখ্যা অনুযায়ী তিনি নিজ দেবতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিলেন। তিনি বলিলেন এই ঋকের সঙ্গত অর্থ এই, 'রুদ্র; বিষ্ণু, ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রাদিগণের মুখ্য তোমাকে নমস্কার করি; তুমি ভৃগু, গুরু (শুক্র ও বৃহস্পতি), শেষ প্রভৃতি নানা ঋষির উপদেশক, তুমি সকল বিদ্যা বিজ্ঞানীর শ্রেষ্ঠ, সৃষ্ট্যাদি কার্যে নিযুক্ত ব্রহ্মাদিদেবের দ্বারা তুমি সংপূজিত'। হরিদ্রা-গণপতির ধ্যান এইরূপ: পীতকৌষেয় বসন, পীত যজ্ঞোপবীতধারী, চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র, হরিদ্রাসিক্ত উজ্জ্বল আনন সংযুক্ত, পাশ, অঙ্কুশ দণ্ড এবং অভয় মুদ্রাধারী (পীতাম্বরধরং দেবং পীতযজ্ঞোপবীতিনম্। চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং হরিদ্রা লসদাননম্॥ পাশাঙ্কুশধরং দেবং দণ্ডাভয়করাম্বুজম্)। এইভাবে দেবতার ধ্যান করিলে, মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। গণপতি বিশ্বপ্রপঞ্চের আদি কারণ, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত তাঁহার অংশাংশীরূপ সম্বন্ধ (জগৎকারণমেবায়ং ব্রহ্মাদ্যা অংশরূপিণঃ)। এতদ্বিধ গণপতির উপাসকগণ তাঁহাদের উভয় বাহুমূলে দেবতার গজমুখ এবং একদন্তের চিহ্ন উত্তপ্ত লৌহদ্বারা অঙ্কিত করিয়া ধারণ করিয়া থাকেন। পরে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য গণপতিকুমার ও তচ্ছিষ্যগণকে সুযুক্তি ও উপদেশের দ্বারা স্বমতে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাদিগকেও পঞ্চপূজা-সম্পন্ন অদ্বৈতনিষ্ঠরূপে পরিবর্তিত করিলেন। তারপর উচ্ছিষ্ট গণপতি পূজক বামাচারী হেরম্বসুত আচার্যসন্নিধানে আসিয়া তাঁহার উপাস্যদেবতার রূপ গুণ বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতার ধ্যান এই প্রকার: 'চতুভুজ, ত্রিনেত্র, পাশ অঙ্কুশ গদা ও অভয়মুদ্রাধারী, তাঁহার শুণ্ডাগ্র তীব্র সুরাপানাসক্ত, তিনি মহাপীঠে আসীন, তাঁহার বামোৎসঙ্গে স্থাপিতা তাঁহার শক্তিকে চুম্বনালিঙ্গনাদি-তৎপর' (চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং পাশাঙ্কুশগদাভয়ম্। তুণ্ডাগ্র তীব্রমধুকং গণনাথমহং ভজে॥ মহা-

পীঠনিষণ্ণং তং বামাঙ্গপরিসংস্থিতম্। দেবীমালিঙ্গ্য চুম্বন্তং স্পৃশংস্তুণ্ডেন বৈ ভগম্॥ ইতি ধ্যানং হি সংপ্রোক্তং তস্মাত্ত্যক্তং তু চিন্তনম্)। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না, ইহারা বিবাহাদি-সংস্কার বর্জিত ছিল, ইহাদের মধ্যে পাপপুণ্যাদির দ্বন্দ্বতা (ভেদ) ছিল না (ইহারা promiscuous intercourseএ কোনও দোষ বা পাপ দেখিতে পাইত না, বরং ইহার সমর্থনই করিত), সুরাপান ইহারা অনুমোদন করিত, ললাটদেশ একটি রক্তবিন্দুচিহ্ন ধারণ করিত, এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য ইহাদের ইচ্ছাধীন ছিল। তাহাদের এই মতবাদ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পারি যে তাহারা বামামার্গাবলম্বী কৌলতান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত ছিল। ইহাদের মতে গণেশই আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা, ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহার অংশমাত্র। এই অংশী ও অংশবিশেষের মধ্যে যে প্রকৃত পার্থক্য নাই উহা তাহাদের মতে বেদেই বর্ণিত হইয়াছে (আনন্দাত্মা গণেশোঽয়ং তদংশাঃ পদ্মজাদয়ঃ॥ অংশাংশিনোরভেদস্তু বেদে সম্যক্ প্রকীর্তিতঃ)। ভগবান রুদ্র নিজেই গণপাত্মা বা গণেশ্বর (রুদ্রস্তু গণপাত্মৈব)। এইরূপ নানা কুযুক্তি ও অযুক্তির দ্বারা বামাচারী উচ্ছিষ্ট গণপতি-পূজক হেরম্বসুত আচার্যদেবকে স্বমতে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে অপর দুইটি গাণপত্যাচার্যের ন্যায় নিজ ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া পঞ্চযজ্ঞাদি নিরত ও স্বাধ্যায়ী পঞ্চপূজাপরায়ণরূপে পরিণত হইলেন। নবনীত, স্বর্ণ ও সন্তান নামে অপর তিনটি গণপতি ভেদের এক-পূজক গাণপত্যাচার্য তিনজনও শঙ্করাচার্যের বেদবিহিত অদ্বৈতমতের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তৎপ্রবর্তিত অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ও বেদাচার-পরায়ণ হইয়া উঠিলেন।

গাণপত্য সম্প্রদায়ভেদের উল্লিখিত বিবরণের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে কিছু সংশয় জাগিতে পারে। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় বলিয়াছেন যে যেহেতু গণপতি বিনায়কের পূজা মাত্র খৃষ্টীয়

ষষ্ঠ শতকে প্রথম প্রবর্তিত হয় সেই হেতু শঙ্করাচার্যের সময়ে এই দেবতার একভক্ত সম্প্রদায়ের অন্যূন ছয়টি শাখার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি যে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের পূর্বযুগের গণপতির মূর্তি সহজলভ্য না হইলেও কিছু কিছু পাওয়া যায়, এবং ইহাদের মধ্যে কতকগুলি যে গণপতিভক্তদিগের পূজা-প্রতীক ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই দেবতার রূপ-কল্পনা ও পূজা যে যবদ্বীপ ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে গুপ্তযুগের কিছু পরেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব নাই। সুদূর চীন ও জাপানেও ইঁহার পূজা আদি মধ্যযুগে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। যবদ্বীপের 'বাড়া' (Bara) নামক স্থানে প্রাপ্ত 'আসন' গণেশমূর্তি এবং কাম্বোডিয়ার মাইসন নামক স্থানে প্রাপ্ত, 'স্থানক' গণেশমূর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি এই প্রকার : শ্রেণীবদ্ধ কয়টি নরকপালযুক্ত আসনের (মনে হয় 'পঞ্চমুণ্ডী' জাতীয় আসন) উপর দেবতা আসীন ; গজাননের ললাটদেশে নরকপাল-লাঞ্ছিত জটা-মুকুট ; এখানে ইঁহার শক্তি উপস্থিত নাই বটে, কিন্তু উপর্যুক্ত বর্ণনা দেবতার তান্ত্রিক রূপই প্রকট করিতেছে। ইহা খৃষ্টীয় দশম বা একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়া থাকিতে পারে। দ্বিতীয় মূর্তিটি খুব সম্ভব খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের, কাজেই আগেরটি অপেক্ষা সুপ্রাচীন। ইহাতে কোনওরূপ তান্ত্রিক চিহ্নাদি নাই ; মোদকাস্বাদনরত গজমুণ্ড দেবতাকে দেখিলে মনে হয় যে স্কন্ধার্পিত উত্তরীয়বিশিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক স্বাচ্ছন্দ্য, সুখ ও সন্তোষের প্রতীকরূপে সম্মুখে দণ্ডায়মান। দেবতার এবম্বিধ রূপ-কল্পনা ভারতীয় প্রভাবেই এসকল স্থানে প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এ কারণে মনে হয় যে ভারতে ইঁহার পূজার প্রবর্তন খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর কিছু পূর্বে হওয়াই স্বাভাবিক। আর অনন্তানন্দ-গিরির (ইনি ভগবান শঙ্করাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য বলিয়াই পরিচিত) এবং মাধব বিদ্যারণ্যের অন্যতম গ্রন্থের ভাষ্যকার ধনপতির সাক্ষ্য যদি

বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে শঙ্করাচার্যের কালে ভারতের গাণপত্য সম্প্রদায়ের শাখাবিভেদ থাকার কথা অসম্ভব নাও হইতে পারে। ইহাও সম্ভব যে অদ্বৈতবাদী আচার্যের স্বমতের প্রাধান্য স্থাপনের ফলে উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তবে ইহার সম্পূর্ণরূপ বিলোপ যে সাধিত হয় নাই তাহা সুনিশ্চিত। ভারতের প্রান্তে সুদূর পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত মধ্যযুগীয় একটি হেরম্বমূর্তি যে কি প্রকারে গাণপত্য সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ছয়টি শাখা সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে সেকথা পূর্বে বলিয়াছি। উড়িষ্যার অংশবিশেষ বহুদিন হইতে গণপতি-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। দক্ষিণপূর্ব রেলওয়ের (পূর্বের বেঙ্গল নাগপুর শাখার) কপিলাশ রোড স্টেশন হইতে মহাবিনায়ক পর্বতে যাওয়া যায়,—ইহাই 'গণেশ স্থান' নামে বিদিত আছে। রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীতে গণপতির মৃন্ময় মূর্তি গৃহস্থদিগের দ্বারা মহা আড়ম্বরে পূজিত হইয়া থাকে। পুনার নিকট (ছিঞ্চবাড়) নামক স্থানে একমাত্র এই গজমুখদেবতার পূজার জন্য একটি পৃথক দেবায়তন আজিও বর্তমান। তথাপি ইহা বলা যায় যে এই দেবতার একভক্ত গাণপত্য সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আর ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পঞ্চোপাসনার অন্যতম অঙ্গ হিসাবে ইহা স্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুদিগের মধ্যে এখনও প্রচলিত। স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি সংস্কারসমূহের অনুষ্ঠানকালে এবং নৈমিত্তিক পূজা-পার্বণাদিতে এই বিঘ্নবিনাশক সিদ্ধিদাতা গণপতিদেবতার প্রথমেই অর্চনা করিতে হয়। তাই পুরোহিত 'গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্রে ফুল জল দ্বারা গণেশকেই আদি করিয়া পঞ্চদেবতার পূজা সমাপন করেন ও তৎপরে শুভকার্যে ব্রতী হন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষ্ণু—বৈষ্ণব

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা 'বিষ্ণুর' প্রকৃত পরিচয়

ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বজনবিদিত। ইহার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। এই অধ্যায়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর আদি ও প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে অনুশীলন আবশ্যক। এই বিষ্ণু কোন দেবতা? ইনি কি ঋগ্বেদে বর্ণিত আদিত্য বিষ্ণু? বৈদিক বিষ্ণু দ্যুস্থানের প্রধান দেবতা সূর্যের প্রকারভেদ। বৈদিক ঋষিগণ দেবতা-মণ্ডলীকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করিতেন, —যথা দ্যুস্থানের, মধ্যম বা অন্তরীক্ষস্থানের এবং পৃথিবীস্থানের। প্রতিটি স্থানের দেবতা সংখ্যায় একাদশ (১টি মুখ্য ও দশটি তদাশ্রয়ী) হইলে, সর্বসাকুল্যে ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতার কল্পনা তৎকালে প্রচলিত ছিল। দ্যুস্থান, মধ্যমস্থান এবং পৃথিবীস্থানের মুখ্য দেবতা যথাক্রমে সূর্য, বায়ু বা ইন্দ্র, এবং অগ্নি। এই সূর্যই বেদোক্ত বিষ্ণুর রূপ কল্পনার মূল উৎস। সূর্যের অন্য নাম আদিত্য—অর্থাৎ 'অদিতির পুত্র', এবং আদিত্য-সূর্য ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তে সপ্ত, অষ্ট, বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক বলিয়া কল্পিত হইয়াছেন। ইহাদের নাম ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সূর্য ও সবিতা ব্যতীত এই নামগুলি এইরূপ: মিত্র, পুষন্, ভগ, বিবস্বৎ, অর্যমন্, অংশ, দক্ষ, মার্তাণ্ড বা মার্তণ্ড, ধাতা, বিষ্ণু ইত্যাদি। শতপথ ব্রাহ্মণের একাংশে ইহাদের সংখ্যা আটটি, আবার অন্য দুইটি অংশে (৬ ১. ২, ৮ ও ১১. ৬. ৩, ৮) বারোটি এইরূপ নির্দিষ্ট আছে। শেষোক্ত সংখ্যা নির্দেশের কারণ মনে হয় ইহাকে দ্বাদশ মাসের সংখ্যার সহিত মিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত। মহাকাব্য ও পুরাণগুলিতে আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া সুনির্দিষ্ট,

এবং সাধারণতঃ ইহাদের নামগুলি এই : ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পুষা, সবিতা, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু। এই নামগুলির প্রত্যেকটিই বৈদিক, এবং বিষ্ণুর নামটিই এই তালিকার সর্বশেষে অবস্থিত।

বৈদিক বিষ্ণু যে মুখ্যতঃ সূর্যের অন্যতম প্রকাশ সে বিষয়ে বিশেষ কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। ঋগ্বেদে এবং অন্যান্য বেদে বিষ্ণু 'ত্রিবিক্রম', 'উরুক্রম', 'উরুগায়' ইত্যাদি নামে খ্যাত। শেষোক্ত দুইটি শব্দের অর্থ এই যে 'যিনি বিস্তৃতভাবে বিচরণশীল'। কিন্তু 'ত্রিবিক্রম' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। এই অর্থ বিষ্ণুদেবতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত একটি বৈদিক বাক্য হইতে উদ্ভূত ; উহা এইরূপ : 'ত্রেধা নিদধে পদং'—অর্থাৎ (তিনি) 'তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছিলেন'। বৈদিক ভাষ্যকারগণ বিষ্ণুর ত্রিপদ বিচরণের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একটি ব্যাখ্যা এই যে ইহা বিষ্ণুনামধারী সূর্যের নভোমণ্ডল পরিভ্রমণের তিনটি পর্যায়। প্রাতঃকালীন সূর্যের পূর্বাকাশে স্থিত রূপ যেন তাঁহার প্রথম পাদ, মধ্যাহ্নের গগনমধ্যস্থ সূর্য দ্বিতীয়, এবং সায়াহ্নে পশ্চিম দিকচক্রবালে বিলীয়মান সূর্য দেবতার শেষ বা তৃতীয় পাদ সূচিত করে। দেবতা এইরূপে তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা যেন সমগ্র অন্তঃরীক্ষমণ্ডল অতিক্রম করেন। অপর ব্যাখ্যানুসারে আদিত্য বিষ্ণু যেন সত্যই তিন 'পদ' অগ্রসর হইয়া সমগ্র বিশ্বভূমণ্ডল অতিক্রম করিয়াছিলেন, এবং কাল্পনিক কাহিনী অনুযায়ী তিনি গয়ার বিষ্ণুপাদ পর্বত হইতেই প্রথম পদনিক্ষেপ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত কাহিনীটি মহাকাব্য-পুরাণাদিতে বর্ণিত কশ্যপপুত্র বামন উপেন্দ্র-বিষ্ণু কর্তৃক দৈত্যরাজ বলিকে ছলনা করার গল্পের সমপর্যায়ভুক্ত। বিরোচনপুত্র দৈত্যপতি বলির ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ যজ্ঞে ত্রিপাদ ভূমির প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। দৈত্যরাজ তাঁহার এই আপাত অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনা পূরণ করিলে, তিনি বিরাট্ রূপ ধারণ করিয়া প্রথম পদক্ষেপে সমস্ত

দ্যুস্থান ও দ্বিতীয় পদক্ষেপে সমগ্র ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া ফেলেন, এবং তৃতীয়বারে বলির মস্তকে পদসঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে পাতাল-পুরীতে প্রেরণ করেন। এইরূপে তিনি দৈত্যদিগের নিকট হইতে স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার করিয়া লইয়া দেবতাদিগকে দান করেন, এবং দেবতারা তাঁহারই অনুগ্রহে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'ন। শতপথ ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যক প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত বিষ্ণুসম্বন্ধীয় কাহিনীটি কিয়দংশে উক্ত গল্পের অনুরূপ ত বটেই,—বরং উহাকে পরবর্তীকালের গল্পের আদিরূপ বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। ইহাতেও দেবাসুর সংঘর্ষের উল্লেখ রহিয়াছে, এবং এই সংঘর্ষে বামনরূপী বিষ্ণু কর্তৃক অসুরদিগের নিকট হইতে পৃথিবী অধিকার করার কথা আছে। দেবগণ প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরদিগের নিকট হইতে পৃথিবীর অংশ দাবী করিলে, অসুরগণ মাত্র শয়ান বিষ্ণুর শরীর দ্বারা অধিকৃত অংশটুকু প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। বিষ্ণু দেবতাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হ্রস্বাকৃতি, কাজেই অসুরেরা মনে করিয়াছিলেন যে অতি অল্পপরিমাণ ভূখণ্ড দেবতাদিগকে অর্পণ করিলে অবশিষ্ট সমস্ত অংশই তাঁহাদের অধিকারে থাকিবে। অসুরেরা কিন্তু বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ যে কি উহা জানিতেন না। তাঁহার প্রকৃত রূপ মখ বা যজ্ঞ, এবং এই যজ্ঞরূপেই তিনি সমস্ত পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত হন। মখরূপী বিষ্ণু যখন নিজ শরীর দ্বারা সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিলেন, তখন পূর্ব সর্তানুযায়ী অসুরগণ দেবতাদিগকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ব্রাহ্মণ-আরণ্যকে বর্ণিত কাহিনী হইতেই যে বামনাবতারের পৌরাণিক উপাখ্যান উদ্ভূত হইয়াছে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখযোগ্য যে বিষ্ণুর যজ্ঞরূপের উপর এই আখ্যানে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে, এবং ইহাও সত্য যে পরবর্তীকালে বিষ্ণুর নানাবিধ অবতার-রূপ কল্পনার মধ্যে 'যজ্ঞপুরুষ' অবতার অন্যতম। বিষ্ণুর আদিত্যরূপের কথাও এই গল্পের শেষাংশে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণকার বলিতেছেন যে

'যিনি বিষ্ণু, তিনিই যজ্ঞ, এবং যিনি যজ্ঞ, তিনি আদিত্য' (স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ স। স যঃ স যজ্ঞো'সৌ স আদিত্যঃ' ; 'শতপথ ব্রাহ্মণ', ১৪.১.১,৬)। অসুরদিগের নিকট হইতে দেবতাদিগের জন্য পৃথিবী অধিকার ব্যাপারে পরিশ্রান্ত বিষ্ণু যখন গুণবদ্ধ নিজ ধনুর উপর মস্তক রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত অন্যান্য দেবতাদের প্ররোচনায় পিপীলিকাসমূহ গুণরজ্জু কর্তন করিলে ধনুর্যষ্টির আকস্মিক উৎক্ষেপে বিষ্ণুর মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গগনমণ্ডলে আদিত্যরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে।

বিষ্ণু দেবতার আদি বৈদিক রূপের যে পরিচয় উপরে প্রদত্ত হইল তাহাতে উহা যে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের ইষ্টদেবতার পূর্ণরূপ নহে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'বৈষ্ণব' এই নামটি 'বিষ্ণু' হইতে ব্যুৎপন্ন ইহা সত্য, কিন্তু এই সম্প্রদায়-গত নাম অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন। সুপ্রাচীন কালের সাহিত্য ও লেখমালা অনুসন্ধান করিলে 'বৈষ্ণব' নামটি পাওয়া যায় না। গুপ্তযুগ প্রারম্ভের পূর্বে যে ইহা অপ্রচলিত ছিল তাহার সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ বর্তমান। মহাভারতের খুব শেষের দিকের একটি অংশেই আমরা ইহার উল্লেখ পাই। স্বর্গারোহণ পর্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৯৭তম শ্লোকে লিখিত আছে যে 'অষ্টাদশ পুরাণগুলি শ্রবণ করিলে যে পুণ্যফল পাওয়া যায়, তদনুরূপ ফল যে বৈষ্ণবও (বিষ্ণু-ভক্তিপরায়ণ) প্রাপ্ত হন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, (অষ্টাদশপুরাণানাং শ্রবণাৎ যৎ ফলং ভবেৎ। তৎফলং সমবাপ্নোতি বৈষ্ণবোনাত্র সংশয়ঃ)। ভারত মহাকাব্যের ফলশ্রুতিমূলক এই শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত বা উহার বর্তমান রূপ পরিগ্রহণ কালের একেবারে শেষের দিকে রচিত তাহা পণ্ডিতসমাজ স্বীকার করেন। উক্ত মতের সমর্থন পাদ্মতন্ত্র নামক প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতার একটি শ্লোক হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে এই ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের যে বিভিন্ন নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে উহাতে 'বৈষ্ণব' নামটি নাই। নামগুলি 'ভাগবত' সম্প্রদায়ের

প্রতিশব্দ, এবং যখন এগুলি সঙ্কলিত হয় তখন বোধ হয় বৈষ্ণব নামটির সম্যক্ প্রচলন হয় নাই। শ্লোকটি এই—সূরিস্-সুহৃদ ভাগবতস-সাত্বতঃ পঞ্চকালবিৎ। একান্তিকস-তন্ময়শ্চ পাঞ্চরাত্রিক ইত্যপি (৪.২,৮৮)। ইহাদিগের মধ্যে তিনটি বা চারটি নাম প্রধানতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যথা, ভাগবত, সাত্বত, একান্তিক ও পাঞ্চরাত্রিক। ভাগবত নামের উল্লেখ আমরা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদিত একটি শিলালিপিতে দেখিতে পাই। লেখটি বেসনগরে (প্রাচীন বিদিশা—ইহা মধ্যভারতের গবালিয়র প্রদেশে অবস্থিত) প্রাপ্ত একটি স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে তক্ষশিলার যবন রাজ অংতলিকিত (Antialkidas) কর্তৃক বিদিশার রাজা কাশীপুত্র ভাগভদ্রের রাজসভায় প্রেরিত যবনদূত হেলিয়দোর (Heliodorus) ভাগবত ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং তিনি তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা দেবদেব বাসুদেবের তৃপ্ত্যর্থে একটি গরুড়ধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীন ইতিহাস অনুশীলনকল্পে এই লেখটির অবদান যে কত গুরুত্বপূর্ণ, উহার পরিচয় পরে আরও দেওয়া হইবে। বর্তমান প্রসঙ্গে 'ভাগবত' এই নামটির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইহারই যে সমধিক ব্যবহার ছিল লেখটি হইতে ইহা জানা যায়। 'সাত্বত' প্রতিশব্দটি আমাদিগকে ভক্তিকেন্দ্রিক সাম্প্রদায়িক ধর্মের কেন্দ্রস্থ আদি সত্তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে। এই আদি সত্তা বৈদিক বিষ্ণু নহেন, তিনি সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ। তিনি পার্থিব জীবনে ঐতিহাসিক মহাপুরুষ ছিলেন, এবং তাঁহার জীবদ্দশায় ধর্ম সংস্থাপন ও প্রকৃষ্ট কর্মানুশীলনের ফলে সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় জনগণ কর্তৃক দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতে থাকেন। 'একান্তিক' ('তন্ময়' কথাটিও ইহার অন্য প্রতিশব্দ) শব্দটির অর্থ যাঁহারা বাসুদেব-কৃষ্ণে একান্ত ভক্তিপরায়ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই একান্তিক ভক্তদিগের উল্লেখ আছে, এবং ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ সখা অর্জুনকে ইহাদেরই দলভুক্ত হইতে নির্দেশ দিয়াছেন (১৮,৬৫—মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যংতে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে)। এই একভক্তদিগের অনুসৃত পথের নাম যে একায়ন উহা অন্যতম প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থ ঈশ্বর-সংহিতার একটি শ্লোক হইতে সমর্থিত হয়। শ্লোকটি এইরূপ: মোক্ষন্যায় বৈ পন্থা এতদন্যো ন বিদ্যতে। তস্মাদ্ একায়নং নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ (১,১৮)। পাঞ্চরাত্র বা পাঞ্চরাত্রিক নামটির প্রকৃত তাৎপর্য যে কি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।[১] তবে গুপ্তযুগ প্রারম্ভের পূর্বেই মনে হয় ইহা এই একভক্ত সম্প্রদায়কে বুঝাইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে বা তাহার পূর্ব হইতেই পাঞ্চরাত্র ধর্মমতের বিশিষ্ট অংশ 'ব্যূহবাদ' পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, এবং কয়েকটি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থও গুপ্তযুগের গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল। পাদ্মতন্ত্রোক্ত ভাগবত সম্প্রদায়ের কয়েকটি বিশেষ প্রতিশব্দ আলোচনা করিয়া বুঝা গেল যে ঐগুলি বৈদিক আদিত্য বিষ্ণুর সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। বিষ্ণু হইতে উদ্ভূত 'বৈষ্ণব' নামটির সর্বপ্রথম উল্লেখ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর কয়েকটি লেখে এবং মুদ্রায় পাওয়া যায়।

১ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন নারদীয় পাঞ্চরাত্র সংহিতাতে লিখিত আছে যে ইহা যেহেতু পাঁচ প্রকার জ্ঞানের (রাত্র) বিষয় আলোচনা করে, সেহেতু ইহার নাম পাঞ্চরাত্র। পঞ্চ প্রকার জ্ঞান এই: তত্ত্ব, মুক্তিপ্রদ, ভক্তিপ্রদ, যৌগিক ও বৈশেষিক। এই ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ কষ্টকল্পিত হইলেও শ্রেডারের মতে অন্য সব ব্যাখ্যা হইতে অধিকতর গ্রহণযোগ্য (F. O. Schrader, *Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhuya Samhita*, pp. 24-5)। শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩.৬,১) পাঞ্চরাত্র কথাটির প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায়। এখানে পুরুষ নারায়ণ কর্তৃক সঙ্কল্পিত পাঞ্চরাত্র সত্রের উল্লেখ আছে।

এগুলি তদানীন্তন ত্রৈকূটকরাজ ইন্দ্রদত্তপুত্র দহ্রসেনের এবং তৎপুত্র ব্যাঘ্রসেনের। এগুলিতে তাঁহারা 'পরমবৈষ্ণব' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু সে সময়েও যে এই নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উহা আমরা সমকালীন গুপ্তরাজগণের ধর্মসম্বন্ধীয় উপাধি হইতে জানিতে পারি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁহার বংশধরগণ তাঁহাদের লেখমালায় এবং মুদ্রায় প্রায়শঃ 'পরমভাগবত' আখ্যায় ভূষিত হইয়াছেন। পরবর্তী গুপ্তসম্রাট্ বুধগুপ্তের সময়ের এরণ প্রস্তর স্তম্ভলিপিতে মহারাজা মাতৃবিষ্ণুকে 'অত্যন্তভগবদ্ভক্ত' এই আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য মাতৃবিষ্ণু গুপ্তসম্রাট্‌দিগের ন্যায় পরমভাগবত ছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগেও এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণকে 'ভাগবত' বা 'পরমভাগবত' বলিয়া নির্দিষ্ট করা প্রশস্ত ছিল, এবং তখন বৈষ্ণব নামটির আংশিক প্রকাশ হইলেও, উহার ব্যবহার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে বেদের আদিত্য বিষ্ণু আলোচামান ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের আদি ও প্রধান পুরুষ ছিলেন না।

মহাভারতে শান্তিপর্বের অন্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ের মূল বিষয় অনুশীলন করিলে জানা যায় যে গ্রন্থোক্ত ভক্তিধর্মের আদি পুরুষের অন্যতম নাম ছিল নারায়ণ বা হরি। তবে এই নাম দুটি যে সাত্বত বংশ সম্ভূত বাসুদেব-কৃষ্ণেরই অন্য পরিচয় উহার আভাস গ্রন্থকার নানা প্রকারে দিয়াছেন। এই পর্বাধ্যায়ভুক্ত আখ্যান কয়টির খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ। নারদ একসময়ে বদরিকাশ্রমে যাইয়া দেখিলেন যে দেবর্ষিদ্বয়, নর ও নারায়ণ, গভীর ধ্যানে ও পূজায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া নারদ ভগবান নারায়ণকে প্রশ্ন করিলেন যে তিনিই যখন সকলের উপাস্য দেবতা তখন তাঁহার উপাসনার পাত্র আবার কে? ভগবান তাহার উত্তরে বলিলেন যে তিনি তাঁহার আদি প্রকৃতি পরমপুরুষেরই ধ্যান ও পূজায় রত। এই পরমপুরুষ ধর্মরূপী ও

ইহার চারিটি পুত্র—নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ। ইহার সাক্ষাৎলাভের জন্য নারদ শ্বেতদ্বীপে যাইয়া তাঁহার পূজায় রত চিত্রশিখণ্ডিন নামে পরিচিত সপ্তর্ষিগণকে দেখিলেন। প্রসঙ্গতঃ গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে চিত্রশিখণ্ডিন সপ্তর্ষিরা (মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরস, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ) এবং স্বায়ম্ভুব মনুই সাত্বত ধর্ম জগতে প্রচার করেন ; ইহার একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন চেদিরাজ উপরিচর বসু। এই একান্তিক ভক্তি-ধর্মের উৎস বৃষ্ণিবীর বাসুদেবই নারায়ণের আদি প্রকৃতি ও পরমপুরুষ, এবং ইনি তাঁহার একভক্তদিগের নিকটই প্রকাশ পান, কিন্তু বৈদিক যজ্ঞাদি কর্মকাণ্ড নিরত ঋষিগণের নিকট অপ্রকট থাকেন। প্রকারান্তরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণও বলিতেছেন যে তিনি প্রথমে বিবস্বানকে এই যোগের কথা বলিয়াছিলেন, বিবস্বান তৎপুত্র মনুকে, মনু ইক্ষাকুকে ইহা শিক্ষা দেন এবং পরম্পরাক্রমে পরবর্তী রাজর্ষিগণ এই যোগের অধিকারী হন। কালক্রমে এই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, এখন পুনরায় তিনি তাঁহার একভক্ত ও সখাকে ইহার উত্তম রহস্য জানাইতেছেন (৪র্থ অধ্যায়, ১-৪)।

মহাকাব্যোক্ত দেবর্ষি নারায়ণকে বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিকে দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯০ তম সূক্তের (পুরুষসূক্তের) ঋষি ও দেবতা এই পুরুষ-নারায়ণ, এবং তিনি যে একই সময়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সর্বপ্রকারে আবৃত করিয়া এবং কিয়ৎ-পরিমাণে ইহার অতিরিক্ত হইয়া রহিয়াছেন একথা সূক্তটির প্রথম অনুবাকেই বর্ণিত হইয়াছে (সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষ সহস্রপাৎ। স ভূমিং সর্বতো বৃত্বা অত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম)। ঈশ্বরের এই যে যুগপৎ তন্ময়ত্ব (immanence) এবং অতিরিক্তত্ব (transcendence) কল্পনা—ইহাই অনুবাকটির গভীর অর্থ বৈশিষ্ট্য। সূক্তটিতে দেবতার নিজেকে বলিরূপে উৎসর্গীকরণের কথা আছে এবং তাঁহার খণ্ডীকৃত দেহের বিভিন্ন অংশ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি জাতির এবং

সৃষ্টিপ্রপঞ্চের নানাবিধ প্রাণী ইত্যাদির উৎপত্তির বিষয় বর্ণিত আছে। এই সর্বব্যাপী পুরুষ-নারায়ণের কল্পনাই আবার ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৮১ এবং ৮২ সূক্তে বিশ্বকর্মা দেবতারূপে রূপায়িত হইয়াছে। দেবতা এবং ঋষি বিশ্বকর্মা সকলের জনক, তাঁহার সর্বদিকে দৃষ্টি, তিনি সর্বত্র সঞ্চরণশীল, এবং তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের স্রষ্টা। তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর সীমার বাহিরে থাকিয়া, সর্বদেবতা ও ভূতসমূহের অতিরিক্ত হইয়া বিরাট্ জলরাশির মধ্যে আদি সত্তারূপে বিরাজমান ছিলেন, তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বীজস্বরূপ। তাঁহাতেই বিশ্বভুবন স্থিতিশীল ছিল (যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ), এবং সেই 'অজে'র নাভিমণ্ডলস্থ পাত্র-বিশেষই সর্বভূতের আশ্রয়স্থল। আদিদেব বিশ্বকর্মার রূপ কল্পনাই যে মহাভারতোক্ত দেবর্ষি নারায়ণের অন্যতম রূপবৈশিষ্ট্যের প্রতীক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার প্রথম খণ্ডে সৃষ্টিবিবরণ প্রসঙ্গে অব্যক্ত ব্রহ্ম নারায়ণ এই ভাবেই কল্পিত হইয়াছেন (১. ১০ : আপো নারাঃ ইতি প্রোক্তাঃ আপো বৈ নরসূনবঃ। তাঃ যদস্যায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ)। পুরাণাদি গ্রন্থে আমরা যে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর (বৈষ্ণব মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদিতে ইহা শেষশায়ী বিষ্ণুরূপে বর্ণিত) রূপ বর্ণনা দেখিতে পাই উহাও বেদোক্ত বিশ্বকর্মার রূপকল্পনা হইতে উদ্ভূত। এই অনন্তশয়ন বিষ্ণুমূর্তিই দক্ষিণ ভারতের ভক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রধানতম পূজা প্রতীক, এবং ইহা রঙ্গস্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত।

বেদ-ব্রাহ্মণ-মহাভারত-পুরাণাদি গ্রন্থের এই ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞাপক দেবতাও যে বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণুর ন্যায় ভক্তিকেন্দ্রিক ভাগবত ধর্মের মূল বা আদি সত্তা নহেন উহা সুনিশ্চিত। মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়টি মনোযোগপূর্বক পাঠ করিলেই ইহা সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। মহাকাব্যকার নানাভাবে ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত বাসুদেব-কৃষ্ণই ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ, এবং বিষ্ণু ও নারায়ণ প্রভৃতি বেদব্রাহ্মণোক্ত দেবতাগণ তাঁহারই

বিশেষ বিশেষ প্রকাশ। এ সম্বন্ধে মহাভারতের একাংশে বর্ণিত একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। বনপর্বের ১৮৮ ও ১৮৯ সংখ্যক অধ্যায়-দ্বয়ে ঋষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়কালে বিশ্বজগতের অবস্থা সম্বন্ধে যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন যে তখন কেবল বিরাট্ জলরাশি ব্যতীত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই ছিল না। তিনি সেই জলসমুদ্র মধ্যে বটপত্রে শয়ান একটি দেবশিশুকে দেখিতে পান। শিশুটি মুখব্যাদান করিয়া তাঁহাকে নিজ জঠরাভ্যন্তরে গ্রহণ করিলে ঋষিবর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দেখেন যে সমগ্র বিশ্বচরাচর দেবশিশুর দেহমধ্যে বর্তমান রহিয়াছে। অতঃপর শিশু তাঁহাকে স্বীয় বদন হইতে উদ্গীর্ণ করিলে, মার্কণ্ডেয় পুনরায় সেই জলরাশি এবং বটপত্রশায়ী বালককেই দেখেন। ঋষি দেবশিশুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে তিনিই 'নারায়ণ', কারণ তাঁহার সৃষ্ট জলরাশিই তাঁহার আশ্রয়স্থল (আপো নারাঃ ইতি প্রোক্তাঃ আপো বৈ নরসূনবঃ। তা যদস্যায়নং পূর্বং তস্মান্নারায়ণঃ স্মৃতঃ)। তারপর মার্কেণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে এই বটপত্রশায়ী জলমধ্যস্থ নারায়ণই তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু জনার্দনের (বাসুদেব-কৃষ্ণের অন্য নাম) অন্য রূপ। এইভাবে বাসুদেব-কৃষ্ণের এবং নারায়ণের একাত্মতা সমর্থিত হয়, এবং আদি দেব বাসুদেবই যে একাধারে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের সৃজনকারী, ধারক ও সংহারকর্তা ইহাও কাহিনীটি হইতে বুঝা যায়।

বাসুদেব-কৃষ্ণের ঐরূপ ঐশী সত্তার কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে নিশ্চয়ই সময় লাগিয়াছিল। ঋগ্বেদের সূক্তসমূহে এবং অল্পপরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাসুদেব নামটির কোন উল্লেখ না থাকিলেও কৃষ্ণনামধারী বিভিন্ন গোত্রীয় ঋষিগণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলের ১১৬ এবং ১১৭ সূক্তে বিশ্বকায়ের পিতা ঋষি কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়; ঐ বেদেরই অষ্টম মণ্ডলের ৯৬ সূক্তে অংশুমতী নদী-তীরবর্তী জনপদনিবাসী অন্য এক কৃষ্ণ ঋষির সন্ধান পাই। কৌশিতকী

ব্রাহ্মণের এক অংশে (৩০.৯) অঙ্গিরস গোত্রীয় এবং ঐতরেয় আরণ্যকে (৩.২, ৬) হারীত গোত্রসম্ভূত দুইজন কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু এইসব কৃষ্ণ ঋষিগণের সহিত মহাকাব্যোক্ত সাত্বত বা বৃষ্ণিবীর ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পি, টি, শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে অংশুমতী তীর-নিবাসী কৃষ্ণের সহিত বাসুদেব-কৃষ্ণের একাত্মতা স্বীকার করা যায়, কারণ অংশুমতী ও যমুনা তাঁহাদের মতে একই নদীর বিভিন্ন নাম। কিন্তু হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে অংশুমতী ও যমুনা যে বিভিন্ন নদী উহা বৃহদ্দেবতা গ্রন্থ হইতে সমর্থিত হয়, এবং এজন্য ঋগ্বেদের অন্যতম কৃষ্ণের সহিত মহাকাব্যের বাসুদেব-কৃষ্ণের একীকরণ সমর্থনযোগ্য নহে। তবে এরূপ হইতে পারে যে মহাকাব্যের যুগে এবং হয়ত তাহার কিছু পূর্ব হইতে যখন মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের সম্যক্ স্ফূরণ হয়, তখন বৈদিক ঋষি কৃষ্ণদিগের কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য ইঁহাতে আরোপিত হইতে থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় খণ্ডে সপ্তদশ প্রপাঠকের ষষ্ঠ অনুবাকে ঋষি ঘোর আঙ্গিরসের শিষ্য দেবকীপুত্র কৃষ্ণের কথা আছে। মহাভারতাদি গ্রন্থেও আমরা দেবকীপুত্র কৃষ্ণকেও তাঁহার বাল্যকালে আঙ্গিরস ঋষি ঘোরের শিষ্যরূপে দেখিতে পাই। উপনিষদোক্ত কৃষ্ণ এবং বাসুদেব-কৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কোনও কারণ নাই, যেহেতু উভয়েই দেবকীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত। ইহা অসম্ভব নহে যে কৌশিতকী ব্রাহ্মণোক্ত ঋষি আঙ্গিরস কৃষ্ণের ছাপ আমরা উপনিষদের ও মহাকাব্যের কৃষ্ণে দেখিতে পাই। ঋগ্বেদের বিশ্বকায় কৃষ্ণও কি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত বিশ্বরূপ কৃষ্ণে প্রতিভাত আছেন? 'বিশ্বকায়' ও 'বিশ্বরূপ' শব্দ দুইটি প্রায় সমার্থবোধক, এবং গীতায় কৃষ্ণের বিশ্বরূপ কল্পনার মূলে বৈদিক 'বিশ্বকায়' কৃষ্ণের প্রভাব বর্তমান থাকিতে পারে।

ছান্দোগ্য উপনিষদের ষোড়শ প্রপাঠকে ইতরার পুত্র মহীদাস (মহীদাস ঐতরেয়) সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণিত আছে। পরবর্তী প্রপাঠকে বর্ণিত দেবকীপুত্র কৃষ্ণও যে মহীদাসের ন্যায় মানবগোত্রসম্ভূত বলিয়া কল্পিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। গীতোক্ত ভগবান কৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের আঙ্গিরসশিষ্য কৃষ্ণ যে একই ব্যক্তি উহা উভয়ে কেবল দেবকীর সন্তান বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে না। আঙ্গিরস গোত্রীয় ঘোর ঋষির নিকট হইতে কৃষ্ণ যে বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত উপদেশাবলীর মধ্যে উহা সমস্তই নিহিত আছে। স্বর্গীয় হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে সম্যক্‌রূপে অনুশীলনের দ্বারা ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের ঘোর শিষ্য কৃষ্ণ তাঁহার গুরুদেবের নিকট যে সকল উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার সবগুলিই তিনি গীতার অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে তাঁহার সখা ও শিষ্য অর্জুনকে শিক্ষা দিয়াছেন।[১]

একটু পূর্বেই বলিয়াছি যে ঋগ্বেদে বা অল্প পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বাসুদেব নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু বহু পরবর্তীকালের পরিশিষ্টমূলক বৈদিক গ্রন্থের কোনও কোনওটিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ১০ম অধ্যায়ে (ইহা সর্বশেষ অধ্যায় এবং এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট পর্ব বলিয়া বিবেচিত) এবং মহানারায়ণ উপনিষদে (ইহাও যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের উপনিষদ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত) বিষ্ণুগায়ত্রীমন্ত্রে, নারায়ণ, বাসুদেব এবং বিষ্ণু এই তিনটি নামের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রটি এইরূপ: ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে, বাসুদেবায় ধীমহি, তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ। এখানে

১ *Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect* (2nd Edition) pp. 78-82.

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে একই দেবতার জপমন্ত্রে তাঁহার বিশেষ তিনটি রূপভেদের সমীকরণ হইয়াছে। আগেই বলা হইয়াছে যে ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায় যে মহান ঐশী সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রথম আত্মপ্রকাশ করে, তিনি বৈদিক আদিত্য-বিষ্ণু বা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে কল্পিত ঋষি নারায়ণ বা ব্রহ্মাণ্ডব্যাপক দেবতা (cosmic god) নারায়ণ নহেন ; তিনি আদিতে সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কর্মবীর মহামানব বাসুদেব-কৃষ্ণ। মহাভারতের প্রাচীনতম অংশগুলি হইতে (ইহার মধ্যে ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায় অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে) জানিতে পারি যে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুপূর্বে ভারতবর্ষের পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হইয়া নিজের পূত চরিত্র ও মহান কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা অধর্ম বিনাশ করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অংশগুলিতে এই কর্মবীর, জ্ঞানবীর এবং তত্ত্বোপদেশক মহাপুরুষের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে, উহার সহিত মহাভারতের পরিশিষ্ট হরিবংশ (খিল) এবং অন্যান্য বৈষ্ণবপুরাণাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের সহিত পার্থক্য দেখা যায়। সে বিষয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে আরও কিছু আলোচনা করা হইবে। বিষ্ণুগায়ত্রী অনুশীলন প্রসঙ্গে ইহাই বলা আবশ্যক যে বাসুদেব-কৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, সেই বাসুদেব-কৃষ্ণের সহিত কালক্রমে আরও দুইটি দেবসত্তার সংমিশ্রণ ঘটে,—ঐ দুটি বৈদিক আদিত্য বিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণ-মহাভারতোক্ত ব্রহ্মাণ্ডসূচক দেবতা (cosmic god) নারায়ণ। এই সম্মেলন, মনে হয়, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট (দশম অধ্যায়)

---

১ মহাভারতের দ্বিতীয় পর্বে (সভাপর্ব) শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ের যে শ্লোকগুলিতে ঘোরতর কৃষ্ণবিদ্বেষী চেদিরাজ শিশুপাল-প্রদত্ত বাসুদেব-কৃষ্ণের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি পণ্ডিতগণের মতে প্রক্ষিপ্ত।

এবং মহানারায়ণ উপনিষদের রচনাকালের বেশ কিছু পূর্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। প্রেত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যগত অন্যান্য প্রমাণও আমাদিগকে এই সম্মেলনকাল নির্ণয় সম্বন্ধে কিছু সাহায্য করে। এবিষয়ে কিছু বলার পূর্বে ভাগবতধর্মের কেন্দ্রীয় পুরুষের আর একটি রূপভেদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক।

এ রূপটি তাঁহার গোপাল-কৃষ্ণ রূপ। খিল হরিবংশে ও বৈষ্ণব পুরাণাদিতে গোপাল-কৃষ্ণের যে শৈশব ও কৈশোর চরিত বর্ণিত আছে তাহার সহিত আদি মহাভারতের কর্মবীর কৃষ্ণের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বেশ কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য দেখা যায়। হরিবংশ ইত্যাদি গ্রন্থে গোকুল ও ব্রজে অনুষ্ঠিত কৃষ্ণের যে সকল বাল্যলীলার বর্ণনা পাওয়া যায় তাহার কোনওটির উল্লেখ খৃষ্টপূর্ব কালের গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায় না। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থে পতঞ্জলি রচিত মহাভাষ্যে কৃষ্ণকে স্বীয় মাতুল মথুরাধিপতি কংসের শত্রু ও হন্তারূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে বটে (অসাধুর্মাতুলে কৃষ্ণঃ, জঘান কংসং কিল বাসুদেবঃ), কিন্তু ইহার কোন অংশেও তাঁহাকে গোকুলে উপদ্রবকারী ভিন্ন ভিন্ন পশুবেশধারী নানাবিধ অসুরের নিধনকর্তা বলিয়া দেখানো হয় নাই। পরবর্তী কালের গ্রন্থসমূহে কিন্তু নন্দালয়ে পালিত কৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ বলরামকে বৃষরূপী অরিষ্টাসুর, অশ্বরূপী কেশীদৈত্য, পক্ষীরূপধারী বকাসুর, বৃক্ষ-রূপী যমলার্জুন প্রভৃতি বিবিধ অসুরবৃন্দের নিধনকর্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; তাঁহারা যেন এই সব দুষ্টের শাসনের জন্যই ঈশ্বরের অবতার-রূপে মথুরায় আবির্ভূত হন। কিশোর কৃষ্ণের গোপিকারমণ ও গোপীজনবল্লভ রূপটিও পূর্ববর্তী কালের গ্রন্থসমূহে অপরিজ্ঞাত আছে। হরিবংশাদিতে বর্ণিত কৃষ্ণের বালচরিত সম্বন্ধীয় কোনও কোনও কাহিনী স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে তাঁহার এই গোপালরূপ কল্পনার হেতুনির্দেশ বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে। তিনি গোপালক, নন্দ তাঁহার পালক পিতা—জন্মদাতা পিতা নন, কংসের

কারাগারে তাঁহার জন্ম, নন্দ যখন মথুরারাজ কংসকে কর দিবার জন্য গোকুল হইতে মথুরার দিকে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার পত্নী যশোদা কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হন, কংসকারাগারে দেবকীগর্ভজাত কৃষ্ণের অগ্রজ নিরীহ শিশুগণের কংস কর্তৃক হত্যা ইত্যাদি ঘটনাবলীর সহিত উক্ত পণ্ডিতের মতে বাইবেলে বর্ণিত যীশুখৃষ্টের বাল্যজীবনের অনেক ঘটনার আংশিক সাদৃশ্য দেখা যায়। জার্মান মনীষী ওয়েবার (W. Weber) এইসব এবং অন্যান্য ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া কিঞ্চিন্ন্যূন এক শতাব্দী পূর্বে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে বাসুদেব-কৃষ্ণাশ্রিত ভক্তিধর্ম খৃষ্টধর্মের প্রভাবেই ভারতবর্ষে উদ্ভূত হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী প্রমুখ বহু ভারতীয় পণ্ডিত এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য মনীষীও ওয়েবারের মতের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন ; এই জার্মান পণ্ডিতের মত এখন কেহই গ্রহণ করেন না। কিন্তু ভাণ্ডারকরের মতে বাসুদেব-কৃষ্ণের এই গোপাল রূপটি খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকে ভারতে প্রবেশকারী খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী আভীর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতিদিগের আনুকূল্যেই গড়িয়া উঠে। প্রাচীন সংস্কৃত কোষগ্রন্থসমূহে ঘোষপল্লীর প্রতিশব্দরূপে আভীর-পল্লী কথাটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বহুকাল পূর্বে আগত আভীরগণের বর্তমান বংশধরগণ 'আহির গোয়ালা' নামে পরিচিত, এবং এখন বিহারে ও উত্তরপ্রদেশে ইহারা প্রধানতঃ বসবাস করে। খৃষ্টধর্মাবলম্বী প্রাচীন আভীরগণ ভারতে আসিয়া বাসুদেব-কৃষ্ণপূজকদিগের সংস্পর্শে আসে, এবং 'খৃষ্ট' ও 'কৃষ্ণে'র নামসাদৃশ্যহেতু ও অন্যান্য কারণে শিশু খৃষ্ট সম্বন্ধীয় অনেক কাহিনী বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। কিশোর কৃষ্ণের গোপিনীরমণ রূপটি ভাণ্ডারকরের মতে তদানীন্তন আভীরদিগের মধ্যে প্রচলিত শ্লথ সমাজব্যবস্থার অন্যতম প্রতিচ্ছবি। ভাণ্ডারকরের গোপাল-কৃষ্ণ কল্পনার উদ্ভব সম্বন্ধীয় মতটি সর্বজনগ্রাহ্য নহে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে প্রমাণপ্রয়োগ সহকারে দেখাইতে

চেষ্টা করিয়াছেন যে বাসুদেব-কৃষ্ণের গোপাল ও কিশোর রূপ কল্পনার বীজ ঋগ্বেদে আদিত্য বিষ্ণুর কোনও কোনও বিশেষণের মধ্যে নিহিত আছে। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের দ্বাবিংশ সূক্তের অষ্টাদশ অনুবাকে বিষ্ণুকে 'গোপা' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে; 'গোপা'র অর্থ 'গাভীগণের রক্ষক' ('protector of cows'), কিংবা 'রাখাল' বা 'গোপাল' ('herdsman')। উহারই প্রথম মণ্ডলের ১৫৫ সংখ্যক সূক্তের ষষ্ঠ অনুবাকে বিষ্ণুকে 'যুবা অকুমারঃ' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এই বিশেষণের অর্থ 'যিনি চিরনবীন' বা 'চিরকিশোর' ('ever young')। ভাগবত ধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহার কেন্দ্রীয় সত্তা বাসুদেব-কৃষ্ণের সহিত বৈদিক বিষ্ণুর সংমিশ্রণ ঘটে, তখন বিষ্ণুসম্পর্কিত উপাধি-সমূহ বিস্তৃত আকারে কৃষ্ণ সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়, এবং কিংবদন্তী রচয়িতৃগণ এইসব উপাধির উপর ভিত্তি করিয়া নানারূপ কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেন। রায়চৌধুরী মহাশয়ের উল্লিখিত যুক্তিসমূহ ভাণ্ডারকরের মতকে শিথিল করিলেও সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ করিতে পারে না। যীশুখৃষ্টের এবং বাসুদেব-কৃষ্ণের বাল্যজীবন সম্পর্কিত ঘটনাবলীর কোনও কোনটির এরূপ আশ্চর্য মিল দেখা যায় যে ভাণ্ডারকরের যুক্তি একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। দেবগড়ের দশাবতার বিষ্ণু মন্দিরের (খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের) প্রাচীরগাত্রের একটি প্রস্তরফলকে আমরা শিশু কৃষ্ণ ও বলরাম ক্রোড়ে নন্দ ও যশোদার মূর্তি খোদিত দেখিতে পাই। নন্দ ও যশোদার বেশভূষায় বৈদেশিক প্রভাব দৃষ্ট হয়; হইতে পারে যে শিল্পী কৃষ্ণের পালক-পিতা ও পালিকা-মাতাকে বৈদেশিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছিলেন।[১]

১ J. N. Banerjea, *The Development of Hindu Iconography*, 2nd Edition, p. 422.

উপরিলিখিত আলোচনার দ্বারা ইহা স্থির হইল যে বৈষ্ণবধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম উপাস্য দেবতা বিষ্ণুর প্রকৃত রূপ প্রধানতঃ তিনটি বিভিন্ন দেবসত্তার, যথা মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা বাসুদেব-কৃষ্ণের, আদিত্য বিষ্ণুর এবং নারায়ণের একীকরণের ফলেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। দেবতাব পূর্ণ রূপের বিকাশে গোপাল কৃষ্ণ রূপটিও ন্যূনাধিক অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। এইসব ভিন্ন ভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ সময় সাপেক্ষ ছিল। যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবকালের বেশ কিছু পূর্ব হইতেই এই সংমিশ্রণক্রিয়া আবম্ভ হয়, এবং খৃষ্টীয় অব্দগণনার প্রারম্ভকালের আগেই বাসুদেব কৃষ্ণের সহিত বিষ্ণু ও নারায়ণের একীকরণ সমাপ্ত হয়। ইহার সপক্ষে কিছু সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মহাভারতের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বাধ্যায়েব রচনাকাল অনেকের মতে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় শতাব্দী। ইহার একাদশ অধ্যায়ে (বিশ্বরূপ দর্শন) অর্জুন কৃত বাসুদেব-কৃষ্ণস্তুতিতে স্তূয়মান দেবতাকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত ও সন্ত্রস্ত অর্জুন তাঁহাকে কয়েকবাব বিষ্ণু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছেন, ১১.১৪ ; ১১.৩০)। ইহার পূর্ববর্তী অধ্যায়েও *(বিভূতিযোগ) কৃষ্ণ নিজেকে আদিত্যদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু বলিয়া* বর্ণনা করিয়াছেন (অবশ্য এই অধ্যায়ে তিনি সমস্ত দেবতা, প্রাণী, স্থাবর, জঙ্গমাদি সৃষ্ট পদার্থশ্রেণীর মধ্যে নিজেকে তত্তৎ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ পদার্থের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন)। পূর্বোক্ত বেসনগর শিলালিপিও (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের) বাসুদেব-কৃষ্ণের সহিত বিষ্ণুর সমীকরণ সম্বন্ধে আভাস দেয়। ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে যবনদূত হেলিওদোর তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা দেবদেব বাসুদেবের উদ্দেশ্যে একটি গরুড়ধ্বজ (শীর্ষে স্থাপিত গরুড়মূর্তি সহ একটি শিলাস্তম্ভ) উচ্ছ্রিত করাইয়াছিলেন। পরবর্তী সাহিত্য হইতে জানিতে পারা যায় যে গরুড় বিষ্ণুর বাহন, এবং বৈদিক সাহিত্য স্পষ্টরূপে

প্রমাণিত করে যে গরুড় বা গরুত্মান পক্ষীরূপে কল্পিত সূর্য (বা আদিত্য বিষ্ণু) ব্যতীত আর কেহ নহেন। অতএব ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগেই বাসুদেব-কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর একত্র সংযোগ সম্পন্ন হইয়াছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে যে পুরুষ-নারায়ণের কাহিনী বর্ণিত আছে তাহাতে বিষ্ণুর সহিত ইঁহার ঐক্যের কথা লিখিত না থাকিলেও, বৌধায়ন ধর্মসূত্র, তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং মহাভারতের কোনও কোনও অংশে ইহা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আর একটি শিলালিপি (ইহা চিতোরগড়ের নাতিদূরে নাগরীগ্রামে পাওয়া গিয়াছিল, ইহার সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও কিছু বলা হইবে) এ সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে। ইহাতে লেখা আছে যে ভগবান সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবের পূজা-শিলাপ্রাকার পারাশরীপুত্র সর্বতাত গাজায়নের দ্বারা নারায়ণবাটে নির্মিত হইয়াছিল। অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এই দেবস্থানে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পূজার জন্য মন্দির ছিল, এবং ইহার সংরক্ষণের জন্যই শিলাপ্রাকার নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভূত হয়। এই দেবস্থানের 'নারায়ণবাট' নামটি লক্ষণীয়, এবং ইহা সঙ্কর্ষণ বাসুদেব-কৃষ্ণের সহিত নারায়ণের সমীকরণ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। বাসুদেব-কৃষ্ণ পূজার সহিত গোপালকৃষ্ণ পূজার ঐক্যসাধন সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্বন্ধে সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিষ্ণু—বৈষ্ণব

উত্তরভারতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিবর্তন

পূর্ব অধ্যায়ে বৈষ্ণবধর্মের আদি কেন্দ্রীয় দেবতা ও তাঁহার প্রকৃত রূপের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিবর্তন প্রসঙ্গের অনুশীলন করা হইবে। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ভাগের পঞ্চনবতি সংখ্যক সূত্র—'ভক্তিঃ'। পদ-প্রকরণে কাহারও ভক্ত বুঝাইতে হইলে ভক্তিপাত্র জ্ঞাপক শব্দের প্রথমা বিভক্তির পর বিহিত প্রত্যয় প্রয়োগ করিলে যে পদ নিষ্পন্ন হইবে উহাই তদর্থবাচক হইবে। এই বিভাগের অষ্টনবতি সংখ্যক সূত্রটি এইরূপ: 'বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্'। বাসুদেব ও অর্জুনের ভক্ত বুঝাইবার জন্য তত্তৎ শব্দের উত্তর 'বুন্' প্রত্যয় করিতে হইবে এবং এই প্রত্যয়যুক্ত দুইটি পদ পাণিনি ব্যাকরণের অন্য নিয়মানুসারে 'বাসুদেবকঃ' এবং 'আর্জুনকঃ' রূপ গ্রহণ করিবে। এই সূত্রের পূর্ণ অর্থ নির্ধারণ করিতে হইলে ইহার পতঞ্জলিকৃত ভাষ্য আলোচনা করা আবশ্যক। পতঞ্জলি প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে বাসুদেব ও অর্জুন উচ্চবংশসম্ভূত ক্ষত্রিয় বীর; তাঁহাদের ভক্ত সংজ্ঞা নির্দেশক পদ প্রস্তুত করিতে হইলে অষ্টাধ্যায়ীর এই বিভাগের পরবর্তী সূত্রের সাহায্য লওয়া যাইতে পারিত। এ সূত্রটি এই: 'গোত্রক্ষত্রিয়াখ্যেভ্যো বহুলং বুঞ্' (৪.৩,৯৯)। সুপরিচিত ও খ্যাতিবিশিষ্ট ক্ষত্রিয়দিগের ভক্ত বুঝাইবার জন্য সেই সেই ক্ষত্রিয়-জ্ঞাপক শব্দের পরে 'বুঞ্' প্রত্যয় প্রয়োগ করিয়া যে সকল পদ সাধিত হইবে, ঐগুলিই তদর্থ-বাচক, যেমন 'গ্লৌচুকায়নকঃ', 'ঔপগবকঃ', 'নাকুলকঃ', 'সাহদেবকঃ,' 'সাম্বকঃ' ইত্যাদি। পতঞ্জলির মতে 'বাসুদেব'

শব্দের পরে 'বুন্' বা 'বুঞ্' এ দুটি প্রত্যয় ব্যবহার করা যাইতে পারিত, কারণ বাসুদেব ও অর্জুন দুজনেই অতি পরিচিত ক্ষত্রিয় বীর। তথাপি পাণিনি কেন তাঁহাদের ভক্ত বুঝাইতে আর একটি সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলেন? তবে কি তাঁহারা মহাভারতোক্ত ক্ষত্রিয় বীর নহেন, পরন্তু ঐশীপ্রকৃতিবিশিষ্ট অপর দুই সত্তা (অথবা নৈষা ক্ষত্রিয়াখ্যা। সংজ্ঞৈষা তত্রভবতঃ॥)। পতঞ্জলির এই ভাষ্যের উপর নির্ভর করিয়াই গ্রীয়ারসন, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি মনীষিগণ মীমাংসা করিয়াছেন যে বৈয়াকরণিক পাণিনি এই সূত্রের দ্বারা বাসুদেব ও অর্জুন যে শুদ্ধমাত্র ক্ষত্রিয় বীর ছিলেন না পরন্তু পরবর্তীকালে একদল ভারতীয়ের দ্বারা দেবতাজ্ঞানে পূজিত হইতেন, ইহারই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালের দুইটি প্রধান পুরুষের দেবত্ব প্রাপ্তির খুব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই সূত্রটিতে লুক্কায়িত আছে। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে অর্জুনপূজক গোষ্ঠীও পাণিনির সময়ে বর্তমান ছিল। কিন্তু এ অনুমান সত্য হইলেও অর্জুনভক্তগণ যে বাসুদেবভক্তদিগের অপেক্ষা কম প্রভাবশীল ছিল, তাহা এই সূত্রটির গঠনশৈলী হইতেই বুঝা যায়। 'বাসুদেবার্জুন' পদটি দ্বন্দ্ব সমাসান্ত, এবং বাসুদেব ও অর্জুন এই দুই শব্দ লইয়া গঠিত। পাণিনীয় ব্যাকরণের অন্যতম সূত্র 'অল্পাচ্‌তরস্' (২. ২, ৩৪) এর বিধানানুযায়ী উক্ত পদ 'বাসুদেবার্জুন' না হইয়া 'অর্জুনবাসুদেব' হওয়াই উচিত ছিল, কারণ 'অর্জুন' কথাটি 'বাসুদেব' শব্দ অপেক্ষা অল্পসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট। কিন্তু এই সূত্রের উপর অন্যতম বার্তিক (কাত্যায়নকৃত) 'অভ্যর্হিতং চ পূর্বং নিপততীতি বক্তব্যং' ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে যে পাণিনির মত ইহাও ছিল যে দ্বন্দ্ব সমাসভুক্ত দুইটি শব্দের ভিতর যেটি অধিকতর সম্মানার্হ, উহা অধিকসংখ্যক স্বরবিশিষ্ট হইলেও আগে বসিবে (যেমন 'মাতাপিতরৌ', 'শ্রদ্ধামেধে')। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে বাসুদেব ও অর্জুনের মধ্যে বাসুদেবই অধিকতর সম্মানার্হ,

ও তাঁহার ভক্তগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অধিকতর সম্ভ্রান্ত ছিলেন। মহাকাব্যের আখ্যান হইতেও আমরা এই প্রমাণই পাই, এবং পাণিনির সময় অর্জুনপূজক গোষ্ঠী কেহ কেহ থাকিলেও তাঁহারা অর্জুন যাঁহাকে বিশেষ ভক্তি করিতেন তাঁহার ভক্তদিগের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিলেন। মহাভারতে পরোক্ষভাবে অর্জুনভক্তদিগের পৃথক্ অস্তিত্বের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কারণ ইহার একাংশে লিখিত আছে (উদ্যোগ পর্ব, ৪৯,১৯) যে বাসুদেব ও অর্জুন বীরদ্বয় প্রকৃতপক্ষে নারায়ণ ও নর নামে পরিচিত দুইটি প্রাচীন দেবতা। নর ও নারায়ণ বিষ্ণুর অবতার-সমূহের অন্যতম দুইটি বলিয়া পরিগণিত। আবার আর এক কিংবদন্তী অনুসারে এই দুজন দেবর্ষি মহাপুরুষ বদরিকাশ্রমে বহুদিন তপস্যা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক এই দুই দেবতার ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে বাসুদেব ভক্তদিগেরই প্রাধান্য ছিল। অবশ্য ইহাও ঠিক যে কোনও নামের সঙ্গে 'ভক্ত' কথাটি যুক্ত থাকিলে ইহা যে এই নামযুক্ত ব্যক্তির পূজকবৃন্দকেই বুঝাইত উহা সত্য নহে। পতঞ্জলি পাণিনি সূত্রের ('হেতুমতি চ'—৩. ১, ২৬) অন্যতম বার্তিকের ভাষ্যকালে কংসভক্ত ও বাসুদেবভক্তদিগের কথা বলিয়াছেন। অবশ্য এ প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কংসপূজা ও বাসুদেবপূজার কথা উঠে না; বৈয়াকরণিক এখানে এমন একটি দৃশ্যাভিনয়ের কথা বলিতেছেন যেখানে একদল লোক কংসানুচরের এবং অপর দল বাসুদেবানুচরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয়ে বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইলে বাসুদেবানুচরগণ উল্লসিত ও কংসানুচরগণ মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাই পতঞ্জলির বক্তব্য। কিন্তু ইহাতে পরোক্ষভাবে বাসুদেবপূজা এবং বাসুদেবভক্তগণের কথা উঠে। তিনি যে স্পষ্টভাবে বাসুদেবপূজক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বলিয়াছেন ইহা এই মাত্র বলা হইয়াছে। পাণিনি সূত্র 'অব্যয়াত্ত্যপ্' (৪. ২, ১০৪) এর অন্যতম বার্তিকের ব্যাখ্যাকালে তিনি 'বাসুদেববর্গ্যঃ' ও 'বাসুদেববর্গীণঃ' এই দুইটি পদের উল্লেখ

করিয়াছেন। পণ্ডিতগণ এই পদগুলি যে বাসুদেব-কৃষ্ণভক্তগণেরই নামান্তর ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

পতঞ্জলির আবির্ভাবকালের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে (খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে) ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় গ্রীক সাহিত্যে বাসুদেব-কৃষ্ণপূজক গোষ্ঠী সম্বন্ধে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করিয়া পঞ্চনদ ও সিন্ধুপ্রদেশ জয় করেন, তখন তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ ও অনুচরবর্গের মধ্যে বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার নির্দেশে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বিজয়াভিযান এবং বিজিত দেশ ও উহার অধিবাসিগণ সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং সামাজিক তথ্যবহুল এইসব গ্রন্থ কালক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইলেও, ইহাদের কিছু কিছু অংশ পরবর্তীকালের গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিক এবং ভৌগোলিক গ্রন্থকারগণের লেখার মধ্যে সন্নিবেশিত আছে। এই শেষোক্ত গ্রন্থগুলি নষ্ট হয় নাই, এবং এই সব অংশ হইতে আমরা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক অনেক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারি। বক্ষ্যমাণ বিষয় সংক্রান্ত একটি তথ্য আমরা কুইন্টাস কার্টিয়াস নামক আলেকজাণ্ডারের অভিযান বিষয়ক ঐতিহাসিকের লেখা হইতে পাই। কার্টিয়াস খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের লোক হইলেও ভারতবিজয়ী ম্যাসিডন-বীরের সমসাময়িক লেখকের গ্রন্থ হইতে নিজ গ্রন্থের অনেক বিষয়বস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কাজেই এগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি লিখিতেছেন যে আলেকজাণ্ডারের সহিত পুরুর সংঘর্ষকালে পৌরব সৈন্যেরা হারকিউলিসের (হেরাক্লিস) মূর্তি পুরোভাগে লইয়া বিতস্তা (ঝিলাম) তটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিল; কারণ তাহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল যে পুরোভাগে স্থিত এই দেবতা তাহাদিগকে জয়ী হইতে সাহায্য করিবেন। এই দেবতার মূর্তি ও উহার বাহকগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন

করিবার রীতি তাহাদের মধ্যে ছিল না, এবং ইহা করিলে রাজা তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিতেন। এখন এই মূর্তি যাঁহার তিনি ভারতীয় কোন দেবতা? সত্যই ত তিনি গ্রীক দেবতা হেরাক্লিস নহেন! এখানে বলা আবশ্যক যে গ্রীকগণের মধ্যে বিজিত জাতির কোনও কোনও দেবতার সহিত নিজেদের বিশেষ বিশেষ দেবতার সমন্বয়সাধন করিবার একটি রীতি প্রচলিত ছিল। এ প্রসঙ্গে হেরাক্লিস যে বাসুদেব-কৃষ্ণ সে বিষয়ে অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। পৌরব সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পুরোভাগে ইহার অবস্থান, এবং ইহাকে ত্যাগ করিয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করা যে অত্যন্ত অন্যায় এই বিশ্বাস আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত প্রথমতঃ যুদ্ধে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে পুরু নিজে এবং তাঁহার সৈন্যদলের এক বিশিষ্ট অংশ বাসুদেব-কৃষ্ণোপাসক ছিলেন। বিতস্তাতটবর্তী ভূখণ্ডে যে প্রাচীনকালে বাসুদেবপূজকগণের বসবাস ছিল তাহার ইঙ্গিত আমরা টলেমীর ভূগোলের ভারতসংক্রান্ত অধ্যায় (Book VII) হইতে প্রাপ্ত হই। টলেমী খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের লোক ছিলেন, এবং মিশরদেশের বিখ্যাত নগরী অ্যালেকজন্দ্রিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ভারতে কখনও আসেন নাই সত্য, তথাপি তাঁহার ভূগোলগ্রন্থের ভারত সম্বন্ধীয় অংশে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—এই সকল যে তিনি ভারত-পর্যটক ও ভারতীয় গ্রন্থাদির সাহায্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি লিখিতেছেন যে বিতস্তাতীরবর্তী প্রদেশে পাণ্ডবগণের বসবাস ছিল ('Around the Bidaspes was the country of the Pandoouoi' ; Mc Crindle's *Ptolemy*, Majumdar Sastri's Edition, p. 121)। কিন্তু সত্যই ত পাণ্ডবগণ পঞ্জাবের অধিবাসী ছিলেন না! টলেমীর এই উক্তি কি তাহা হইলে অসত্য? আমার মনে হয় তাহা নহে; বিদেশী গ্রন্থকার একটু পরোক্ষভাবে

ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন যে উক্ত প্রদেশের ঐ অংশে বাসুদেব-কৃষ্ণের ভক্তগণ বসবাস করিতেন। পাণ্ডবভ্রাতৃগণ অপেক্ষা অধিকতর কৃষ্ণভক্ত আর কাঁহারা ছিলেন? কুইণ্টাস কার্টিয়াসের এবং টলেমীর উক্তিদ্বয় যদি আমরা অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করি, তাহা হইলে সুপ্রাচীন কালে ঐ অঞ্চলে বাসুদেব পূজকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি।

মহাভারত ও পুরাণাদি ভারতীয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে বাসুদেব-কৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তগণ মধ্যদেশের অন্তর্বর্তী মথুরা ও তন্নিটস্থ অঞ্চল-সমূহের অধিবাসী ছিলেন। এ তথ্য আমরা খৃষ্টপূর্বকালের গ্রীক গ্রন্থ (মেগাস্থিনিস প্রণীত ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তক *Indica*) হইতেও প্রাপ্ত হই। ইহা সর্বজনবিদিত যে গ্রন্থকার মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে সিরিয়ারাজ সেল্যুকস কর্তৃক দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে ভারত সম্বন্ধীয় বহু তথ্য সংকলন করিয়া একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন। সম্পূর্ণ গ্রন্থটি অধুনা পাওয়া না যাইলেও, ইহার অনেক ছোট ছোট অংশ কুইন্টাস কার্টিয়াস, স্ট্র্যাবো, ডিওডোরাস, অ্যারিয়ান প্রভৃতি তাঁহার পরবর্তী গ্রীক লেখকগণের পুস্তকের মধ্যে উদ্ধৃত আছে। অ্যারিয়ান কর্তৃক এইরূপ একটি উদ্ধৃতি আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানাইয়া দেয়। মেগাস্থিনিস বলিতেছেন যে "'সৌরসেনয়' নামক একটি ভারতীয় জাতি হেরাক্লিস দেবতাকে বিশেষ সম্মান করিত। ইহাদের 'মেথোরা' এবং 'ক্লিসোবোরা' নামক দুইটি নগরী ছিল, এবং ইহাদের দেশের মধ্য দিয়া 'জোবারিস' নদী প্রবাহিত হইত"। বহুপূর্বে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন যে এখানে 'সৌরসেনয়' এবং 'হেরাক্লিস' বলিতে 'সাত্বত' (অপর প্রতিশব্দ বৃষ্ণি, অন্ধক প্রভৃতি) এবং বাসুদেব-কৃষ্ণকে বুঝা যাইতেছে। কৃষ্ণ সাত্বত বা বৃষ্ণিবংশসম্ভূত ছিলেন, এবং তাঁহার ভক্ত-

গণকেও ঐ বংশের লোক বলিয়া বিদেশী গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিয়াছেন। দুইটি সহর ও নদীটির নাম যে যথাক্রমে মথুরা, কৃষ্ণপুর এবং যমুনা সে সম্বন্ধে সংশয়ের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। মথুরা নগরী এবং যমুনা নদী আজিও বর্তমান, তবে কৃষ্ণপুর নগরের বর্তমান রূপ কি তাহা সন্দেহের বিষয়। কেহ কেহ মনে করেন যে মথুরা হইতে কিছু দূরে যমুনার পরপারে অবস্থিত গোকুল নামক নগরীটিই প্রাচীন কালের কৃষ্ণপুর।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় হইতে প্রথম শতকের মধ্যে ভারতবর্ষে,—বিশেষ করিয়া ইহার উত্তরাংশে,—ভাগবত ধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থিতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বর্তমান। প্রধানতঃ এগুলি প্রাচীন কালের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালিপি। এগুলির মধ্যে অশোকের প্রস্তরানুশাসনসমূহ প্রাচীনতম বলিয়া পরিগণিত। ইহাদের কোনওটিতে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত ধর্মসম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও, এগুলির দুএকটি হইতে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়গুলির অস্তিত্বের কথা জানা যায়। তাঁহার দ্বাদশতম প্রস্তরানুশাসনে (Rock Edict XII) খোদিত আছে যে লোকেরা সাধারণতঃ বিশেষ বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। সম্রাট্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে যবনদের দেশ ব্যতীত এমন কোনও দেশ নাই যেখানে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ নাই, এবং এইসব দেশে এমন কোনও স্থান নাই যেখানে লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। ব্যক্তিগত ধর্ম সম্বন্ধে উদারমতাবলম্বী অশোক তাঁহার প্রজাদিগকে আদেশ করিতেছেন যে তাহাদের মধ্যে কেহ যেন নিজের ধর্মসম্প্রদায়ের অহেতুকী প্রশংসা এবং অন্যের ধর্ম-সম্প্রদায়ের নিন্দা না করে। 'আত্মপাষণ্ডপূজা পরপাষণ্ডগরহা' তাঁহার মতে এক অমার্জনীয় অপরাধ, যদিও এ অপরাধ ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়-ভুক্ত জনগণ অনেকেই করিয়া থাকেন। 'পাষণ্ড' কথাটির অর্থ অশোকের সময়ে বিভিন্ন ধর্মসংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর অন্তর্গত

ব্যক্তিবিশেষকেই বুঝাইত,—তখনও ইহার অর্থের বিশেষ অবনতি ঘটে নাই (আধুনিক অর্থ—'অত্যন্ত দুষ্টপ্রকৃতির ব্যক্তি')। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে অশোকের এই শিলানুশাসন তৎকালে পরোক্ষভাবে ভাগবত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দুইটি শিলালেখ,—একটি বেসনগরে অপরটি নাগরীতে প্রাপ্ত,—এ সম্বন্ধে আমাদের কি জানাইয়া দেয় উহার আভাস পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। বেসনগর (প্রাচীন কালের বিদিশা) এবং নাগরী (সেকালের মধ্যমিকা) মধ্যদেশে অবস্থিত ছিল, এবং তত্তৎস্থানে যে সে সময়ে বাসুদেব পূজকগণ অবস্থান করিতেন সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। বেসনগর ও তন্নিকটবর্তী স্থানে আরও কয়েকটি অর্ধভগ্ন প্রস্তরনির্মিত স্তম্ভশীর্ষ ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে সেখানে যে বাসুদেব-কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ (বলরাম) এবং বাসুদেব-কৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্নের (কামদেবের) মন্দির ছিল ইহা অবগত হওয়া যায়। যবন হেলিওদোর কর্তৃক উচ্ছ্রিত লেখ-সম্বলিত গরুড়ধ্বজের কথা বলিয়াছি। সেখানে প্রাপ্ত অন্য দুইটি অর্ধভগ্ন 'ধ্বজ' (capital of a column)—তালধ্বজ এবং মকরধ্বজ জানাইয়া দিতেছে যে বাসুদেবাগ্রজ সঙ্কর্ষণের এবং বাসুদেবপুত্র প্রদ্যুম্নের মন্দিরও সে সময়ে বেসনগরে বর্তমান ছিল, এবং এই মন্দিরগুলির সম্মুখে তালধ্বজ ও মকরধ্বজ সম্বলিত স্তম্ভদ্বয় বাসুদেবভক্তদিগের দ্বারা উচ্ছ্রিত হইয়াছিল। গরুড় যেমন বাসুদেব-কৃষ্ণের অন্যতম লাঞ্ছন, তেমনি তাল (বৃক্ষ) এবং মকর যথাক্রমে সঙ্কর্ষণের (বলরামের) ও প্রদ্যুম্নের লাঞ্ছন। কৃষ্ণ ও বলরামের মন্দির যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে নির্মিত হইত তাহা আমরা পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতেও জানিতে পারি। পতঞ্জলি পাণিনির সূত্র 'অল্পাচ্তরস' (২. ২, ৩৪)-এর ব্যাখ্যাকালে ধনপতি (যক্ষরাজ কুবের), রাম (বলরাম) এবং কেশবের (কৃষ্ণের) মন্দিরে (তিনি মন্দিরের পরিবর্তে 'প্রাসাদ' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন) ভক্তসংসদে মৃদঙ্গ, শঙ্খ,

তূণবাদি বাদ্য ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন (মৃদঙ্গশঙ্খতূণবাঃ পৃথগ্‌ভনদন্তি সংসদি প্রাসাদে ধনপতিরামকেশবানাম্)। পূজা মন্দিরে ভক্তগণের দলবদ্ধ হইয়া দেবতারাধানা কালে গীতবাদ্য করার রীতি যে কত প্রাচীন উহা পতঞ্জলির এই উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায়। দেবতার মন্দিরকেও যে প্রাচীনকালে প্রাসাদ বলিয়া বর্ণনা করা হইত, উহা আমরা বেসনগরে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব প্রথম-দ্বিতীয় শতকের আরও দু একটি অর্ধভগ্ন শিলা-লেখ হইতে জানিতে পারি। এগুলিতে ভগবানের উত্তম প্রাসাদের (ভগবতো পাসাদোতমস) কথা লেখা আছে। বলা বাহুল্য এই ভগবান হেলিওদোরের দেবতা দেবদেব বাসুদেব ব্যতীত অন্য কেহ নহেন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকের কয়েকটি লেখ,—এগুলি সাধারণতঃ মথুরায় এবং তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে পাওয়া গিয়াছিল, আমাদিগকে সেকালের বাসুদেব-কৃষ্ণপূজা সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য প্রদান করে। একটি হইতে জানা যায় যে শক মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোডাশের শাসনকালে মথুরায় ভগবান বাসুদেবের মহাস্থানে (মন্দিরে) একটি প্রস্তরনির্মিত তোরণ, এবং বেদিকা (মন্দিরবেষ্টনী) নির্মিত হয়। লেখসম্বলিত প্রস্তরখণ্ডটি বহুস্থানে ভাঙ্গিয়া গেলেও লেখার যে অংশ-টুকুর পাঠোদ্ধার সম্ভব উহা হইতে স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ এবং লুডার্স্‌ উক্ত তথ্য সংকলন করেন। চন্দমহাশয়ের পাঠ একটু ভিন্নরূপ ছিল, তিনি 'শৈলম্' কথাটির পরিবর্তে 'চতুঃশালম্' পড়িয়াছিলেন। কিন্তু লুডার্স্‌-সমর্থিত পাঠ 'শৈলম' গ্রহণযোগ্য এবং এই লেখটির অর্থ এই যে মন্দির, বেদিকা ও তোরণ প্রস্তরনির্মিত ছিল (Ep. Ind., Vol. XXIV, pp. 208-09)। বাসুদেব-কৃষ্ণ-জীবনীপূত মথুরার পবিত্র স্থানে বাসুদেবপূজক ভক্তগণের দেবারাধনার জন্যই এই সব নির্মিত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ কেহ বৈদেশিক ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে মথুরার নিকটবর্তী মোরা নামক গ্রামে প্রাপ্ত একটি অর্ধভগ্ন শিলালেখ (উহাও উক্ত মহাক্ষত্রপ

ষোডাশের সমকালীন) অনেক আলোকপাত করে। ইহার বিষয়বস্তু এই : মহাক্ষত্রপ রজুবুলের পুত্র মহাক্ষত্রপ ষোডাশের শাসনকালে তোষা-নাম্নী এক (খুব সম্ভব শক) মহিলা একটি প্রস্তরনির্মিত মন্দিরে (শৈলদেবগৃহে) বৃষ্ণিবংশীয় ভগবান পঞ্চবীরের দীপ্তিসমুজ্জ্বল সুনির্মিত পাঁচটি প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশের এই পাঁচজন বীরের (hero gods) যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে প্রথমে কিছু সন্দেহ ছিল। মনীষী লুডার্স অপর এক জার্মান পণ্ডিত অ্যাল্সডর্ফের মতানুযায়ী এই বীর কয়জনের বলদেব (সঙ্কর্ষণ—বলরাম), অক্রূর, অনাধৃষ্টি, সারণ ও বিদূরথ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই যে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মধ্যে বলদেব ব্যতীত অপর চারিজনের এমন পৌরাণিকী প্রসিদ্ধি বা দেবত্ব ছিল না, যাহাতে তাঁহাদের পূজাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠার কথা উঠিতে পারে। প্রতিমাগুলি লেখটিতে 'অর্চা' (অর্থাৎ 'পূজা-যোগ্যা') বলিয়া অভিহিত এবং প্রস্তরনির্মিত দেবগৃহে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সুতরাং বলদেব ছাড়া যে অন্য চারিজনের উক্ত পরিচয় ভ্রমাত্মক ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। সৌভাগ্যবশতঃ ইহাদের যথার্থ পরিচয় আমরা অতি প্রাচীন ও প্রামাণ্য বায়ুপুরাণ হইতে জানিতে পারি। ইহার সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের সূত কথিত প্রথম শ্লোকটি এইরূপ :

> মনুষ্যপ্রকৃতীন্ দেবান্ কীর্তমানান্নিবোধত।
> সঙ্কর্ষণ বাসুদেব প্রদ্যুম্ন সাম্ব এব চ।
> অনিরুদ্ধশ্চ পঞ্চৈতে বংশবীরাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥

নৈমিষারণ্যে সমবেত পুরাণকাহিনী শ্রবণেচ্ছুক ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া সূত বলিতেছেন : 'মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতাদিগের (যে সকল নাম) কীর্তিত হইতেছে উহা আপনারা শ্রবণ করুন। সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব এবং অনিরুদ্ধ,—(ইহারাই) পাঁচজন বংশের বীর বলিয়া

প্রকীর্তিত হইয়া থাকেন।' এই বংশ যে বৃষ্ণিবংশ ইহা সুনিশ্চিত, ইহারাও সংখ্যায় পাঁচজন এবং বীর বলিয়া বর্ণিত। অতএব বায়ুপুরাণের এই উদ্ধৃতি হইতে আমরা মোরা শিলালেখের পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারি। ইহারা লেখটিতে ভগবদাখ্যানে সম্মানিত হইয়াছেন, পুরাণের উক্তিটিতেও তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে পুরাণকার তাঁহাদিগকে শুধু দেবতা বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু তাঁহারা আদিতে যে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কর্মবীর মনুষ্য ছিলেন ও পরে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা 'মনুষ্য-প্রকৃতি' এই বিশেষণটির দ্বারা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষে যুগে যুগে এইরূপ ধর্ম ও কর্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা তাঁহাদের আদর্শ জীবনধারা ও মহোন্নত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টার ফলে তাঁহাদের সমকালীন এবং পরবর্তীকালের ভারতবাসীদিগের দ্বারা দেবতাস্থানে সম্মানিত ও পূজিত হইয়া আসিতেছেন। সঙ্কর্ষণ-বাসুদেবাদি বীরগণকে কেন্দ্র করিয়া যে ভক্তসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহাই পরে বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত হয়।

বায়ুপুরাণের নির্দেশ আরও একটি বিষয়ে আমাদিগকে সচেতন করে। বাসুদেব-কৃষ্ণ পূজা প্রথমে 'বীরপূজা', এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৃষ্ণিবংশের এই বীরগণ পরস্পরের সহিত আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ। সঙ্কর্ষণ বাসুদেবের অগ্রজ, সেজন্য তাঁহার নাম সর্বাগ্রে, তারপর পর্যায়ক্রমে বাসুদেব, বাসুদেবের রুক্মিণীগর্ভজাত পুত্র প্রদ্যুম্ন, তাঁহার অন্যতমা স্ত্রী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র সাম্ব এবং পরিশেষে তাঁহার পৌত্র (প্রদ্যুম্নের পুত্র) অনিরুদ্ধের নাম সন্নিবেশিত। এক্ষেত্রে এই নামগুলির পারম্পর্য আমাদিগকে স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিতেছে যে এই 'বীর-দেবতা'গণের মধ্যে আত্মীয়তার ধারানুযায়ী সঙ্কর্ষণের নামই সর্বপ্রথম হওয়া উচিত, এবং যে সব ক্ষেত্রে সঙ্কর্ষণের নাম প্রথমে অবস্থিত সেই সেই স্থানে যে এই সব দেবতাদিগের মনুষ্য বা 'বীর' প্রকৃতির

উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হরিবংশ-পুরাণ, ন্যায়ধম্মকহাও, উবসগদশাও, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত্র প্রভৃতি জৈন গ্রন্থের অনেক স্থলে প্রসঙ্গতঃ 'বলদেবপমোখ্খা পঞ্চমহাবীরাঃ' এই পদটি পাওয়া যায়। এই সব গ্রন্থে কোথাও বলদেব (সঙ্কর্ষণ) ব্যতীত অপর চারি মহাবীরের স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া নাই, যদিও তাঁহারা যে বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সাম্ব ও অনিরুদ্ধ ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। এই যুক্তি অনুসরণ করিয়া ইহা বলা যায় যে এই নামগুলির মধ্যে একাধিক নামের উল্লেখ এই পর্যায়ক্রমে কোনও শিলালেখে পাওয়া গেলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে সেখানে দেবতাবাচক এই বংশবীরদিগকেই বুঝানো হইতেছে। নাগরী (প্রাচীন মধ্যমিকা) গ্রামে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি শিলালেখের কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে দুইজন দেবতার, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের, (ভগবদ্ভ্যাং সঙ্কর্ষণ-বাসু-দেবাভ্যাং) পূজা-শিলাপ্রাকারের কথা বলা হইয়াছে। উপরিলিখিত যুক্তি অনুযায়ী ইহারা যে 'বীর-দেবতা' পর্যায়ভুক্ত ইহা মনে করা সঙ্গত। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় ইহাদিগকে 'ব্যূহ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং যেহেতু 'ব্যূহবাদ' (পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের অন্যতম বিশিষ্ট মতবাদ—উহার বিষয় একটু পরেই আলোচিত হইবে) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লিখিত হয় নাই, সেহেতু এ গ্রন্থ খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বেশ কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া তিনি মনে করিয়াছিলেন। গীতার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার কালনির্ণয় সম্বন্ধে ভাণ্ডারকরের উপরিলিখিত যুক্তির কোনও মূল্য নাই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষের দিকের আর একটি শিলালেখেও (ইহা সাতবাহন রাজবংশের তৃতীয় রাজা শ্রীসাতকর্ণির মহিষী নায়নিকার, ইহা সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে অবস্থিত নানাঘাট গুহায় খোদিত আছে) এই দুই বীরদেবতার নাম আছে (সংকংসন-বাসুদেবানং)।

বায়ুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক কয়টি এবং মোরা শিলালেখ হইতে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নির্দেশ পাওয়া যায়। উহা এই যে পাঞ্চরাত্র ব্যূহবাদের সম্যক্ প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত বাসুদেবপূজকগণের মধ্যে কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সাম্বের পূজা তাঁহার অপর তিন জন নিকট আত্মীয়ের পূজার সহিত সমভাবে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যূহবাদের সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সাম্বপূজা পাঞ্চরাত্রমতাবলম্বী ভাগবতদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ভবিষ্য, বরাহ, সাম্ব পুরাণাদি গ্রন্থে সাম্বের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়া তাঁহাকে সম্প্রদায়ভুক্ত দেবগোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার যথার্থ কারণ কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তিনি যে কৃষ্ণের অনার্যবংশীয়া স্ত্রী জাম্ববতীর (ঋক্ষরাজ জাম্ববানের ভগিনী) গর্ভজাত পুত্র ইহাই কি তাঁহার বহির্গমনের অন্যতম কারণ? অথবা অন্য প্রধান সাম্প্রদায়িক দেবতা শিবের প্রসাদে তিনি জাম্ববতীর ক্রোড়ে আসিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহাকে বৈষ্ণব দেবতাগণের মধ্যে অপাংক্তেয় করিয়াছিল? আবার ইহাও সম্ভব যে শকদ্বীপীয় প্রথায় সূর্যপূজা ভারতে প্রচলনকল্পে তাঁহার সক্রিয় অংশই তাঁহার অসম্মানের কারণস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু এ সবই ত পরবর্তীকালের পৌরাণিক কাহিনী ও কিংবদন্তী, তাঁহারই সম্বন্ধে এগুলি প্রয়োগ করিবার যথার্থ কারণ কি? কারণ যাহাই হউক না কেন, তিনি—এমনকি তাঁহার স্ত্রীও—যে খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের প্রথম কয় শতকেও কিছু সম্মান ও পূজা পাইতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বরাহমিহির তাঁহার বৃহৎসংহিতা গ্রন্থের প্রতিমালক্ষণ অধ্যায়ে প্রদ্যুম্ন ও তাঁহার স্ত্রীর প্রতিমার সঙ্গে সাম্ব ও তাঁহার স্ত্রীর মূর্তির এই বর্ণনা দিয়াছেন—

> সাম্বশ্চ গদাহস্তঃ প্রদ্যুম্নশ্চাপভৃৎ সুরূপশ্চ।
> অনয়োঃ স্ত্রিয়ৌ কার্যৌ খেটকনিস্ত্রিংশধারিণ্যৌ॥

খৃষ্টাব্দ গণনা আরম্ভকালের কিছু পূর্ব হইতে খৃষ্টাব্দ প্রচলনের পর

দুই এক শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে বাসুদেব-বিষ্ণু-নারায়ণ কেন্দ্রিক ভক্তিধর্মের প্রতিষ্ঠার এবং তাহাতে 'বীরপূজা' বা 'বীরবাদের' একটি সুনির্দিষ্ট স্থানের কথা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচিত হইয়াছে। এখন পাঞ্চরাত্র মতবাদের অন্যতম বিশিষ্ট অঙ্গ ব্যূহবাদের পরিচয় প্রদান আবশ্যক। ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে পূর্ণাঙ্গ পাঞ্চরাত্র মতবাদের কিঞ্চিৎ অনুশীলন প্রয়োজন। সাত্বত, পরম, পৌষ্কর, অহির্বুধ্ন্য প্রভৃতি প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতা গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে পাঞ্চরাত্র দর্শনের আদি প্রকৃতি অন্য অনেক ধর্মদর্শনের প্রারম্ভের ন্যায় সৃষ্টিপ্রপঞ্চের কারণ নির্ণয় প্রচেষ্টার সহিত সংশ্লিষ্ট। এই ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাচীন চিন্তানায়কগণের মতে প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টি আরম্ভের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর বাসুদেব-কৃষ্ণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাদি সব কিছুই লীন বা নিহিত ছিল। স্থাবর জঙ্গমাদি জগৎপ্রপঞ্চ সৃজন করিবার বাসনা যখন সেই নির্বিকল্প ভগবানের হৃদয়ে উদিত হয়, তখন তিনি এই ইচ্ছা তাঁহার একমাত্র মহাশক্তি শ্রীদেবীতে সম্প্রসারিত করেন। সম্প্রসারিত শক্তির নামই ইচ্ছাশক্তি (পাশ্চাত্য দর্শনের মতে ইহাই *causa efficiens* বা efficient cause)। ভগবানের শক্তিরূপা শ্রীদেবীতে যুগপৎ উপাদানীভূত কারণ (*causa materialis* বা material cause) এবং যান্ত্রিক কারণ (*causa instrumentalis* বা instrumental cause) নিহিত থাকে। এই তিন শক্তির বা ত্রয়ীর একত্র মিলন ঘটিলেই শুদ্ধ সৃষ্টির (pure creation) মূল সংস্থাপিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মতে এই তিনটি কারণ একত্রীভূত না হইলে কোনও কিছুরই সৃজন সম্ভব নহে। ভারতীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে একটি ঘট সৃষ্টির মূলে ঘটকারের ঘট প্রস্তুত করিবার সংকল্প, মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি ঘটের উপাদান সংগ্রহ এবং ঘট তৈয়ারীর জন্য কতকগুলি বিশেষ প্রক্রিয়া, এই তিনটি কারণের সংযোগ বর্তমান। কিন্তু ইহা ত হইল জড় সৃষ্টির একটি ক্ষুদ্রতম নিদর্শন। পাঞ্চরাত্র মতে

শুদ্ধসৃষ্টির প্রথম প্রকরণে ছয়টি আদর্শ গুণের উদ্ভব হয়। আদর্শ গুণগুলির নাম—জ্ঞান, বল, বীর্য, ঐশ্বর্য, শক্তি এবং তেজস্; এই গুণের আবির্ভাবের নাম হইল 'গুণোন্মেষদশা'। ছয়টি গুণ আবার প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত,—একটি ভাগের নাম বিশ্রমভূমি (stage of rest) এবং অপরটির নাম শ্রমভূমি (stage of action)। প্রথম ভাগের গুণগুলির নাম জ্ঞান, ঐশ্বর্য ও শক্তি, এবং দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্গত অপর তিনটি গুণের নাম বল, বীর্য ও তেজস্। এই বিভক্ত গুণগুলির বিপরীতধর্মীয় (এক ভাগের একটির সহিত অন্য ভাগের একটির) মিলনপ্রবণতা বশতঃ পূর্বভাগের প্রথমটির সহিত দ্বিতীয় ভাগের প্রথমের, এবং এই নিয়মে দ্বিতীয়টির সহিত দ্বিতীয়ের এবং তৃতীয়টির সহিত তৃতীয়ের মিলন সাধিত হয়। এই ছয় গুণ সমষ্টিগতভাবে এক দেবতাকে এবং বিভক্তভাবে দুই দুই গুণের সমষ্টি এক এক দল ক্রমে তিনটি দেবতাকে আশ্রয় করে। ব্যূহ কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল 'বিশেষ বা বিচ্ছিন্নভাবে মিলিত হওয়া' (বি-উহ, ইংরাজীতে ইহা এরূপে প্রকাশ করা যায়—shoving asunder)। গুণগুলির সামগ্রিক ও বিচ্ছিন্ন একত্বই যুগপৎ ইহার তাৎপর্য প্রকাশ করে। ষাড়্গুণ্যময় দেবতাই বাসুদেব, এ প্রসঙ্গে ব্যূহ বাসুদেব রূপে কল্পিত, এবং তাঁহার অগ্রজ সঙ্কর্ষণ দ্বিতীয় ব্যূহ, ইহাতে জ্ঞান ও বল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রদ্যুম্ন তৃতীয়, ইহাতে ঐশ্বর্য ও বীর্য, এবং তাঁহার পৌত্র অনিরুদ্ধ চতুর্থ ব্যূহ, ইহাতে শক্তি ও তেজস্ এক এক সমষ্টিরূপে প্রকটিত। ইহাই গুণাতীত শ্রীভগবান 'পর' বাসুদেবের ব্যূহ রূপ, এবং ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে একমাত্র ঈশ্বরের চতুর্ব্যূহ বা চতুর্মূর্তি কল্পনায় ষাড়্গুণ্যময় ব্যূহ বাসুদেবই আদি পুরুষ। তাঁহা হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের ক্রমিক বিকাশ, এবং এই পর্যায়ে সাম্বের কোনও স্থান নাই। শ্রীভগবানের এই ক্রমবিকাশমান মূর্তিগুলির (emanatory forms) সঙ্গে

পাঞ্চরাত্র সংহিতাকারগণ একটি দীপশিখা হইতে পর পর কয়েকটি দীপশিখা প্রজ্বলনের উপমা দিয়াছেন। দীপ্তি দান ও দাহিকা শক্তি বিষয়ে যেমন একটি শিখা হইতে অপরটির কোনও পার্থক্য নাই, তেমন প্রভু বাসুদেবের এই ভিন্ন কয়টি রূপের মধ্যে অন্তর্নিহিত কোনও বিভেদ নাই, তবে গুণবিকাশের তারতম্য এবং আবির্ভাবের পর্যায়ক্রম বর্তমান। মহাভারতের শান্তিপর্বান্তর্গত নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে, বেদান্তসূত্রের (২. ২. ৪২) শঙ্কর কৃত শারীরক ভাষ্যে এবং দু একটি পাঞ্চরাত্র সংহিতায় সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের আর এক রূপের কথা বলা হইয়াছে। এই কল্পনানুযায়ী সঙ্কর্ষণ জীবাত্মার, প্রদ্যুম্ন মন বা বুদ্ধির এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ঞানের প্রতীক। পাঞ্চরাত্র মতে মনে হয়, এই তিন ব্যূহ জীব, মন বা বুদ্ধি এবং অহংজ্ঞানের অধিষ্ঠান দেবতারূপে কল্পিত হইয়াছিল। বিষ্বকসেন সংহিতায় এই কথাই প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ ইহা বলা আবশ্যক যে কালক্রমে চতুর্ব্যূহ চতুর্বিংশতি ব্যূহ বা চতুর্বিংশতি মূর্তিতে পরিণত হয়, এবং আদি চতুর্মূর্তি যেমন বাসুদেব-কৃষ্ণ ও তাঁহার তিনজন নিকট আত্মীয়ের নামের সহিত জড়িত, তেমনি অপর বিংশতি মূর্তি তাঁহার সমসংখ্যক বিশিষ্ট নামাবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট। নাম কয়টি, এই যথা—উপেন্দ্র, হরি, অনন্ত, কেশব, নারায়ণ, ত্রিবিক্রম, জনার্দন, পদ্মনাভ, দামোদর, অচ্যুত, মাধব, গোবিন্দ, মধুসূদন, অধোক্ষজ, শ্রীধর, বিষ্ণু, বামন, হৃষীকেশ, পুরুষোত্তম ও নৃসিংহ। বলা বাহুল্য সংখ্যার এই বিবৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ছিল ; তবে সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শনসমূহ হইতে জানা যায় যে গুপ্তযুগের শেষের দিকে ইহার পূর্ণ বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অবহেলিত সাম্বের এই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার মধ্যেও কোনও স্থান হয় নাই। শুদ্ধসৃষ্টির পর্যায়ক্রমে ভগবানের যে ব্যূহ রূপ কল্পনার কথা আলোচিত হইল, উহা বিকশিত পাঞ্চরাত্র মতবাদে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। সৃষ্টি-

প্রকরণের পরবর্তী পর্যায়গুলির আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গের বিষয়ীভূত নহে। শ্রীভগবানের ব্যূহরূপ একটি বিশিষ্ট রূপ,—তাঁহার পঞ্চরূপের অপর চারিটির কথা পরেই বলা হইতেছে।

পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণ তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতাকে পঞ্চরূপে ভাবনা করিতেন। এই পঞ্চরূপ যথাক্রমে,—পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামিন্ এবং অর্চা। পাঞ্চরাত্রিকেরা শ্রীভগবানের 'পর' রূপের 'পর বাসুদেব' আখ্যা দিয়াছেন: ইনি সেই একমাত্র ঐশী সত্তা যাঁহাতে সব কিছুই লীন আছে, এবং যিনি পর্যায়ক্রমে শুদ্ধ সৃষ্টি হইতে জড় সৃষ্টি পর্যন্ত সব কিছুরই আদি কারণ। এ কথা একটু আগেই বলিয়াছি, এবং শ্রীভগবানের ব্যূহ রূপের কথাও বিশদভাবেই আলোচিত হইয়াছে। পতঞ্জলির একটি উক্তি, 'জনার্দনস্ত্বাত্ম চতুর্থ এব' (মহাভাষ্য, ৩, ১৪৬—পাণিনি সূত্র ৬. ৩, ৫ এর অন্যতম বার্তিকের ভাষ্য), হইতে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মনে করিয়াছিলেন যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ঈশ্বরের চতুর্ব্যূহ রূপ কল্পনা বাসুদেবপূজকগণের মনে স্থান পাইয়াছিল। রমাপ্রসাদ চন্দের মতে বাদরায়ণের ব্রহ্ম-সূত্রের এক অংশে (২. ২. ৪২ ; *Indo-Aryan Races*, p. 109) এই ব্যূহ রূপ কল্পনার আভাস পাওয়া যায়, অন্ততঃ শঙ্করাচার্যের শারীরক ভাষ্যে এইরূপ ইঙ্গিতই দেওয়া আছে, কিন্তু এত পূর্বে ব্যূহ-বাদের অস্তিত্ব কল্পনা সম্ভব মনে হয় না: কারণ পূর্বেই বলিয়াছি যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতকে এবং খৃষ্টাব্দ আরম্ভের কিছু পরেও 'বীরবাদ'ই ভাগবতগণের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও এই বীরগণের মধ্যে বাসুদেব-কৃষ্ণই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। হেলিওদোর বাসুদেবকেই তাঁহার ইষ্টদেবতা রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে 'দেবদেব' অর্থাৎ অন্য দেবতাদিগেরও পরম দেবতা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাসুদেবের ব্যূহ রূপের পরেই অন্যতম বিশিষ্ট রূপ হইল তাঁহার 'বিভব' রূপ। বিভব কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ

'বিশিষ্ট রূপে আবির্ভাব হওয়া' (বি—ভূ+অল্)। শ্রীভগবান কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পার্থিব রূপ গ্রহণ করিয়া যুগে যুগে মর্ত্যধামে অবতরণ করেন, এবং সেজন্যই তাঁহার বিভব রূপের অপর এক নাম 'অবতার' রূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম কয়টি শ্লোকে এই বিভববাদ বা অবতারবাদের একটি অতি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গসুন্দর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণ কর্তৃক সাত্বত ধর্মের (এখানে 'ইমং যোগং' বলিয়া বর্ণিত) উৎপত্তি, পরম্পরা এবং সাময়িক লয়ের ব্যাখ্যানের বিষয়ে অর্জুনের দ্বিধা ও সন্দেহ শ্রীকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কয়টি শ্লোকের দ্বারা অপনোদন করিয়াছেন :

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বানি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

(গীতা, অধ্যায় ৪, শ্লোকসংখ্যা ৫-৮)

এরূপ অল্প পরিসরে অথচ অতি মনোজ্ঞভাবে বিভব বা অবতারবাদের ব্যাখ্যা কোথাও প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই। যদিও পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়ের এবং মহাকাব্য পুরাণাদি গ্রন্থের কোনও কোনও অংশে ঐশী অবতারগুলির সংখ্যা নির্দেশের চেষ্টা আছে (যেমন সাত্বত ও অহির্বুধ্ন্য সংহিতায় প্রদত্ত অবতারের সংখ্যা ৩৯, মহাভারতের একাংশে ইহার সংখ্যা ৬ অপরাংশে ভিন্নরূপ, ভাগবতপুরাণে ২২ বা ২৩), কিন্তু গীতাকার ইহার কোনও সংখ্যা নির্দেশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। ভাগবতপুরাণেও এক স্থানে লিখিত আছে—

অবতারাঃহ্যসংখ্যেয়াঃ। ইহাই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুব এবং পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবের অবতার সম্বন্ধীয় যথার্থ পরিকল্পনা। শ্রীভগবান গীতার দশম অধ্যায়ে ১৯ হইতে ৩৮ সংখ্যক শ্লোকগুলিতে নিজের বিভূতিব কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়া ৪০-১ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে বলিতেছেন,

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তরো ময়া॥
যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা॥
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসম্ভবম্॥

বিভূতিযোগে শ্রীভগবানের এই উক্তি এবং চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে সাধুদিগেব সংবক্ষণ, দুর্বৃত্তদিগের দমন এবং ধর্মসংস্থাপনেব জন্য তাঁহাব যুগে যুগে অবতীর্ণ হওয়াব কথা স্মবণ করিলে অবতাবদিগেব সংখ্যা নির্দেশেব কথা উঠিতেই পাবে না। ভগবানেব পাঞ্চরাত্রে কল্পিত চতুর্থ রূপ তাঁহার অন্তর্যামী রূপ। যদিও ব্রহ্মন-আত্মনেব অন্তর্যামিত্ব কল্পনা প্রসঙ্গ সবপ্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদে পাওয়া যায় (৩৭, ৫.২৩), তথাপি বাসুদেব-কৃষ্ণরূপী ভগবানেব অন্তর্যামী রূপের বৈশিষ্ট্য গীতার দুএকটি অংশে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ত আকারে বোধ হয় ইহা আর কোথাও বর্ণিত হয় নাই। বিভূতিযোগের ২০ সংখ্যক শ্লোকে ভগবান বলিতেছেন, 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ'। গীতাব শেষ অধ্যায়ের ৬১ সংখ্যক শ্লোকেও ভগবানেব অন্তর্যামিত্বের কথা সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্তর্যামী শব্দের প্রকৃত অর্থ এই, 'যিনি অন্তবে থাকিয়া সকলকে পরিচালনা করেন'। ইহাই পরিস্ফুট হইয়াছে এই শ্লোকটিতে,—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥

শ্রীভগবানের পাঞ্চরাত্রকল্পিত শেষ রূপটি তাঁহার অর্চা রূপ। অর্চাব অর্থ হইল পূজাযোগ্যা প্রতিমা। বেদান্তে যদিও নির্গুণ ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়-

গোচর বাহ্য রূপ কল্পনার কথা সমর্থিত হয় নাই বা নিন্দিত হইয়াছে ('ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য', কাঠক উপনিষদ, ২.৩, ৯ ; শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪.২০), তথাপি পাঞ্চরাত্র-ভাগবত ধর্মাবলম্বিগণ তাঁহাদের ইষ্টদেবতার এবং তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশের প্রতিমাসমূহ নির্মাণ করাইয়া দেবগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা অর্চনাদি করিতেন। তাঁহাদের মতে এই সকল দেবমূর্তি ভগবানের 'শ্রীবিগ্রহ' বা মঙ্গলময় শরীর, এবং এগুলি ভক্তদিগের ভগবৎ সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণার জন্য বিশেষ অনুকূল। এই অধ্যায়ের শেষে খুব সংক্ষেপে ভাগবত-বৈষ্ণবদিগের পূজার জন্য ব্যবহৃত মূর্তিনিচয়ের কথা আলোচিত হইবে। প্রসঙ্গতঃ এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু সম্প্রদায়গুলির মধ্যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণই ভারতবর্ষে মূর্তিপূজার বহুল সম্প্রসারণে এক প্রধান ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইহাও স্পষ্টভাবে জানানো প্রয়োজন যে ভাগবতগণ সমর্থিত দেববিগ্রহ পূজা ইংরাজী ভাষায় বর্ণিত ধর্মাচরণ ঠিক 'idolatry'র পর্যায়ে পড়ে না।

গুপ্তযুগে ও উহার অব্যবহিত পরে ভাগবত সম্প্রদায়ের যে প্রভূত সম্প্রসারণ ঘটিয়াছিল সে বিষয়ে তৎকালীন সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব হইতে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। গুপ্তসম্রাট্‌গণের মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের মুদ্রায় এবং শিলালেখে পরমভাগবত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই বংশের প্রথম চন্দ্রগুপ্তের ধর্মমত কি ছিল, উহা সঠিক জানা না গেলেও অনুমান করা অযৌক্তিক নহে যে তিনি ভাগবত ছিলেন। তৎপরিগৃহীত উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত এক অসাধারণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ মহাপুরুষ ছিলেন। বীর্যে, শৌর্যে, কবিত্বে, সুকুমার কলাশিল্পে তাঁহার পারদর্শিতার বিষয় আমরা হরিষেণ প্রশস্তি (এলাহাবাদ ফোর্টে রক্ষিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ শিলালেখ) এবং তাঁহার সুবর্ণমুদ্রা হইতে জানিতে পারি। যদিও এগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে ভাগবত বা পরমভাগবত বলিয়া বর্ণনা করা হয় নাই,

তথাপি মনে হয় তিনি ঐ ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কারণ তাঁহার মুদ্রাগুলিতে গরুড়ধ্বজ বর্তমান। তবে তাঁহার অসাধারণত্বের জন্য তিনি হরিষেণ প্রশস্তিতে পরোক্ষভাবে ভগবান বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত হইয়াছেন। প্রশস্তিকার তাঁহাকে অচিন্ত্যপুরুষ আখ্যা দিয়াছেন এবং দুষ্টের শাসন এবং শিষ্টের পালনের জন্যই যে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল এ কথাও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন (সাধ্বসাধূদয়-প্রলয়-হেতুপুরুষস্যাচিন্ত্যস্য ; হরিষেণ প্রশস্তি, ২৫, Fleet, *Gupta Inscriptions*, p. 8)। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত যে পরমভাগবত ছিলেন উহা তাঁহার শিলালেখ ও মুদ্রারাজি হইতে প্রমাণিত হয়। Bayana (Bharatpur, Rajasthan) Hoardএ প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রাগুলির মধ্যে এক জাতীয় মুদ্রা তাঁহার ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। এই মুদ্রাগুলির এক পৃষ্ঠে জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে দণ্ডায়মান ভগবান বিষ্ণুর সম্মুখে মহারাজাধিরাজ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যকে করজোড়ে অবস্থিত দেখিতে পাওয়া যায় ; তৎকালীন ব্রাহ্মী অক্ষরে এখানে তাঁহাকে 'চক্রবিক্রম' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম কুমারগুপ্তও প্রধানতঃ বৈষ্ণব ছিলেন ; তৎসম্বন্ধীয় শিলালেখ ও তাঁহার মুদ্রাগুলি হইতে উহা জানা যায়। কিন্তু, তিনি যে কার্তিকেয় দেবতারও পূজক ছিলেন, ইহা আমরা তন্নামাঙ্কিত কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রার এক পৃষ্ঠে দৃশ্যমান উক্ত দেবতার পূজামূর্তি হইতে জানিতে পারি। বাসুদেব-বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতাতে মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের ভক্তির কথা বোধ হয় কয়েকটি শিলালেখে তাঁহার 'পরমদৈবত' উপাধি হইতে জানা যায়। পরবর্তী সম্রাট্‌গণের মধ্যে অনেকেই ভাগবত বা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন ; এ তথ্য তাঁহাদের মুদ্রাদি আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। তবে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে তাঁহারা ধর্ম সম্বন্ধে উদারনীতিক ছিলেন, এবং গুপ্তসাম্রাজ্যে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে

কোনও বাধা ছিল না। যেমন বাসুদেব-বিষ্ণু ও তাঁহার ব্যূহ ও বিভবরূপের প্রতিমাবলী এবং মন্দিরাদি সে সময়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল, তেমনই বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্তাদি ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্গত উপাসকদিগের ধর্মকার্যের জন্যও বিভিন্ন দেবতা, বুদ্ধ, জিনাদির মূর্তি ও মন্দির নির্মাণকার্য বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। এই সকলের অধুনাপ্রাপ্ত ধ্বংসাবশেষ আজিও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে।

গুপ্তযুগে ও ইহার অব্যবহিত পরে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ধর্মমত সম্পর্কিত বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ রচিত হয়। পূর্বে এইরূপ কয়েকটি যথা সাত্বত, জয়, পৌষ্কর, পরম, অহির্বুধ্ন্য প্রভৃতি সংহিতার কথা বলা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে যেগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, উহারা গুপ্তযুগে রচিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের কারণ নাই। উহাদের ভাষা ও রচনাশৈলীই ইহার প্রমাণ স্বরূপ। প্রাচীনতম গ্রন্থগুলি যে উত্তর ভারতে রচিত হইয়াছিল শ্রেডার প্রমুখ পণ্ডিতগণ একথা স্বীকার করেন। ভারতের উত্তরতম অংশ কাশ্মীর উপত্যকা বোধ হয় এই জাতীয় গ্রন্থের অনেকগুলির উৎপত্তিস্থল। উক্ত অনুমানের অন্যতম কারণ এই যে এখানে আদি মধ্যযুগীয় এমন অনেক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যেগুলি একটি বিশিষ্ট উপায়ে অন্যতম প্রধান পাঞ্চরাত্র ধর্মমত ব্যূহবাদের বাহ্য রূপ প্রকাশ করে। এ মূর্তিগুলির কথা পরেই বলিতেছি। প্রসঙ্গতঃ ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে গুপ্ত ও উহার পরবর্তী যুগে পাঞ্চরাত্র ব্যূহবাদ অনেকাংশে অন্তর্হিত হয় এবং উহার স্থলে অবতারবাদ প্রাধান্য লাভ করে। ইঁহারা আরও বলেন যে অবতারপূজার দ্বারা ব্যূহপূজার অপসারণ ভাগবতধর্মের বৈষ্ণবধর্মে রূপান্তরের অন্যতম বিশিষ্ট লক্ষণ।[১]

[১] 'The disappearance of the independent worship of the Vyūhas excepting Vāsudeva was perhaps one of the first

কিন্তু এই মত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ ব্যূহপূজার সাহিত্যগত বর্ণনা বিভব বা অবতারপূজার বর্ণনার সহিত গুপ্তযুগে রচিত প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র গ্রন্থসমূহেই পাওয়া যায়। সত্য বলিতে কি খৃষ্টপূর্ব যুগে এবং খৃষ্টাব্দ গণনার অব্যবহিত পরে ব্যূহবাদের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ নাগরী শিলালেখে উক্ত সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পূজাকে ব্যূহপূজার প্রাচীনতম নিদর্শন মনে করিয়া যে ভুল করিয়াছিলেন, উহা পূর্বে বলা হইয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে তখন মোরা শিলালেখের প্রকৃত তাৎপর্যের এবং বায়ু-পুরাণোক্ত মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতা বা পঞ্চবীরের বিষয় কিছু জানা ছিল না। সুতরাং তৎকালীন সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন উহাতে কিছু ভুলভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। ব্যূহ ও বিভবপূজা যে গুপ্তযুগে ও উহার বহু পরবর্তী কালেও ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবধর্মের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত ছিল উহা পূর্বোক্ত পাঞ্চরাত্র গ্রন্থাদি ও সেকালের অধুনা সংরক্ষিত মূর্তি ও মন্দিরসমূহ প্রমাণিত করে। গুপ্তযুগেই পাঞ্চরাত্র মতবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করে, এবং ব্যূহবাদ পাঞ্চরাত্র ধর্মদর্শনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়।

এখন এই ধর্মাবলম্বিগণের ইষ্টদেবতা বাসুদেব-বিষ্ণু-নারায়ণের প্রতিমাসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলা আবশ্যক। নাগরী শিলালেখোক্ত ভগবান সঙ্কর্ষণ-বাসুদেব, বেসনগরের হেলিওদোর পূজিত দেবদেব বাসুদেব এবং মোরা শিলালেখের ভগবান পঞ্চ বৃষ্ণিবীর

---

fruits of the growing popularity of the Avatāras. The ousting of the Vyūhas by the Avatāras was one of the characterristic signs of the transformation of Bhāgavatism into Vishṇuism.' H. C. Raychaudhuri, *Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect*, 2nd Edition, p. 176.

কি ভাবে রূপায়িত হইয়াছিলেন উহা সঠিক জানিবার আজ কোনও উপায় নাই। দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মনে করিতেন যে নাগরী বা বেসনগরে এই সব দেবতার কোনও মূর্তি ছিল না, তাঁহারা তাঁহাদের ভক্তগণ দ্বারা অমূর্ত প্রতীকের (aniconic symbol এর) মাধ্যমে পূজিত হইতেন। কিন্তু এই মত গ্রহণীয় নহে, কারণ অল্পকাল পরের মোরা শিলালেখ হইতে আমরা পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের পাঁচটি সুন্দর প্রতিমার পাষাণনির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠার কথা জানিতে পারি। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে পঞ্চাল দেশীয় শাসক বিষ্ণুমিত্রের তাম্রমুদ্রায় বিষ্ণুর একটি অস্পষ্ট মূর্তি খোদিত আছে। খৃষ্টাব্দ আরম্ভের পরে প্রথম দুই তিন শতাব্দীর বিষ্ণুমূর্তি খুব অল্পই পাওয়া গিয়াছে। মধ্যভারতে অবস্থিত ভিলসার (প্রাচীন বিদিশা) অনতিদূরবর্তী উদয়গিরি পর্বতের কয়টি গুহামন্দিরের গাত্রে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ (শঙ্খচক্রগদাধারী) 'স্থানক' মূর্তি, তাঁহার অনন্তশয়ন মূর্তি এবং বরাহ অবতারের মূর্তি খোদিত দেখা যায়। এগুলি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে গুপ্ত প্রাধান্যের সময়েই নির্মিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগে ও ইহার পরে বিষ্ণুমূর্তির বিভিন্ন বিভাগের কথা তৎকালে রচিত পুরাণ, পাঞ্চরাত্র ও মূর্তিতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায়; তখনকার কালের বিভিন্ন বিভাগীয় বিষ্ণুমূর্তি আজিও ভারতের ও ভারতের বাহিরের বহু চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে অবস্থিত মন্দিরসমূহের অভ্যন্তরে ও মন্দির-গাত্রে এখনও এই সব মূর্তি দেখা যায়। ভগবদ্ভক্তগণের নিকট ইহাদের উপযোগিতা অত্যধিক ছিল, এবং খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া নবম-দশক শতক কিংবা তাহার পরেও রচিত বহু গ্রন্থে নানাবিধ বিষ্ণুমূর্তি বিষয়ক পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এই সব বিবরণের মধ্যে বিষ্ণুধর্মোত্তর (ইহা একটি উপপুরাণ), হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্র, অগ্নিপুরাণ, বৈখানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থের এতৎসম্বন্ধীয় বিবৃতি খুব প্রামাণ্য। এ স্থলে এই সব নানাপ্রকার বিবরণের আলোচনা

অসম্ভব এবং কতকটা অপ্রাসঙ্গিক। সেজন্য এই সকল গ্রন্থ হইতে গৃহীত বিষ্ণুমূর্তি বিষয়ক একটা সাধারণ বিবৃতি এখানে প্রদান করা হইতেছে। বৈখানসাগমে (ইহা মনে হয় দক্ষিণ দেশীয় একটি পাঞ্চরাত্র আগম) প্রদত্ত বিষ্ণুমূর্তির প্রধান বিভাগ 'ধ্রুববের' বলিয়া বর্ণিত। ইহার আবার প্রধান চারিটি উপবিভাগ যথা 'যোগ', 'ভোগ', 'বীর' ও 'অভিচারিক,' ; এই চারিটির প্রত্যেকে তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত, যথা 'স্থানক', 'আসন', এবং 'শয়ন'। এই দ্বাদশটি উপবিভাগের প্রত্যেকটি আবার 'উত্তম', 'মধ্যম' এবং 'অধম' এই তিন পর্যায়ে বিভক্ত। ধ্রুববেরের যোগাদি বিভাগের তাৎপর্য এই যে বাসুদেব-বিষ্ণু-নারায়ণ-ভক্তগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে, যথা যোগসাধনায় পারদর্শিতার জন্য, পার্থিব ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, শৌর্যবীর্য লাভ কামনায় এবং নিজ শত্রুর অনিষ্টসাধন বাসনায়, যোগাদি বিভিন্ন বিভাগীয় বিষ্ণুমূর্তি পূজায় উৎসাহ পাইতেন। স্থানক, আসন ও শয়ন বিভাগ তিনটি যথাক্রমে দণ্ডায়মান, আসীন এবং শয়ান বিষ্ণুমূর্তিগুলিকেই বুঝাইত। উত্তম, মধ্যম ও অধম বিভাগের তাৎপর্য এই যে, যেগুলিতে প্রধান দেবতা সর্বাপেক্ষা অধিকাংশ 'পরিবারাদির' দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন সেগুলি হইত উত্তম, যেগুলিতে বিষ্ণুপরিবারের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প সেগুলি মধ্যম, এবং সর্বশেষে যে সকল মূর্তিতে সর্বাপেক্ষা অল্পসংখ্যক বিষ্ণু পরিবার প্রদর্শিত হইত উহারা অধম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইত। অবশ্য ইহাও সত্য যে গ্রন্থোক্ত বিভাগ উপবিভাগগুলির বর্ণনানুযায়ী কিছু সংখ্যক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেলেও, প্রত্যেকটির যে প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, এমন নহে। স্থানক মূর্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পাওয়া যায়, এবং এগুলির মধ্যে ভোগ মূর্তিই বেশী। শয়ন (অনন্তশয়ন বা শেষশয়ন) মূর্তি দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ বিষ্ণুমন্দিরে প্রধান বিগ্রহ রূপে বিরাজিত ; স্থানীয় বৈষ্ণবভক্তগণের নিকট ইনি রঙ্গস্বামী বা রঙ্গনাথ নামে পরিচিত। বৈষ্ণব 'ধ্রুববের'-

গুলি এক হিসাবে ভগবানের 'পর' প্রকৃতি রূপায়িত করিতেছে বলিয়া অনুমান করা যায়।

দেবতার ব্যূহ প্রকৃতির রূপায়ণ পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবেরা এক বিশিষ্ট উপায়ে করিয়াছিলেন। পূর্বে বলা হইয়াছে যে আদিতে ব্যূহ চারিটি এবং পরে ক্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু উহা চতুর্বিংশতি ব্যূহ বা মূর্তিতে পরিণত হয়। চতুর্ব্যূহ বা চতুর্মূর্তি (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) একত্রে রূপায়িত করিবার এক অদ্ভুত পন্থা পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। শঙ্খ, চক্র, গদা, এবং পদ্ম বা পদ্মাঙ্কধারী চতুর্ভুজ দেবতার চারিটি বক্ত্র দেখানো হইয়াছিল; মাঝের (সামনের) মুখটি সৌম্য মনুষ্যবদন (ইহা ব্যূহ বাসুদেবের), দক্ষিণের মুখটি সিংহাস্য (ইহা সঙ্কর্ষণের), বামেরটি বরাহবদন (ইহা প্রদ্যুম্নের) এবং পিছনের মুখটি রৌদ্র কপিল রাক্ষস মুখ (ইহা অনিরুদ্ধের)। এই অদ্ভুত রূপায়ণের আধ্যাত্মিক রহস্য সহজে বোধগম্য হয় না, তবে বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ এবং পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রাদিতে ইহার অন্তর্গূঢ় ভাবধারা আলোচিত আছে। চতুর্বিংশতি মূর্তি রূপায়ণের পন্থা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। এগুলির প্রত্যেকটি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ (প্রায়শঃ) স্থানক মূর্তি, কিন্তু ইহারা একাস্য, কোনওটিতেই একটি মনুষ্যমুখের অধিক দেখানো নাই। ইহাদের একটি হইতে অপরটির পার্থক্য এই জাতীয় বিভিন্ন মূর্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, এই চারিটি লাঞ্ছনের ভিন্নরূপ অবস্থানের দ্বারা নির্ণীত হইত। পূর্বোক্ত চতুরাস্য বিষ্ণু চতুর্মূর্তি কাশ্মীর প্রদেশের অবন্তীস্বামী মন্দিরে এবং অন্যত্র অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। পাঞ্চরাত্র মতবাদের ক্রমিক বিকাশ ও বিস্তার যে এই প্রদেশে সংঘটিত হইয়াছিল ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। চতুর্বিংশতি মূর্তি পর্যায়ের বিভিন্ন অধুনাপ্রাপ্ত মূর্তির কোনওটিকেও গুপ্তযুগের বলা চলে না, তবে আদি মধ্যযুগ ও

তৎপরবর্তীকালের এই জাতীয় মূর্তি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে পাওয়া গিয়াছে, এবং ভারতীয় ও অন্যদেশীয় বহু চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে।

বাসুদেব-বিষ্ণুর 'বিভব' বা 'অবতার'মূর্তির প্রাচীনত্ব তাঁহার 'ব্যূহ'-মূর্তি অপেক্ষা অধিক। উদয়গিরি গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের বরাহ অবতারের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে মধ্যভারতের দেবগড়ে দশাবতার মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের তিনটি পার্শ্বদেবতারূপে দেবতার তিন প্রকার মূর্তি ইহার বহির্ভাগের তিন অংশে স্থাপিত আছে। একটি শেষশায়ী বা অনন্ত-শয়ন (এই মূর্তি যে ধ্রুববেরর পর্যায়ের অন্যতম উহা পূর্বে বলিয়াছি), অপরটি করি-বরদ বা গজেন্দ্রমোক্ষ (ইহা ঠিক অবতার পর্যায়ে না পড়িলেও কতকটা সেই জাতীয়,—গজেন্দ্র গ্রাহ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জলমধ্যে আকর্ষিত ও নিমজ্জিত হইবার কালে একান্তে ভগবানের স্তব করিলে দেবতা আবির্ভূত হইয়া উহাকে রক্ষা করেন), এবং তৃতীয়টি নর-নারায়ণের যুগ্ম মূর্তি। সাত্বত সংহিতার উনচল্লিশ সংখ্যাযুক্ত অবতার তালিকামধ্যে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। ইহাদের কথা কিছু পূর্বে বলা হইয়াছে। এলাহাবাদের অনতিদূরে গাড়ওয়া গ্রামস্থ গুপ্তযুগের বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি দশাবতারের পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি পৃথক্ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির ভাস্কর্যশিল্প খুব উচ্চস্তরের। দক্ষিণ ভারতেও এইরূপ অনেক প্রাচীন মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দশাবতারের মূর্তি নির্মাণশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ছিল। মৎস্য কূর্ম বরাহাদি অবতার-বিগ্রহগুলি কখনও কখনও মৎস্য কূর্ম ও বরাহের আকারানুযায়ী নির্মিত হইত। আবার অন্যক্ষেত্রে প্রথম দুইটির উপরার্ধের পরিবর্তে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির উপরার্ধ সংযোজিত থাকিত। বরাহ অবতারের বেলায় বরাহাননযুক্ত একটি বিশাল দ্বিভুজ বা চতুর্ভুজ মনুষ্যমূর্তি নির্মিত হইত। উদয়গিরি গুহাগাত্রের বরাহ শেষোক্ত

শৈলী অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। নরসিংহ সাধারণতঃ হিরণ্যকশিপু বধ-নিরত সিংহাস্য নরমূর্তি। বামন ও ত্রিবিক্রম পঞ্চমাবতার মূর্তির দুইটি বিভিন্ন রূপ। প্রথমটি প্রার্থী ব্রাহ্মণবালক ব্রহ্মচারীর, এবং দ্বিতীয়টি ঊর্ধ্বে পদোৎক্ষেপকারী দেবতার বিরাট্ রূপ। অপরগুলি সবই নররূপী ও সাধারণতঃ দ্বিভুজ। ভার্গবরাম পরশুহস্ত, রাঘবরাম ধনুর্ধারী, এবং বলরাম হলধর; কোথাও কোথাও বলরামের পরিবর্তে কৃষ্ণকে অবতাররূপে দেখানো হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর সর্বপ্রথম রূপায়ণ মথুরা চিত্রশালায় সংরক্ষিত খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের একটি অর্ধভগ্ন প্রস্তরফলকে খোদিত দেখা যায়। কৃষ্ণ বলরামের বাল্যলীলার বহু ঘটনা প্রস্তরফলকে খোদিত হইয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের অনেক বিষ্ণুমন্দিরের শোভাবর্ধন করিত। এগুলিকে কৃষ্ণায়ন চিত্রাবলীরূপে বর্ণনা করা যায়; ইহার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রাজস্থানের অন্তর্ভুক্ত মাণ্ডোরে (প্রাচীন মাণ্ডব্যপুর—ইহা যোধপুর এলাকাভুক্ত) পাওয়া গিয়াছিল। বুদ্ধ বহু প্রাচীনকালেই দশাবতার তালিকাভুক্ত হইয়াছিলেন। সাত্বত সংহিতার পূর্বোক্ত উনচল্লিশ অবতারের তালিকার মধ্যে তাঁহার স্থান ছিল, যদিও শ্রেডার প্রমুখ পণ্ডিতেরা ইহা বুঝিতে পারেন নাই। এই তালিকায় তিনি 'শান্তাত্মন্' নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহৎসংহিতার প্রতিমা লক্ষণ অধ্যায়ে বুদ্ধমূর্তির বর্ণনাকালে বরাহমিহির তাঁহাকে 'শান্তমন' আখ্যা দিয়াছেন। বলা বাহুল্য শান্তাত্মন্ ও শান্তমন একার্থবাচক এবং ভগবান্ বুদ্ধচরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। অগ্নিপুরাণে দশাবতার প্রতিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বুদ্ধ শান্তাত্মা বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বর্ণনা আর কিছু হইতে পারে না। ভবিষ্যৎ অবতার কল্কির যে রূপ বাঙ্গালী কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, ঐ ভাবেই তিনি ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে রূপায়িত হইয়াছেন।

ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত শ্রীভগবানের ধ্যান ধারণাদি-সহায়ক যে সব প্রতিমানিচয়ের সামান্য পরিচয় উপরে দেওয়া হইল, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তেরা তাঁহার 'পর', 'ব্যূহ', 'বিভবাদি' রূপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নিদর্শনের উপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করিতেন। তাঁহারা এই সব নানাপ্রকার মূর্তিপূজা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, পরন্তু শালগ্রামশিলাদি অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও তাঁহাদের ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে মূর্তি বা প্রতীকপূজক বলিয়া যদি কেহ নিন্দা করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগের প্রতি সুবিচার করিবেন না। তাঁহাদের সত্যকারের মত, পথ ও আদর্শের বিষয় চিন্তা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে এই সম্প্রদায়ভুক্ত জ্ঞানী, গুণী ও শ্রদ্ধাভক্তিশীল মনীষিগণ মূর্ত বা অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমে সেই একমাত্র ঈশ্বর পরমপিতার পূজার্চনা করিয়া মানসিক প্রীতি পাইতেন। এই ধর্মকার্য তাঁহাদের অন্তর্নিহিত ভগবদ্ভক্তির অন্যতম বাহ্য প্রকাশ ছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

বিষ্ণু—বৈষ্ণব

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়—ভাগবতপুরাণ ও আড়বারগণ

উত্তর ভারতে ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-বৈষ্ণব সম্প্রদায় কিরূপ ভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছিল ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে ভারতের দক্ষিণাংশে এই ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় সুপ্রাচীন কাল হইতে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল ইহার আলোচনা করা আবশ্যক। খৃষ্টপূর্ব যুগের এতৎসম্পর্কিত সাহিত্য বা প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে অবস্থিত নানাঘাট গুহার একটি শিলালেখের কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলিয়াছি। ইহা সাতবাহন বংশের তৃতীয় নৃপতি প্রথম সাতকর্ণির মহিষী নায়নিকা বা নাগনিকার। ইহাতে সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় কোনও বিশেষ তথ্য পাওয়া না গেলেও, ইহা আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব পূজা বা ভক্তির পাত্র ছিলেন, এবং সঙ্কর্ষণের নাম পূর্বে থাকাতে ইহা অনুমিত হয় যে এক্ষেত্রে তাঁহারা 'বীর' পর্যায়ভুক্ত দেবতা ছিলেন। খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে অন্ধ্রদেশে ভাগবত ধর্মের অস্তিত্বের কথা আমরা অন্যতম সাতবাহন নরপতি গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ সাতকর্ণির একটি লেখ হইতে জানিতে পারি,—ইহা কৃষ্ণা জিলার চীন গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে এতদ্বিষয়ক পর্যাপ্ত তথ্য পাওয়া না গেলেও ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অংশে এই ধর্ম সুপ্রাচীনকালে ন্যূনাধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালের (খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের ও উহার পরের) তামিল সাহিত্য, লেখমালা ও মূর্তি-মন্দিরাদি হইতে ইহার সম্যক্ প্রচলনের বিষয় জানা যায়।

খৃষ্টাব্দের প্রথম কয় শতাব্দীতে যে দ্রবিড়দেশে কৃষ্ণ-বলরামের পূজা প্রচলিত ছিল এ তথ্য আমরা প্রাচীন তামিল সাহিত্য হইতে জানিতে পারি। শিলপ্পদিকারম এবং অন্যান্য তামিল কবিতাগ্রন্থ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে মতুবা, কাবিরিপদ্দিনম্ এবং অন্যান্য নগরে কৃষ্ণ-বলরামের প্রাচীন মন্দির বর্তমান ছিল। কাবিরিপদ্দিনমের কবি করিকন্নম্ তদ্দেশীয় দুইজন রাজাকে ভগবান কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাসুদেব-কৃষ্ণাদির পূজা যে এ অঞ্চলে খৃষ্টপূর্বযুগেও প্রচলিত ছিল উহা পরোক্ষভাবে দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত হয়। দক্ষিণদেশীয় পাণ্ড্য জাতির নাম মহাভাষ্যে উদ্ধৃত বার্তিক (পাণ্ডোরড্যন্) অনুযায়ী 'পাণ্ডু' শব্দ হইতে উৎপন্ন। মেগাস্থিনিসও এই পাণ্ড্যদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাহারা ভারতীয় হেরাক্লিস অর্থাৎ বাসুদেব-কৃষ্ণের দুহিতৃবংশজাত ছিল। এই কিংবদন্তীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য কিছু না থাকিলেও ইহাতে কৃষ্ণের সহিত পাণ্ড্যদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণের পূজ্যপূজক সম্পর্ক সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকিতে পারে। আবার ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে প্রধান পাণ্ড্যনগরী মতুরার নাম মথুরা হইতে উদ্ভূত। মথুরা যে কৃষ্ণভক্ত সাত্বতগণের বাসভূমি ছিল ইহা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তিতে কাঞ্চীদেশের পল্লববংশীয় রাজা বিষ্ণুগোপের নাম পাওয়া যায়: ইহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর চালুক্যরাজ মঙ্গলেশ তাঁহার শিলালেখে পরম ভাগবত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই সময়কার বাদামি প্রভৃতি চালুক্যদেশীয় মন্দিরগাত্রে খোদিত বৈকুণ্ঠ বা বিষ্ণু চতুর্মূর্তি, কৃষ্ণলীলা বিষয়ক প্রস্তর-চিত্রাবলী, এবং সপ্তম শতকের মহাবলীপুরস্থিত মন্দিরসমূহের নানাবিধ বিষ্ণুমূর্তি তৎকালে এই ধর্মের বহুল প্রতিষ্ঠার কথা প্রমাণিত করে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দীর এই সকল ভাস্কর্য নিদর্শন হইতে ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই সময়ের কয়েক শতাব্দী পূর্ব হইতেই

এই ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায় দক্ষিণ ভারতের অংশবিশেষে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণবধর্মের প্রাচীনকাল হইতে প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে আরও অনেক সাহিত্যগত নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রামাণ্য পাঞ্চরাত্র সংহিতাসমূহের অধিকাংশই যে উত্তর ভারতে রচিত হইয়াছিল ইহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। শ্রেডার প্রমুখ মনীষিগণ অনুমান করেন যে ঈশ্বর, উপেন্দ্র, বৃহদ্‌ব্রহ্ম প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র গ্রন্থগুলি দ্রবিড়দেশে রচিত হইয়াছিল। আবার ইহাও হইতে পারে যে এই সংহিতাগুলি এবং আরও অনেক এ জাতীয় গ্রন্থ উত্তর ভারতে প্রথমে রূপ পাইলেও পরে দ্রবিড়দেশীয় বৈষ্ণব ভক্তগণ কর্তৃক পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে রূপায়িত হয়। এই রূপায়ণে সাম্প্রদায়িক ভক্তিবাদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, এবং ইহা নানা ভাবে ও নানা ভঙ্গীতে ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এই বিখ্যাত গ্রন্থটি মহাপুরাণ পর্যায়ভুক্ত হইলেও ইহাকে এক হিসাবে পাঞ্চরাত্র-ভাগবত সংহিতাসমূহের অন্যতম বিশিষ্ট সংহিতা বলিয়া বর্ণনা করা অসমীচীন মনে হয় না। ইহার দ্বাদশটি স্কন্ধান্তর্গত প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে অনেক সংস্করণে ইহাকে মাত্র মহাপুরাণ আখ্যাই দেওয়া হয় নাই, পরন্তু ব্যাস-নির্মিত (বৈয়াসকী) পারমহংসী সংহিতা আখ্যাও দেওয়া হইয়াছে। শ্রেডার নির্দিষ্ট পাঞ্চরাত্র সংহিতাগুলির তালিকার (ইহাতে ন্যূনাধিক ২১৬ খানি এই জাতীয় গ্রন্থের নাম থাকিলেও, ইহা সম্পূর্ণ নহে) মধ্যে হংস বা হংস-পরমেশ্বর প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। এমনও হইতে পারে যে ভাগবতদিগের এই বিশিষ্ট ভক্তিগ্রন্থটি এইরূপ কোনও নামে পাঞ্চরাত্র গ্রন্থতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থটি যে আদি মধ্যযুগে ও তৎপরবর্তী কালে বৈষ্ণব ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান সম্পর্কিত অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া

বিবেচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভাগবতধর্মের অভ্যুত্থান ও সম্প্রসারণের প্রথম যুগে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তি-যোগের বিশেষ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এই তিনটি মোক্ষ-বিধায়ক পন্থা পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত হইলেও গীতাতে ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয় বলিয়া ইহা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মমত ব্যাখ্যানকারী সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের কিন্তু এমন একটি সার্বকালিক, সার্বজনীন ও সার্বসম্প্রদায়িক আবেদন ছিল যে ইহা সমগ্র হিন্দু এবং আরও অনেক সম্প্রদায়ের জনগণের নিকট সকল সময়েই বিশেষ আদর পাইয়াছিল। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত ভক্তিবাদের ব্যাখ্যান আদি মধ্যযুগ হইতে বিভিন্ন বৈষ্ণব ভক্তদিগের দ্বারা বহুমানে আদৃত হইয়া আসিতেছিল।

শ্রীমদ্ভাগবতের রচনাকাল অনেক পণ্ডিতের মতে খৃষ্টীয় দশম শতক বা তাহার কিছু পূর্বে। ইহার রচনাস্থান সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, ফারকুহার প্রভৃতি মনীষিগণের ধারণা যে ইহা দক্ষিণ ভারতের কোনও অংশে রচিত হইয়াছিল। প্রথমে ভাণ্ডারকর এবং পরে ফারকুহার এই মহাপুরাণের একাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ভুক্ত কয়েকটি শ্লোকের (৩৮-৪০) প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্লোক কয়টি এই :

কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্।
কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ॥
ক্বচিতক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাসাং মনুজা মনুজেশ্বর॥
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥

শ্লোকগুলির অর্থ এই : "সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে জাত মানবগণ

কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইবেন যেহেতু এ যুগে অনেক নারায়ণ-ভক্ত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। এই মহাত্মাগণ কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করিবেন, কিন্তু দ্রবিড়দেশে তাঁহাদের সংখ্যা অত্যধিক হইবে। সেখানে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, কাবেরী, প্রতীচী প্রভৃতি পুণ্যদায়িনী মহানদীসকল প্রবাহিত ; হে মহারাজ, যে শুদ্ধচিত্ত মানবগণ এই নদীগুলির জল পান করেন তাঁহারা প্রায়ই ভগবান বাসুদেবের ভক্ত হন।" ভাণ্ডারকর প্রমুখ পণ্ডিতগণ যথার্থ অনুমান করিয়াছেন যে এই শ্লোক কয়টিতে পুরাণকার দক্ষিণ ভারতীয় এক বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত গোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতেছেন। এই ভক্তগোষ্ঠীর নাম 'আড়বার', ইঁহাদের বিষয় একটু পরে বিশেষভাবে আলোচিত হইবে।

আমার মনে হয় ভাগবত পুরাণের অষ্টম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়েও আমরা এই আড়বারগণ সম্বন্ধে একটি ইঙ্গিত পাই। গ্রাহ কর্তৃক নিপীড়িত গজেন্দ্রকৃত বিষ্ণুস্তুতিতে দ্রবিড়দেশীয় এই ভক্তগণ সম্বন্ধে অপর এক উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্লোকটি (৮. ৩, ২০) এইরূপ :

> একান্তিনো যস্য ন কঞ্চনার্থং বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবতপ্রপন্নাঃ।
> অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ॥

ইহার অর্থ এই : "ভগবানের শরণাগত ঐকান্তিক ভক্তগণ অন্য কিছুরই কামনা করেন না। তাঁহারা আনন্দসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার অতি বিচিত্র মঙ্গলময় চরিতগাথা কীর্তন করেন।" এখানে এই ভক্তগণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তাঁহারা ঐকান্তিক, ভগবানের সম্পূর্ণ শরণাগত, ভক্তিরসরূপ আনন্দসাগরে নিমগ্ন এবং ভগবানের বিচিত্র মহিমা কীর্তনতৎপর। প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যই আড়বারগণের প্রতি কিভাবে সমধিক প্রযোজ্য উহা একটু পরেই আলোচিত হইবে। ভাগবত পুরাণের বহু স্থানে আরও এমন নিদর্শন

বর্তমান যাহাতে এই পুরাণটি যে দক্ষিণ ভারতে রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।[১] এই পুরাণের পরিশিষ্ট বলিয়া গৃহীত অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের ভাগবত মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থটির উক্ত পুরাণ বর্ণিত ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় একটি বিশেষ উক্তি এই মীমাংসা সমর্থন করে। ভাগবত মাহাত্ম্যের রচয়িতা এ প্রসঙ্গে ভক্তিদেবীকে একটি সুন্দরী যুবতী রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাকে দিয়া বলাইয়াছেন যে তাঁহার জন্মস্থান দ্রবিড়দেশে। ফারকুহার সত্যই বলিয়াছেন যে মাহাত্ম্যকার এইভাবে ভাগবতপুরাণ-বর্ণিত বিচিত্র রূপ সমন্বিত আবেগময় ও ভাবসমৃদ্ধ দক্ষিণ দেশীয় বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্তিরই উল্লেখ করিয়াছেন। প্রধানতঃ আড়বার-গণকে আশ্রয় করিয়াই দক্ষিণ ভারতে ইহার বিশেষ প্রকাশ ঘটিয়াছিল।

ভাগবত পুরাণে আলোচিত ভক্তিবাদ সম্বন্ধে একটু বিশদ অনুশীলন এ ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইহার তৃতীয় স্কন্ধের অন্তর্ভুক্ত কপিল-দেবহূতি সংবাদ বিষয়ক কয়েকটি অধ্যায়ে ভক্তিযোগ নানাপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনের প্রবর্তক বলিয়া খ্যাত ঋষি কপিলকে তাঁহার মাতা দেবহূতির নিকট ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যাতা রূপে উপস্থাপিত করিয়া পুরাণকার একটি বিশেষ ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদী রূপটি এখানে অপসৃত হইয়াছে, এবং ইহার প্রবর্তক বিবিধ প্রকার ঈশ্বরভক্তির সমর্থক ও নির্দেশক রূপে চিত্রিত হইয়াছেন। ভক্তিযোগের এই বিভিন্ন আকার প্রধানতঃ পৃথক্ পৃথক্ ভক্তগোষ্ঠীর নিজ নিজ চরিত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইয়াছে। ঈশ্বরভক্তি প্রথমতঃ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে,—একটি সকাম ও সগুণ এবং অপরটি নিষ্কাম ও নির্গুণ।

---

১ বর্তমান গ্রন্থকার Indian Historical Quarterlyর একটি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে এতৎসম্বন্ধীয় আরও অনেক প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়াছেন (1951, pp. 138-43)।

বলা বাহুল্য প্রথমটি নিম্ন পর্যায়ের এবং দ্বিতীয়টি নিঃশ্রেয়স্ ও পরা পর্যায়ভুক্ত। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ আশ্রয় করিয়া সকাম ভক্তি তিন প্রকার, এবং ইহাদের প্রতিটি আবার তিনভাগে বিভক্ত। সকাম ও সগুণ ভক্তির নয়টি উপবিভাগের রূপ কপিলদেব এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন: যে ভক্ত ঈশ্বর হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করিয়া ঈর্ষা, দ্বেষ, অসূয়াদি হইতে সঞ্জাত ক্রোধের বশীভূত হইয়া অভিচারাদি উদ্দেশ্যসাধনের জন্য শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন, তিনি তামস ভক্ত। রাজস ভক্ত তিনিই যিনি আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া মনে না করিয়া বিদ্যা, যশ, অর্থাদি অর্জনের লোভের বশীভূত হইয়া এই সকল লক্ষ্যসাধনের জন্য দেবতাবিগ্রহাদি পূজা করেন। যিনি কিন্তু ঈশ্বরকে অংশাংশী এবং নিজেকে তাঁহার অন্যতম ক্ষুদ্র অংশ রূপে চিন্তা করিয়া নিজ পাপক্ষালন উদ্দেশ্যে, তাঁহার সমস্ত কর্মাদি ভগবচ্চরণে উৎসর্গীকরণ মানসে এবং নিজের একান্ত ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্যবোধে, শ্রীবিগ্রহাদির মাধ্যমে প্রভুর প্রতি হৃদয়ের ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করেন, তিনিই সাত্ত্বিক ভক্ত। উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সগুণ ঈশ্বরভক্তদের চরিত্রে দুইটি বৈশিষ্ট্য বিরাজ মান: একটি পরমেশ্বরের সহিত ভক্তের অনপনেয় পার্থক্যবোধ এবং অপরটি বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য লইয়াই এই ভক্তগণের ভক্তি-মার্গ অবলম্বন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে ভাগবত পুরাণের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামী আবার এই বিভিন্ন সকাম ভক্তগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিকে তাঁহাদের ঈশ্বর-ভক্তি প্রকাশের বিভিন্ন পন্থানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পন্থাগুলি এই: শ্রবণ (ঈশ্বরের গুণাবলী শ্রবণ), কীর্তন (তাঁহার মহিমা গান), স্মরণ (তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করা), পদসেবন (শ্রীবিগ্রহের পদার্চন), অর্চন (শ্রীবিগ্রহপূজন), দাস্য (নিজেকে প্রভুর দাস মনে করা), সখ্য (প্রভুর সখা রূপে নিজেকে মনে করা) এবং আত্মনিবেদন (আপনাকে প্রভুর নিকট উৎসর্গীকরণ)।

সর্বশ্রেষ্ঠ নির্গুণ ও নিষ্কাম ভক্তির প্রকৃত রূপ পুরাণকার তিনটি শ্লোকে অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :

মদ্গুণ শ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব গুহাশয়ে।
মনো গতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ (৩. ২৯, ১১-৩)

অর্থাৎ, "সর্বভূতেব হৃদয়ে বিবাজমান শ্রীভগবানের গুণ শ্রবণ কবিবামাত্র সমুদ্রাভিমুখে অবিরাম প্রবহমান গঙ্গাম্বুবাশির ন্যায় (নিষ্কাম ভক্তের পরাভক্তি তাঁহার শ্রীচরণাভিমুখে নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে); নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে। এই ভক্তগণের শ্রীপুরুষোত্তমের প্রতি ভক্তির কোনও হেতু নাই (অহৈতুকী) অর্থাৎ স্বতঃপ্রবৃত্ত, এবং ইহা কোনও কিছুবই দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না। (এই নিঃশ্রেয়স্ ভক্তি এরূপ কামনাহীন যে এই সকল ভক্ত) মানবগণকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এবং এমন কি একত্ব পর্যন্তও প্রদান করিতে যাইলেও ইঁহারা এ সকল কিছুই গ্রহণ করেন না, কেবল শ্রীভগবানের ভক্তিপূর্বক সেবাকার্যই প্রার্থনা করেন।" ঋষি কপিল এইরূপ নানাভাবে তাঁহার মাতা দেবহূতিকে ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ভক্তিযোগের এই ব্যাখ্যান কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্বক অনুশীলন করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত ভক্তিযোগ শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত ভক্তিতত্ত্বেব মূল উৎস হইলেও (অনেক স্থলে পুরাণকার গীতার ভাষাও আংশিক ব্যবহার করিয়াছেন) ভাগবতকার ইহাকে এমনভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, যাহাতে দক্ষিণ ভারতীয় বিষ্ণুভক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

ভাবাবেগসমৃদ্ধ বিষ্ণুভক্তি দক্ষিণ ভারতের আড়বারগণের দ্বারা

তামিল ভাষায় রচিত বিষ্ণুস্তুতি বিষয়ক গীতিকবিতাবলীতে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই গীতিকবিতাগুলির নাম নালায়ির বা দিব্য প্রবন্ধম্, এবং শ্রীভগবানের মহিমা ও কীর্তনসমৃদ্ধ এই ভাবাবেগময় কাব্যসমূহেব সংখ্যা ন্যূনাধিক চারি সহস্র। আড়বার শব্দটি তামিল ভাষা হইতে গৃহীত, এবং ইহাব অর্থ এই যে, '(যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিরূপ আনন্দসমুদ্রে) নিমগ্ন'। ভাগবতকার কিরূপে ইহাদের কথাই এই মহাপুরাণের দুইটি অংশে বলিয়াছেন, ইহা একটু আগেই বলিয়াছি। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে দক্ষিণ দেশীয় এই ভক্তগণের অবদান অপরিসীম। অনেকের মতে ইহারা সংখ্যায় দ্বাদশ জন ছিলেন, এবং ইহাদের মধ্যে অস্ততঃ দশ জন বিভিন্ন সময়ে দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড় ভাষাভাষী বিভিন্ন অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেব প্রাদুর্ভাবকাল ঠিক জানা না গেলেও, কৃষ্ণস্বামী আয়াঙ্গাব মহাশয় ইহাদিগকে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম বিভাগের চারিজন সুপ্রাচীন কালেব ; ইহাদেব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব সামান্যই জানা যায়, যদিও ইহাদের বচিত ভক্তিরসাত্মক গীতি-কবিতা কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নাম তামিল ভাষায় এই : পইগই আড়বাব, ভূতত্তাব আড়বার, পে আড়বার এবং তিরুমলিশই আড়বাব। এ নামগুলির সংস্কৃতরূপ যথাক্রমে—সরোযোগিন, ভূতযোগিন, মহদ্‌যোগিন বা ভ্রান্তযোগিন এবং ভক্তিসার। পরবর্তী কালেব পাঁচজন আড়বার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য কিছু কিছু পাওয়া যায়, এবং ইহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন যে দ্রবিড় অঞ্চলেব বাহিরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা অনুমান করা যায়। তিনজন দ্রবিড়দেশীয় আড়বারের নাম, নম্ম্ আড়বার, পেরিয় আড়বার এবং অণ্ডাল ; ইহাদের সংস্কৃত রূপ যথাক্রমে শঠকোপ, বিষ্ণুচিত্ত এবং গোদা। এই তালিকার যে দুজনের তামিল নাম পাওয়া যায় নাই (তাঁহাদের মধ্যে একজন মনে হয় দ্রবিড় দেশের লোক ছিলেন না), তাঁহাদের

নাম মধুরকবি এবং কুলশেখর। ত্রিবাঙ্কুরের (বর্তমান কেরলের) প্রাচীন কালের নরপতি 'বঞ্চী ভূপাল'গণের কাহারও কাহারও নাম কুলশেখর বলিয়া জানা যায় ; তবে আড়বার তালিকাভুক্ত এই কুলশেখর উক্ত রাজগণের মধ্যে ঠিক কোন জন সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। সে যাহা হউক ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে দক্ষিণ ভারতীয় এই বিশিষ্ট ভক্ত-গোষ্ঠীর মধ্যে কেরলদেশের এক প্রাচীন নরপতিও স্থান পাইয়াছিলেন। আবার এই দলে যে চতুর্বর্ণ বহির্ভূত পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত তথাকথিত এক অস্পৃশ্য এবং একটি স্ত্রীলোকেরও স্থান হইয়াছিল উহা আমরা তিরুপ্পাণ আডবার এবং অণ্ডাল কোডাই বা নাচ্চিয়ারের নাম হইতে জানিতে পারি। সর্বশেষ পর্যায়ের তিনজন আড়বারের তামিল ও সংস্কৃত নাম যথাক্রমে তোণ্ডরড়িপ্পড়ি বা ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, তিরুপ্পাণ বা যোগীবাহন এবং তিরুমঙ্গই বা পরকাল। এই তিনটি নামের প্রথমটি প্রকৃত বৈষ্ণবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। ইহার অর্থ 'যিনি ভক্ত-গণের পদরজস্বরূপ'। যথার্থ বৈষ্ণবচরিত্রের ভক্তকবিপ্রদত্ত বর্ণনা এইরূপ—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয় সদা হরি॥' শ্রীভগবানের গুণকীর্তনকারী এই আড়বার নিজেকে এইভাবে তাঁহার দাসানুদাস বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন।

কিংবদন্তী এই যে প্রথম তিনজন আড়বার যথাক্রমে কাঞ্চী, মহাবলিপুরম এবং ময়লাপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সম-সাময়িক ছিলেন, এবং ইহা কথিত আছে যে এক সময়ে তিরুক্কইলুর নামক স্থানে তাঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের দর্শন পান। ভগবদ্দর্শনের আনন্দ তাঁহারা প্রত্যেকে শতসংখ্যক তামিল গীতি-কবিতায় প্রকাশ করেন। এই ভক্তগণ তাঁহাদের গানে নারায়ণকেই পরমেশ্বরের প্রতিভূ রূপে বর্ণনা করেন, এবং দশাবতারের মধ্যে ত্রিবিক্রম (বামন) এবং কৃষ্ণ অবতার দুইটির বিশেষ গুণ কীর্তন করেন। তাঁহাদের গীতিকবিতাসমূহ হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের প্রধান

প্রধান পুরাণগুলির সহিত ন্যূনাধিক পরিচয় ছিল, এবং বৈদিক শাস্ত্রের প্রতিও তাঁহাদের মর্যাদাবোধ ছিল। তবে তাঁহারা প্রধানতঃ শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি এবং অলগরকোইলস্থ তামিল দেশের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে শ্রীবিগ্রহের পূজার্চনায় ও সেবাকার্যে, শ্রীভগবানের নাম ও গুণকীর্তনে এবং ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিতেন। এই গোষ্ঠীব চতুর্থ আড়বার তিরুমলিশই বা ভক্তিসার পূনমল্লী নগরের নিকটবর্তী তিরুমলিশই গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন, এবং তাঁহার জীবনেব কিয়ংকাল বিষ্ণুকাঞ্চীতে অতিবাহিত করেন। তাঁহার একটি গানে তিনি বলিয়াছেন, যে 'যাহারা বিষ্ণুপূজায় রত নহে, তাহারা সত্যই অতি নীচমার্গাবলম্বী'।

পঞ্চম আড়বার নম্ম্ (সাধ্ শঠকোপ) সর্বরকমে এই বিষ্ণু-ভক্তগণের মধ্যে প্রধানতম বলিয়া বিবেচিত হইবাব যোগ্য। তিনি একজন পাণ্ড্য প্রধানের পুত্র ছিলেন, এবং তাম্রপর্ণী নদীতীরস্থ তিন্নেভেল্লি নগরের উপকণ্ঠে কুরুকই বা কুরুকূর সহবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তামিল ভাষায় সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট শ্লোক রচনা করেন, এবং তাঁহার বচিত গীতিকবিতাগুলি কয়েকটি গ্রন্থে সন্নিবদ্ধ। এই গ্রন্থগুলির নাম, তিরুবিরুত্তম, তিরুবাশিরম্, পেরিয় তিরু বন্দাদি এব তিরুবায়মোড়ি। শেষ নামটির অর্থ—'শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী'। তাঁহার গীতিকবিতাসমূহে শ্রীভগবানকে প্রেমিক নায়ক এবং তাঁহার ভক্তগণকে প্রেমিকা নায়িকা রূপে চিত্রিত করা হইয়াছে; তাঁহার প্রচারিত ভগবদ্ভক্তি অতীন্দ্রিয় প্রেমোন্মত্ততার ভাবে পরিপূর্ণ। মধুরকবি তিরুক-কোবিলুর নগরের অধিবাসী এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি শ্রীভগবানকে স্বীয় শ্রেষ্ঠ গুরু রূপে চিন্তা করিয়া ভক্তিঅর্ঘ্যে পূজা করিতেন। কুলশেখরের কথা পূর্বে কিছু বলা হইয়াছে। কেবলের অন্যতম বঞ্চী ভূপাল ভগবান মহাবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, ভগবানের অবতারসমূহের মধ্যে রাঘব রাম অবতার তাঁহার অত্যন্ত

ভক্তির পাত্র ছিলেন। নালায়ির বা দিব্য প্রবন্ধমের যে অংশ তাঁহার রচিত, উহা পেরুমাড়-তিরুমোড়ি নামে পরিচিত।

পেরিয় আড়বার বা বিষ্ণুচিত্ত শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তিনি বহুসংখ্যক গীতিকবিতা রচনা করেন। তাঁহার রচিত দুইটি গীতিকবিতা সঙ্কলনের নাম তিরুপ্‌পল্লাণ্ডু এবং তিরুমোড়ি; শেষেরটি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক গাথায় পরিপূর্ণ। এই আড়বারের কন্যা বলিয়া পরিচিত নবম সংখ্যক আড়বার অণ্ডাল কোডাই বা নাচ্চিয়ারের আনুমানিক জন্মকাল ৭১৬ খৃষ্টাব্দ। তাঁহার রচিত প্রধান দুইটি গীতিগ্রন্থের নাম তিরুপ্‌পাবই মুপ্‌পতু এবং নাচ্চিয়ার তিরুমোড়ি। তাঁহার গানে তিনি নিজেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোন্মত্তা নায়িকা রূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তাঁহার গানগুলি তীব্র ভাবোন্মাদনাপূর্ণ। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় এজন্য যথার্থই বলিয়াছেন যে তাঁহাকে "দক্ষিণ ভারতের মীরাবাই" বলিয়া বর্ণনা করা যায়। পরবর্তী আড়বার তোণ্ডরড়িপ্‌পোড়ি (ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু) বিপ্র নারায়ণ নামেও পরিচিত ছিলেন। মণ্ডঙ্গুড়ি নগরীতে তাঁহার বাস ছিল। বৈষ্ণবদিগের পরম পবিত্র তীর্থস্থান শ্রীরঙ্গম মন্দিরের প্রধান দেবতা রঙ্গনাথ বা রঙ্গস্বামীই তাঁহার ইষ্টদেবতা ছিলেন, এবং শ্রীবিগ্রহের তিনি ভক্তসেবক ছিলেন। তাঁহার রচিত দুইটি গীতিকবিতা গ্রন্থের নাম তিরুমালই অর্থাৎ 'পবিত্র মালা' এবং তিরুপ্‌পই য়েউচিড়্‌ড় অর্থাৎ 'প্রভুর জাগরণ'। একাদশ সংখ্যক আড়বার তিরুপ্‌পাণ ত্রিচিনপল্লীর উপকণ্ঠস্থ উরইয়ুর গ্রামের এক বীণাবাদকের পালিত পুত্র ছিলেন। দশটি শ্লোকে নিবদ্ধ তাঁহার রচিত গীতিকাব্যের নাম অমলন-আদিপিরান।

সর্বশেষ আড়বার তিরুমঙ্গই নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক গীতিকবিতা রচনা করেন; এগুলির সংখ্যা ১৩৬১। তিনি তাঞ্জোর জিলার তিরুবলি তিরুনগরী বা কুরুগুর সহরে জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি অপেক্ষাকৃত নীচ কল্লার (দস্যু) জাতিভুক্ত ছিলেন এবং প্রথমে জনৈক চোল নৃপতির অধীনে কর্ম করিতেন। পরে তিনি পবিত্র শ্রীরঙ্গম নগরে বাস করিতে থাকেন এবং তাঁহার চেষ্টায় সেখানকার বিখ্যাত সপ্তাবরণ রঙ্গনাথ মন্দিরের কয়েকটি অংশ পুনর্নির্মিত হয়। এই মন্দির-সংস্কার কার্যের জন্য তিনি নেগাপতম নগরস্থিত বৌদ্ধ ধর্মস্থানের সুবর্ণনির্মিত বুদ্ধমূর্তি অপহরণ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন। তাঁহার বিষ্ণুভক্তি এত তীব্র ছিল যে শ্রীরঙ্গমস্থ দেবস্থানের সংস্কার সাধন করিতে তিনি এ কার্য করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তৎসম্বন্ধীয় প্রচলিত কাহিনী হইতে ইহা জানা যায় যে উক্ত মন্দিরের সংস্কারকার্যের জন্য তিনি দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন। নম্ম আড়বারের তিরুবায়মোড়ি তাঁহারই চেষ্টায় প্রতি বৎসর রঙ্গনাথ মন্দিরে আনুষ্ঠানিকভাবে পঠিত হইতে আরম্ভ হয়। তিনি ঠিক কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন এ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে তিনি রামানুজের শিষ্য ছিলেন, আবার অন্য পণ্ডিতের মতে তিনি যামুনাচার্যের ঠিক শিষ্য না হইলেও সমকালীন ছিলেন। যামুনাচার্য একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, এবং শেষোক্ত মত গ্রহণ করিলে দ্বাদশতম আড়বারকে ঐ সময়ের বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু রামানুজাচার্যের প্রশিষ্য অমুদন রচিত রামানুজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রামানুজনূর্‌রন্ধাধি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই শ্রীবৈষ্ণবাচার্য তিরুমঙ্গই আড়বারের বহু পরবর্তী কালের লোক ছিলেন, এবং এই আড়বারের কাব্যগ্রন্থ হইতে তিনি নিজ গ্রন্থসমূহের অনেক কিছু উপাদান সংগ্রহ করেন। তিরুমঙ্গই যে যামুনাচার্যের বেশ কিছু পূর্বে আবির্ভূত হন, ইহা আমরা রামানুজের অন্যতম শিক্ষক তিরুক্কোট্টিয়ুর নম্বির লেখা হইতে জানিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন যে এই আড়বার রচিত গীতাবলী তাঁহার সময়ের কিছু পূর্ব হইতেই গুরুপরম্পরাক্রমে পঠিত ও আদৃত হইয়া আসিতেছিল। তিরুমঙ্গই

সম্বন্ধে চলিত একটি কাহিনী হইতে জানা যায় যে তিনি বিখ্যাত শৈব সাধক তিরুজ্ঞান সম্বন্ধরের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে তর্কে পরাজিত করেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই শৈব ভক্ত পল্লব-বংশীয় বিখ্যাত নৃপতি প্রথম নরসিংহবর্মনের সমকালীন ছিলেন। কাঞ্চীর পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মনের রাজত্বকাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ছিল; সুতরাং তিরুমঙ্গই আড়বারের আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন।

আড়বারসম্বন্ধীয় উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে দ্বাদশসংখ্যক এই বিষ্ণুভক্তগণ দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম ও ধর্মসম্প্রদায়ের সম্প্রসারণে এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। অনেকের মতে তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই খৃষ্টীয় সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যকালে দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পরিবেশে আবির্ভূত হইয়া বিষ্ণুপ্রেম ও বিষ্ণুভক্তিতত্ত্বের সম্যক্ সাধনা করেন। প্রায় ঐ সময়েই একদল শৈবভক্ত (ইঁহারা নায়নার নামে পরিচিত— ইঁহাদের বিষয় পরবর্তী এক অধ্যায়ে শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে) দক্ষিণ ভারতে শিবপ্রেম ও শিবভক্তিতত্ত্বের একনিষ্ঠ সাধক রূপে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সকল ঈশ্বর-প্রেমিক সাধকের আবির্ভাব যুগোপযোগী হইয়াছিল। প্রায় সেই-সময়ে, খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে শ্রীশঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ ও মায়া-বাদের বহুল প্রচারের দ্বারা ভক্তিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন। বৈষ্ণব ও শৈব ভক্ত সাধকবৃন্দ এক সহজবোধ্য এবং জনপ্রিয় উপায় অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ঈশ্বরপ্রেম সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেবযজন ও দেবপূজন কার্যে গানের ব্যবহার সুপ্রচলিত ছিল। বিভিন্ন দেবতার

উদ্দেশ্যে বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন কালে উদ্গাতা পুরোহিত সামগান সহকারে দেবযজন করিতেন। পতঞ্জলি যে ধনপতি রাম ও কেশবের মন্দিরে গীতবাদ্য সহকারে দেবপূজার কথা বলিয়াছেন, ইহা প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সাধক ভক্তগণ জনসাধারণের ভাষায় ঈশ্বরপ্রেমমূলক গান রচনা করিয়া এবং মনোহর সুর সহযোগে উহা গাহিয়া শ্রোতাগণের হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেম জাগরিত করিতে অশেষ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচিত গীতাবলী প্রধানতঃ ভাবাবেগ পরিপূর্ণ হইলেও এগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক ধর্মদর্শনের বীজও নিহিত ছিল। গুরুবাদ, অবতারবাদ এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূলসূত্রগুলি নালায়ির প্রবন্ধাবলীর অংশবিশেষে অন্তর্গূঢ় তত্ত্বরূপে বর্তমান ছিল। এই জন্যই বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা নাথমুনি, যামুনাচার্য এবং রামানুজ প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণব আচার্যগণ ইহাদের উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। নাথমুনিই প্রথম নম্ম আড়বারের রচিত প্রেম ভক্তিরসাত্মক গীতিকবিতাগুলি একত্র সংগৃহীত করেন, এবং ইঁহার সময়েই নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সঙ্কলন সম্পন্ন হয়। শ্রীবৈষ্ণবদিগের ধর্মজীবনে ইহাদের প্রভাব অপরিসীম। দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে কালক্রমে এগুলি আনুষ্ঠানিক ভাবে নিত্য পঠিত ও গীত হইবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, এবং শ্রীবৈষ্ণবদিগের বিবাহাদি সংস্কার কার্যেও ইহাদের বিশেষ বিশেষ অংশ পঠিত ও গীত হইতে থাকে। আড়বারগণ রচিত দিব্য প্রবন্ধসমূহ শ্রীরঙ্গম, তিরুপতি প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতে বেদের সমান মর্যাদা প্রদত্ত হইতে থাকে; ইহাদের আর এক আখ্যা 'তামিল বেদ'। বেদপাঠে ব্রাহ্মণেতর জাতির ন্যায্য অধিকার না থাকিলেও এই তামিল বেদে বৈষ্ণব মাত্রেরই অধিকার ছিল। আড়বারগণ ইহার রচয়িতা বলিয়া শ্রীবৈষ্ণবদিগের পূজার পাত্র ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব মন্দিরসমূহে তাঁহাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং এত-

দেশীয় বিষ্ণুভক্তগণ কর্তৃক এই বিগ্রহগুলি নিয়মিত পূজা পাইয়া থাকে। দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব—বিশেষ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবগণের নিকট হইতে তাঁহাদের বিশেষ সম্মান ও পূজা প্রাপ্তির আরও কারণ ছিল। আড়বারগণ সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন, এবং এই প্রগাঢ়-ঈশ্বরানুভূতির বাহ্য রূপ তাঁহাদের নানাবিধ গানে ও মুদ্রাসম্বলিত নর্তনে প্রকাশ পাইত। বিষ্ণু-নারায়ণ-কৃষ্ণরূপী ঈশ্বরের সহিত পুত্র-পিতা-ভর্তা আদি ভিন্ন ভিন্ন মাধুর্যপূর্ণ সম্পর্ক কল্পনা করিয়া, তাঁহাদের অন্তরস্থিত সুতীব্র ঈশ্বরপ্রেম অভিব্যক্ত হইত, এবং অন্তরঙ্গ ঈশ্বরানুভূতির এই অকুণ্ঠ প্রকাশ বৈষ্ণব ভক্তগণকে উদ্বেলিত করিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের ভাবাবেগপূর্ণ নামসংকীর্তন তাহার বহু পূর্ববর্তী এই আড়বারগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিষ্ণু—বৈষ্ণব

বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব আচার্য—তৎপ্রচারিত ধর্মে বৈদান্তিক মতবাদ

বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাসে আড়বারদিগের পরবর্তী যুগ একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যুগ। ইহা পূর্ববর্তী যুগ হইতে কতকাংশে পৃথক্ ছিল। আড়বার প্রবর্তিত হৃদয়াবেগ পরিপূর্ণ বিষ্ণুভক্তির পরিবর্তে দার্শনিক মতবাদ সম্বলিত ভক্তিবাদ বিভিন্ন বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত বিষ্ণুভক্তিতে ভাবাবেগের স্থলে সুচিন্তিত তত্ত্ববিচার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, এবং তাঁহারা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন রূপায়ণে নিজ নিজ মীমাংসা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই সকল আচার্যগোষ্ঠী প্রবর্তিত প্রধান প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির নাম যথাক্রমে—শ্রী সম্প্রদায়, ব্রহ্ম সম্প্রদায়, সনকাদি সম্প্রদায়, রুদ্র সম্প্রদায় এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়। ইঁহাদের দ্বারা ব্যাখ্যাত ভিন্ন ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্মে হৃদয়াবেগের আদৌ স্থান ছিল না বলিলে ভুল করা হইবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে ভাবাবেগ সহকারে ইষ্টনামকীর্তন তাঁহাদের ধর্মাচরণের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য যে এই সকল আচার্য প্রধানতঃ তাঁহাদের একমাত্র উপাস্য দেবতা বিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব-কৃষ্ণকে উপনিষদোক্ত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্মের পর্যায়ে ফেলিয়া তাঁহার সহিত জীবের এবং জগৎপ্রপঞ্চের সম্বন্ধ নির্ণয়ে যত্নবান ছিলেন। এই প্রচেষ্টায় ও স্ব স্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে তাঁহারা যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, উহার প্রত্যেকটির সমর্থন তাঁহারা উপনিষদ বা বেদান্তের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে সচেষ্ট ছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য যখন ভক্তিবাদ পরিপন্থী অদ্বৈত মত

বেদান্তের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, প্রায় সেই সময়ে অধিকাংশ আড়বার স্বরচিত নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সাহায্যে জনসাধারণের অন্তরে বিষ্ণুভক্তির বন্যা প্রবহমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য যুক্তিতর্কের সাহায্যে তৎকালীন বিদ্বজ্জনসমাজে নিজ অদ্বৈত মতের সারবত্তা প্রতিষ্ঠিত করিতে বহু পরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছিলেন। মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র নামক গ্রন্থটিতে যে প্রধান উপনিষদগুলির সারাংশ নিহিত আছে ইহা পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন। শঙ্করাচার্য এই বিখ্যাত গ্রন্থটির 'শারীরক ভাষ্য' নামক নিজকৃত ভাষ্যে যুক্তিতর্কের দ্বারা অদ্বৈত-মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। শঙ্কর পরবর্তী বৈষ্ণব আচার্যগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এই মত খণ্ডন করিয়া ভক্তিবাদ বিদ্বজ্জনহৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে উক্ত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রেরই সাহায্য লওয়া আবশ্যক। সেই জন্যই রামানুজ, মধ্বাচার্য, নিম্বার্ক প্রমুখ আচার্যেরা এই গ্রন্থের স্ব স্ব কৃত ভাষ্যের সাহায্যে অদ্বৈতমতের অসারতা ও নিজ নিজ মতের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের দ্বারা প্রবর্তিত বিভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম প্রধানতঃ তর্ক বিচারের পথে সাফল্য অর্জন করে এবং সেজন্য এগুলির উৎপত্তিস্থল যে মূলতঃ হৃদয় অপেক্ষা মস্তিষ্ক ইহা বলা যাইতে পারে।

উপরে উক্ত পাঁচটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উদ্ভবই সর্বাগ্রে হইয়াছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাথমুনি বা রঙ্গনাথাচার্য। তিনি বীরনারায়ণপুরের (বর্তমান মন্নরগুড়ির) অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্মজীবনের অধিকাংশ কাল শ্রীরঙ্গমেই অতিবাহিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি আবির্ভূত হন। আড়বারগণ—বিশেষতঃ নম্ম আড়বার (সাধু শঠকোপ)—রচিত ভক্তিরসাত্মক প্রবন্ধাবলী তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল, এবং তিনিই প্রথম

এগুলির সঙ্কলন করেন। ইহা চারি অংশে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি অংশের শ্লোক সংখ্যা ছিল ন্যূনাধিক সহস্র। আড়বার প্রবর্তিত হৃদয়াবেগপূর্ণ বিষ্ণুভক্তি শ্রীবৈষ্ণবধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিলেও, নাথমুনি সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়তত্ত্ব নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মূল দার্শনিক রূপের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই অন্যতম বৈদান্তিক মতবাদই ছিল শ্রীবৈষ্ণব ধর্মমতের প্রাণস্বরূপ। পরিণত বয়সে তিনি সপরিবারে উত্তর ভারতের মথুরা প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থ পরিদর্শন করেন, এবং এই তীর্থ পর্যটনের স্মৃতিরক্ষা কল্পেই বোধ হয় তাঁহার নবজাত পৌত্রের 'যামুন' নামকরণ করেন। নাথমুনি বৈষ্ণব-ধর্মে নূতন প্রাণ সঞ্চার করেন, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় তাঁহার পৌত্র শ্রীযামুনমুনি বা যামুনাচার্য এবং তৎপরবর্তী আচার্য শ্রীরামানুজের চেষ্টায় সমধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে।

নাথমুনির পরে এই নবজাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পর পর দুই জন আচার্য ছিলেন পুণ্ডরীকাক্ষ এবং রামমিশ্র। এই সম্প্রদায়ের ইতিহাসে তাঁহাদের দুইজনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান না থাকিলেও, তৃতীয় আচার্য রামমিশ্র পরোক্ষভাবে ইহার সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার চেষ্টাতেই বিষয়াসক্তচিত্ত যামুন-মুনির মন শ্রীরঙ্গম ও শ্রীরঙ্গনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং যামুনমুনি তাঁহার পিতামহ প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের উন্নতি বিধানে যত্নবান হন। কথিত আছে যামুন অতি অল্প বয়সেই অত্যন্ত মেধাবী এবং শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি তদানীন্তন চোল রাজার সভাপণ্ডিত অক্কী আলোয়ানকে বিচারে পরাজিত করিয়া রাজা ও রাজমহিষীর প্রিয়পাত্র হন, এবং রাজমহিষী তাঁহাকে 'অলবান্দার' (দিগ্বিজয়ী) উপাধি দেন। রাজাও তাঁহার বিচারশক্তি এবং শাস্ত্রজ্ঞানের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে প্রচুর ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। তিনি এই সম্পত্তির সংরক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে এরূপ আসক্ত হইয়া পড়েন যে তিনি

তাঁহার মহান পিতামহ এবং তৎপ্রবর্তিত শ্রীবৈষ্ণবধর্মের কথা প্রায় বিস্মৃত হন, এবং পার্থিব ঐশ্বর্য আহরণেই মনোনিবেশ করেন। তৃতীয় শ্রীবৈষ্ণবাচার্য রামমিশ্র কিন্তু ঠিকই বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্মসম্প্রদায় নাথমুনির পৌত্রের নিকট অনেক কিছু প্রত্যাশা করে, এবং একবার তাঁহার মনকে ঐদিকে ফিরাইয়া দিলে তাঁহার দ্বারা প্রভূত সাম্প্রদায়িক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। রামমিশ্র কৌশল করিয়া তাঁহাকে শ্রীরঙ্গমে লইয়া যান, এবং তত্রস্থ মন্দির ও রঙ্গনাথজীর বিগ্রহ তাঁহাকে দেখাইয়া বলেন যে তাঁহার পিতামহ তাঁহার জন্যই এই অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছেন! ইহাতে তাঁহার বিভ্রান্ত চিত্ত প্রকৃত পথের সন্ধান পায়, এবং তিনি রামমিশ্রের নিকট শ্রীবৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, ঐ ধর্মের ও ধর্মসম্প্রদায়ের মঙ্গলসাধনে ও সম্প্রসারণে সচেষ্ট হন। তিনি অল্পকাল পরেই সাম্প্রদায়িক আচার্য পদে বৃত হন, এবং বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীযামুনাচার্য কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, যথা সিদ্ধিত্রয়, আগমপ্রামাণ্য, গীতার্থসংগ্রহ, স্তোত্ররত্ন এবং মহাপুরুষ নির্ণয়। প্রথমোক্ত গ্রন্থের তিনটি ভাগে (আত্মসিদ্ধি ঈশ্বরসিদ্ধি ও সম্বিৎসিদ্ধি) তিনি শঙ্কর ব্যাখ্যাত অবিদ্যা মতের খণ্ডন করিয়া, যুক্তিতর্কের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার যুগপৎ অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণিত করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থে ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

শ্রীযামুনাচার্য অতি সহজ উপায়ে শঙ্কর সমর্থিত অদ্বৈতমতের খণ্ডন করেন। উপনিষদে প্রচারিত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' উক্তি এই মতের প্রধানতম ভিত্তি। যামুনাচার্য উক্তিটির সারবত্তা গ্রহণ করিলেও ইহা দ্বারা যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার যুক্তি এই যে যদি বলা যায় যে চোলরাজা পৃথিবীতে অদ্বিতীয় সম্রাট্, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার সমকক্ষ আর কোনও সম্রাট্ পৃথিবীতে নাই: কিন্তু ইহা হইতে চোল নৃপতির পুত্র কলত্র ভৃত্যাদির

অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না। তেমনই ব্রহ্ম (উপনিষদের ব্রহ্ম ভক্ত সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতার সমপর্যায়ভুক্ত) যে এক ও অদ্বিতীয় ইহা অনস্বীকার্য হইলেও, তাঁহাতে আশ্রয়কারী জীব এবং জগৎ প্রপঞ্চের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার কোনও হেতু নাই। ঈশ্বরবাদমূলক ছন্দে রচিত শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ হইতেও শ্রীবৈষ্ণবাচার্যগণ এই বিশিষ্টাদ্বৈত মতের সমর্থন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহার প্রথম অধ্যায়ের দ্বাদশতম শ্লোকটি এইরূপ ঃ—

এতজ্‌জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃপরং বেদিতব্যং হি কিঞ্চিৎ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধ ব্রহ্মমেতৎ॥

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম (এক ও অদ্বিতীয় হইলেও), তাঁহার তিনপ্রকার রূপভেদ, যথা ভোক্তা, ভোগ্য এবং প্রেরিতা। এই নিত্য সত্য আত্মসমাহিত হইয়া জানা আবশ্যক, ইহার অধিক আর কিছুই জানিবার নাই।' ব্রহ্মের এই তিন রূপ তিনটি নিত্য সত্তা, যথা ঈশ্বর (প্রেরিতা), চিৎ (জীব-ভোক্তা) এবং অচিৎ (জড়জগৎ-ভোগ্য) ইত্যাদিতে প্রকাশিত পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের (ভক্তের ইষ্টদেবতার) এই রূপ কল্পনায় বৈদান্তিক অদ্বৈতমত একটি বিশিষ্ট আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এ কারণেই শ্রীবৈষ্ণবাচার্য প্রচারিত দার্শনিক মতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে খ্যাত যামুনাচার্য এবং তাঁহার পরবর্তী আচার্য শ্রীরামানুজ ইহাঁই নানাবিধ যুক্তির দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। শ্রীযামুনাচার্য একাদশ শতকেই দেহরক্ষা করেন, এবং তাঁহার মহাপ্রয়াণের পূর্বে শ্রীরামানুজকেই তাঁহার পরবর্তী আচার্য করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া যান। তাঁহার মনোনয়ন খুবই সঙ্গত হইয়াছিল, কারণ শ্রীবৈষ্ণব গৃহীত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামানুজের অবদান অপরিসীম

শ্রীরামানুজ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্মগ্রহণ করেন কিশোর ও যুবা বয়সে তিনি কাঞ্চীপুরে বাস করিতেন, এবং সেখানকার অদ্বৈতবাদী দার্শনিক যাদবপ্রকাশের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহার

গুরুকৃত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা সকল সময়ে মনঃপূত হইত না, এবং কালক্রমে তিনি এই গোঁড়া অদ্বৈতমতাশ্রয়ী গুরুর সংস্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। আড়বার রচিত নালায়ির প্রবন্ধাদি এই সময়ে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং ইহাদের অন্তর্নিহিত ঈশ্বরপ্রেম তাঁহাকে অভিভূত করে। তিনি শ্রীযামুনশিষ্য মহাপূর্ণের নিকট শ্রীবৈষ্ণবমতে দীক্ষিত হন। তিনি উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থসকল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযামুনাচার্যের তিরোধানের পর শ্রীরঙ্গমে আসিয়া তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে সম্প্রদায়ের আচার্য পদ গ্রহণ করিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্মের উন্নতি কল্পে ও সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। রামানুজ বেদান্তসার, বেদার্থ-সংগ্রহ এবং বেদান্তদীপ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্গীতার উপর প্রামাণ্য ভাষ্য রচনা করেন। এই সকল গ্রন্থ এবং ভাষ্যে তিনি নানা তর্ক বিচারের দ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান। তিনি বৃহদারণ্যক ও শ্বেতাশ্বতর ইত্যাদি উপনিষদ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জীব এবং জড় জগৎ যে পরমাত্মা বা পরমব্রহ্মের বিশেষণ স্বরূপ ইহা প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবান হন। শ্রীরামানুজ ব্যাখ্যাত শ্রীবৈষ্ণব মতবাদ বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া অনুশীলন করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা মূলতঃ পাঞ্চরাত্র মতের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহার ইষ্টদেবতার রূপ কল্পনায় বৈদিক বিষ্ণু এবং নারায়ণ দেবতার পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় এজন্য যথার্থই বলিয়াছেন, "His Vaishṇavism is the Vāsudevism of the old Pāncharātra system combined with Vishṇu and Nārāyaṇa elements." (*op. cit.*, p. 27) পাঞ্চরাত্র ব্যূহবাদ এবং পর বাসুদেবের পঞ্চরূপ (এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে) ইহাতে সম্পূর্ণরূপে গৃহীত ও সমর্থিত হইয়াছিল এবং বৈদিক বিষ্ণুর রূপ সেরূপ প্রাধান্য না পাইলেও নারায়ণ দেবতার কল্পনা ইহাতে যথেষ্ট

গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল। পূর্বে (তৃতীয় অধ্যায়ে) বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ ভারতের শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান পূজা প্রতীক রঙ্গস্বামী বা রঙ্গনাথের রূপ কল্পনা ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। শ্রীরামানুজ প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে কিন্তু 'গোপীজনবল্লভ গোপাল কৃষ্ণে'র কোনও স্থান ছিল না। ইহার ভক্তিবাদ প্রধানতঃ আচার অনুষ্ঠানমূলক উপাসনা পদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিল, এবং এই ধর্মে জাতিভেদ প্রথার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু ইহার দুইটি বৈশিষ্ট্যই কালক্রমে অনেক পরিমাণে তিরোহিত হয়।

শ্রীরামানুজের পরিণত বয়সে তিরোধানের কিছুকাল পরে খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে শ্রীবৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায় দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। তামিল ভাষায় এই দুইটি বিভাগের নাম 'বড়কলই' ও 'টেনকলই', উহাদের অর্থ যথাক্রমে 'উত্তরদেশীয় বিদ্যা' ও 'দক্ষিণ দেশীয় বিদ্যা'। প্রথমটি প্রাচীনতর শ্রীবৈষ্ণব আচার্যগণ প্রচারিত ভক্তিমার্গের উপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিল, দ্বিতীয়টি ভক্তিমার্গ অপেক্ষা প্রপত্তিমার্গের উপরই গুরুত্ব দিয়াছিল। এই দুইটি পথের অন্তর্নিহিত পার্থক্য উপমার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নিজ ইষ্টদেবতার আরাধনা কল্পে ভক্ত কোন পথ অবলম্বন করিবেন? বড়কলই শ্রীবৈষ্ণবদিগের মতে মর্কট-শাবক যেমন তার মাতৃবক্ষ প্রবল চেষ্টায় প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকে, এবং তাহার মাতা বিনায়াসে শাখা হইতে শাখান্তরে লাফ দিলেও সে মাতৃবক্ষ হইতে বিচ্যুত হয় না, ভক্ত তেমন নানাবিধ চেষ্টার দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাণপণে অবলম্বন করিলেই ঈশ্বর তাহার মোক্ষসাধন করেন। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম 'মর্কট ন্যায়', এবং ইহাতে ভক্তের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টার উপরই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু টেনকলই শ্রীবৈষ্ণবগণ এই মতের যৌক্তিকতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে ইহাতে পরমেশ্বরের জীবের প্রতি অশেষ করুণা ও তাঁহার অপার

মহিমা সম্যক্ পরিস্ফুট হয় না। তাঁহারা বলেন যে মার্জার-শাবককে তাহার মাতা মুখে করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে লইবার কালে শাবকটি যেরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া সম্পূর্ণভাবে মাতার উপর নির্ভর করে, সেরূপ ভক্তও ঈশ্বরের নিকট একান্তভাবে আত্মনিবেদন করিয়া তাঁহার প্রপন্ন বা সম্পূর্ণ শরণাগত হইবেন এবং ঈশ্বর নিজ করুণায় ও মহিমায় তাঁহার প্রপন্ন ভক্তের কল্যাণ সাধন করিবেন। এক কথায় ইহার নাম 'মার্জার ন্যায়' এবং ইহারই অন্য নাম প্রপত্তিমার্গ। রামানুজ প্রচারিত শ্রীবৈষ্ণবধর্মের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ইহার বড়কলই বিভাগে বর্তমান ছিল, কিন্তু টেনকলই বিভাগ সমর্থিত ধর্মে জাতিভেদ ও আনুষ্ঠানিক উপাসনা পদ্ধতির উপর সেরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। উপরি লিখিত দুইটি শাখার বিশিষ্ট প্রচারক ও স্থাপয়িতা ছিলেন, যথাক্রমে শ্রীবেদান্তদেশিক ও শ্রীপিল্লেই লোকাচার্য। বেদান্তদেশিক রামানুজীয় শ্রীবৈষ্ণব মত সমর্থন করিয়া বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লোকাচার্য প্রপত্তিমার্গের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আঠারোখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এগুলি 'রহস্য' বলিয়া পরিচিত। টেনকলই শাখার অন্যতম প্রধান ব্যাখ্যাতা ছিলেন শ্রীমনবল মহামুনি। ইনি খৃষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত হন এবং ইহার মূর্তি ও চিত্রাদি আজিও দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবগণের দ্বারা পূজিত হয়।

শ্রীরামানুজের তিরোভাবের কিছুকাল পরে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ে একজন প্রখ্যাত আচার্যের আবির্ভাব হয়; তাঁহার নাম শ্রীরামানন্দ। রামানন্দ শ্রীবৈষ্ণব ভক্তদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা সমর্থন করিতেন না। এ জন্য তাঁহাকে তৎকালীন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধানদিগের হস্তে নিগৃহীত হইতে হয়। তিনি শ্রীরঙ্গম ও দক্ষিণ ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং ৺কাশীধামে চলিয়া আসেন। তথায় ও উত্তর ভারতীয় অন্যান্য বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটনে তাঁহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়, এবং

তিনি জাতিধর্মনির্বিশেষে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। কবীর, রইদাস, ধন্না, পীপা, যোগানন্দ, ভবানন্দ প্রভৃতি বহু তথাকথিত নিম্ন জাতির ভক্তগণ তাঁহার নিকট বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, এই মহামন্ত্র নিজ নিজ গোষ্ঠী মধ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরামানন্দের ভক্ত শিষ্যগণের মধ্যে পদ্মাবতী নাম্নী এক মহিলাও ছিলেন। এই বৈষ্ণব ভক্তগণ ও তাঁহাদের প্রধান প্রধান শিষ্যেরা মধ্যযুগের উত্তর ভারতে বৈষ্ণবধর্মের পতাকা সগৌরবে উড্ডীয়মান রাখেন। মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সাধুগণের মধ্যে ইঁহাদের স্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং ইঁহারা সহজ ও সরলভাবে নিজ নিজ মাতৃভাষায় দোঁহা, গান ও কবিতাদির সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্বগুলি বিকীর্ণ করিয়া দেন। শ্রীরামানন্দ নিজে ও তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের উপাস্য দেবতার অন্যতম অবতার শ্রীরামচন্দ্রকেই প্রধান ইষ্টদেবতারূপে গ্রহণ করেন। এজন্য ইঁহাদিগের অন্য নাম ছিল রামায়ৎ বৈষ্ণব সম্প্রদায়। ইঁহাদের অনেকের ও তাঁহাদের পরবর্তীকালের বহু বৈষ্ণব-ভক্তের ধর্মমূলক রচনার দ্বারা উত্তর ভারতীয় গণসাহিত্য প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হয়, এবং এগুলি আজিও ধর্মবিশ্বাসী ভক্তগণের দ্বারা নিয়মিত গীত ও পঠিত হইয়া থাকে। কবীর রচিত দোঁহাগুলি, তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানস ও মীরাবাইএর ভজনাবলী এবং আরও বহু বৈষ্ণব ভক্তের ভাবাবেগময় গীতিকবিতাদি বহুদিন যাবৎ দুরূহ ধর্মতত্ত্বের সহজ ও সরল ব্যাখ্যানরূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যগণ যেরূপ বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদের দ্বারা শঙ্করাচার্যের প্রচারিত অদ্বৈতমত এবং মায়াবাদের খণ্ডন করিতে চাহিয়াছিলেন, সেরূপ মধ্বাচার্য এবং তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ অবিমিশ্র দ্বৈতবাদের সাহায্যে উহার অসারতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান ছিলেন। দক্ষিণ কানাড়ায় (মহীশূর প্রদেশে) উদিপি

তালুকের অন্তর্গত কল্লিয়ানপুর গ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। কিন্তু ত্রিবিক্রমের পুত্র নারায়ণ বিরচিত মধ্ববিজয় গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি রজতপীঠ নগরস্থ মধ্যগেহ নামে পরিচিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল মধ্যগেহ ভট্ট। বাল্যকালে তিনি বাসুদেব নামে অভিহিত হইতেন। তাহার জন্মকাল ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ; তিনি ন্যূনাধিক ৭৯ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার অন্য দুইটি নাম ছিল আনন্দতীর্থ ও পূর্ণপ্রজ্ঞ। প্রথম জীবনে তিনি শৈব ছিলেন, এবং পরে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। অদ্বৈতবাদের পরিপন্থী বিশিষ্টাদ্বৈতমত তাঁহার সমর্থন লাভ করে নাই, কারণ তিনি মনে করিতেন যে ইহাতে পরমেশ্বরের মহিমা পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। পিতা যেমন পুত্রের জনক এবং নিজ পুত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তেমন ঈশ্বর তৎসৃষ্ট জীব এবং বিশ্বজগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তাঁহার এই পার্থক্য বা দ্বৈতবাদ এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে তিনি ঈশ্বর ও চেতনসম্পন্ন জীব, ঈশ্বর ও জড়জগৎ, জীব ও জড়জগৎ, এক জীবসত্তা ও অন্য জীবসত্তা এবং একটি জড়পদার্থ ও অপর জড়পদার্থ—এই সকলের মধ্যে চিরন্তন বিভেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে ৩৭ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; উপনিষদ, ভগবদগীতা এবং বেদান্তসূত্র (প্রস্থানত্রয়) প্রভৃতির ভাষ্য এগুলির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা কালে, তাঁহাকে অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হইয়াছিল, এবং এই প্রকারে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলেন যে ইহাদের প্রত্যেকটি বিশেষ উক্তি তাঁহার দ্বৈতমত সমর্থন করে। পদ্মনাভতীর্থ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ ও অক্ষোভ্যতীর্থ নামে তাঁহার প্রধান চারিজন শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ব্রহ্ম সম্প্রদায় নামে পরিচিত হয়। এই সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের আর দুইটি নাম—মাধ্ব এবং সদ্বৈষ্ণব। অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত

বিষ্ণুভক্তদিগের ধর্মাচরণের অপেক্ষা ইঁহাদের ধর্মকার্যে ভাবপ্রবণতার স্থান অল্প ছিল, এবং বিষ্ণু বা নারায়ণ নামেই সাধারণতঃ তাঁহারা তাঁহাদের ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতেন। বাসুদেব-কৃষ্ণের বাল্যলীলা তাঁহাদের ভক্তি আকর্ষণ করে নাই, পরন্তু বিষ্ণু ও লক্ষ্মীই তাঁহাদের পূজার দেবতা ছিলেন। এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন দেবদম্পতীর দুই পুত্র, ব্রহ্মা ও বায়ু, তাঁহাদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, এবং তাঁহারা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমধ্বাচার্যকে পবনদেবের তৃতীয় অবতার বলিয়া মনে করিতেন (দেবতার প্রথম দুইটি অবতার ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান ও মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন)। শ্রীবৈষ্ণবদিগের ন্যায় এই সম্প্রদায়ের উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতেই অধিকতর প্রসার, এবং শ্রীরঙ্গম যেমন শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থস্থান ও কর্মক্ষেত্র, তেমন দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদিপি নগরই ইঁহাদের প্রধান কর্মক্ষেত্র। এখানে ইঁহাদের আটটি মঠ আছে, এবং মধ্বাচার্য কর্তৃক উৎসর্গীকৃত একটি বিষ্ণু কৃষ্ণের পবিত্র মন্দির বর্তমান। শ্রীসম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান শাখা বড়কলই ও টেনকলইএর ন্যায় ব্রহ্ম সম্প্রদায়েরও দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, প্রথমটির নাম ব্যাসকূট ও দ্বিতীয়টির নাম দশকূট। প্রথম শাখাটি বড়কলইএর ন্যায় অধিকতর সংরক্ষণশীল, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত মাধ্ব বৈষ্ণবগণ মণিমঞ্জরী, মধ্ববিজয় ও বায়ুস্তুতি আদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিকে মধ্বাচার্য বিরচিত গ্রন্থাদির অনুরূপ শাস্ত্র মর্যাদা দান করিতেন। দশকূট নামক দ্বিতীয় শাখা টেনকলইএর ন্যায় অধিকতর উদারনীতিক ও গণপ্রিয় ছিল, এবং এই শাখার বৈষ্ণবেরা দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত জনগণের অন্যতম ভাষা কানাড়ীতে রচিত ধর্মগ্রন্থাদির উপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিতেন।

এইবার পর পর যে তিনটি মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা বলিব, উহাদের উৎপত্তিস্থল ছিল উত্তর ভারত, এবং এতৎ সম্প্রদায়ত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যাখ্যাতা আচার্য এবং ভক্তগণের প্রধান প্রধান কর্মক্ষেত্র-

গুলি উত্তর ভারতের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত ছিল। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথমে দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম ও কর্মজীবন উত্তর ভারতেই অতিবাহিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সম্প্রদায় প্রধানতঃ সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। সনকাদি সম্প্রদায় নামে পরিচিত এরূপ একটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে তিনি শ্রীরামানুজের তিরোধানের কিছুকাল পরে দাক্ষিণাত্যের বেলারি জিলাস্থিত নিম্ব বা নিম্বাপুর গ্রামের এক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম-গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও মাতার নাম ছিল যথাক্রমে জগন্নাথ ও সরস্বতী দেবী, এবং তাঁহারা ছিলেন ভাগবত বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। নিম্বার্কের ধর্মজীবন মথুরার নিকট শ্রীবৃন্দাবনে অতিবাহিত হয়, এবং এজন্যই বোধ হয় তৎপ্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মে রাধাকৃষ্ণের আরাধনা প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। তিনি ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তপারিজাতসৌরভ নামে এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন এবং দশটি শ্লোক সম্বলিত সিদ্ধান্তরত্ন নামক এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ সাধারণতঃ দশশ্লোকী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতেই তাঁহার দার্শনিক মতবাদ অতি অল্প পরিসরে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই মতবাদ সাধারণতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলিয়া বর্ণিত হয়। ইহা যুগপৎ শঙ্কর বেদান্তের অদ্বৈতমত ও বহুত্ববাদের (pluralism) সমর্থক। ইহার ব্যাখ্যান অনুযায়ী ঈশ্বর, জীব এবং জড়জগৎ একই কালে পরস্পর হইতে অভিন্ন এবং পরস্পর হইতে পৃথক্। শেষ দুইটি সত্তা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নহে, কারণ ইহারা তাঁহার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। অন্যদিকে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্যও অস্বীকার করা যায় না, যেহেতু বেদান্তেই উক্ত হইয়াছে যে ইহারা পরমব্রহ্মের তিনটি বিভিন্ন রূপ। কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ সহকারে এই মতবাদ অনুশীলন করিলে

বুঝা যায় যে ইহা শ্রীবৈষ্ণব আচার্যগণ ব্যাখ্যাত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও একটু অন্যভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। দশশ্লোকীর নবম শ্লোকে প্রপত্তিমার্গের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, এবং এদিক হইতে বলা যায় যে নিম্বার্ক সমর্থিত বিশেষ ধর্মবিশ্বাস শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের টেনকলই শাখার ধর্মবিশ্বাসের অনুরূপ। তবে এক বিষয়ে এই দুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্যদিগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য বর্তমান। শ্রীসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য ও ভক্তদিগের উপাস্য দেবতা ছিলেন বিষ্ণু-নারায়ণ এবং তাঁহার শক্তিত্রয় শ্রী, ভূ ও লীলা, কিন্তু সনকাদি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন গোপীজন-বল্লভ গোপাল কৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকা। নিম্বার্কের সাক্ষাৎ শিষ্য ও পরবর্তী আচার্য শ্রীনিবাস তাঁহার গুরু প্রণীত বেদান্ত-পারিজাতসৌরভের একটি ভাষ্য রচনা করেন, এবং দ্বাত্রিংশ সংখ্যক আচার্য হরিব্যাসদেব দশশ্লোকীর উপর ভাষ্য লিখিয়া যান। এই সম্প্রদায়ের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যক আচার্যদ্বয়, দেবাচার্য এবং সুন্দর ভট্ট যথাক্রমে সিদ্ধান্তজাহ্নবী এবং সেতু (সিদ্ধান্তজাহ্নবীর ভাষ্য) নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা। ত্রিংশ সংখ্যক আচার্য কেশব কাশ্মীরিন ব্রহ্মসূত্রের উপর আর একখানি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। সনকাদি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ উত্তর ভারতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছেন, তবে মথুরায় ও বাংলা দেশে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। উত্তর ভারতের অন্যত্র তাঁহাদের সংখ্যাল্পতার কারণ মনে হয় তত্তৎ স্থানের জৈনদিগের দ্বারা তাঁহারা বিশেষরূপে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। রাজপুতানা ও পশ্চিম ভারতে জৈনদের আপেক্ষিক প্রাধান্য সেই সব স্থানে এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল না, কারণ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী জৈনগণ তাঁহাদের উপর অত্যাচার করিতেন। হরিব্যাসদেবের সময় হইতে এই সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়ে,—এক ভাগের বৈষ্ণবগণ ছিলেন তাপস, এবং অপর ভাগের বৈষ্ণবেরা ছিলেন গৃহী।

নিম্বার্কের কয়েক শতাব্দী পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে যে দুইজন বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক রাধাকৃষ্ণ পূজার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, উঁহারা ছিলেন রুদ্র সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবল্লভাচার্য এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্থাপক মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বল্লভাচার্যের ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম ভারত, আর চৈতন্যদেবের কর্মক্ষেত্র ছিল পূর্ব ভারত—প্রধানতঃ বাংলা ও উড়িষ্যা। এই দুইটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করে ; বর্তমানে তথায় এই দুইটি সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্যই ইহার অন্যতম প্রমাণ। বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে বল্লভাচার্য রুদ্র সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক ছিলেন না। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে বিষ্ণুস্বামী নামক উত্তর ভারত প্রবাসী এক দ্রবিড়দেশবাসী ব্রাহ্মণই এই বিশেষ বৈষ্ণব মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ধর্মপ্রচারের প্রধান ক্ষেত্র ছিল গুজরাট প্রদেশ, এবং ভক্তমাল রচয়িতা নাভাজীর মতে পারম্পর্যক্রমে তাঁহার প্রথম চারিজন উত্তরাধিকারীর নাম ছিল জ্ঞানদেব, নামদেব, ত্রিলোচন এবং বল্লভ। নাভাজীর উক্তি ঠিক হইলে আচার্য বিষ্ণুস্বামী খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। বল্লভাচার্য যে বৈদান্তিক মতবাদ তৎপ্রচারিত বৈষ্ণবধর্মে স্বীকার করিয়াছিলেন উহা প্রথমে বিষ্ণুস্বামী কর্তৃকই গৃহীত হয়। এই মতবাদের নাম ছিল শুদ্ধাদ্বৈতবাদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম খণ্ডে চতুর্থ প্রপাঠকের তৃতীয় এবং পরবর্তী কয়টি অনুবাকে ঋষি বলিয়াছেন যে পরমাত্মা আদিতে একক ছিলেন বলিয়া তৃপ্তি পাইতেছিলেন না, তিনি বহু হইতে চাহিয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ তাঁহার বাসনানুযায়ী তিনি নিজে জড়জগৎ, জীব এবং অন্তর্যামী রূপে প্রকট হইয়াছিলেন। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ সকল বিচ্ছুরিত হয়, এবং এগুলি যেমন অগ্নিরই অংশ বিশেষ, সেরূপ পরমাত্মা অংশী এবং জীব, জড়জগৎ এবং তাঁহার অন্তর্যামী রূপ তাঁহারই অংশত্রয়।

তাঁহার অপার ও অনির্বচনীয় মহিমানুসারে জড়জগতের চেতনা ও আনন্দবোধ ছিল না, চেতনসম্পন্ন জীবের আনন্দবোধ ছিল, এবং তাঁহার অন্তর্যামীরূপে সৎ, চিৎ ও আনন্দ এই তিনটি গুণেরই প্রকাশ ছিল। এরূপ আরও সূক্ষ্ম তত্ত্ব আচার্য বিষ্ণুস্বামী প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্মমতে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, এবং বল্লভাচার্য এই সকল তত্ত্বই তৎ-প্রচারিত শুদ্ধাদ্বৈতবাদে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিষ্ণুস্বামী যেমন মূলতঃ দ্রবিড়দেশের অধিবাসী ছিলেন, বল্লভও তেমন আদিতে তেলেঙ্গানার লোক ছিলেন। তেলেগু প্রদেশের কাংকরব গ্রামের কৃষ্ণ যজুর্বেদ শাখাশ্রয়ী লক্ষণ ভট্ট নামক এক তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের তিনি পুত্র ছিলেন। লক্ষণ ভট্ট যখন (১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার স্ত্রী এলমাগারকে লইয়া বারাণসী তীর্থে যাইতেছিলেন, তখন পথে তাঁহার স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই ভবিষ্যতের শ্রীবল্লভাচার্য। বল্লভ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রধানতঃ মথুরা, বৃন্দাবন ও বারাণসীতে বসবাস করিতেন। কিংবদন্তী এই যে মথুরার নিকটবর্তী গোবর্ধন পর্বতে গোপাল কৃষ্ণ তাঁহার নিকট দেবদমন বা শ্রীনাথজী রূপে প্রকট হন। দেবতা তাঁহাকে তাঁহার জন্য এক মন্দির নির্মাণ করাইতে আদেশ দেন এবং ইহাও তাঁহার নির্দেশ ছিল যে, যে কেহ বল্লভ প্রচারিত পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করিয়া দেবতার পূজা করিবেন তিনিই মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন না। পুষ্টিমার্গের এক অর্থ, 'ঈশ্বরানুগ্রহের পথ' ও অন্য অর্থ 'স্বাচ্ছন্দ্য বা আরামের পথ' (the road of well-being or comfort)। ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ করিতে হইলে জীব দৈহিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে অবহেলা ও নিগৃহীত করিবে না। পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় যখন কোনও প্রভেদ নাই তখন জীব নিজেকে যদি বঞ্চিত বা নিগৃহীত করে তাহা হইলে প্রকারান্তরে তাহার পরমাত্মাকেই নিগৃহীত করা হইবে। পুষ্টিই ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ, এবং যাঁহারা এই অনুগ্রহ লাভে সমর্থ

হইবেন তাঁহাদের নাম পুষ্টিজীব। এই মতবাদের আর একটি দিক ছিল। উহার কথা পরে বলিতেছি। বল্লভাচার্য সিদ্ধান্তরহস্য, ভাগবত-টীকা সুবোধিনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। রুদ্র সম্প্রদায়ের আরও কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম এই যথা, শুদ্ধাদ্বৈত মার্তণ্ড, সকালাচার্যমতসংগ্রহ এবং প্রমেয়রত্নার্ণব। বল্লভ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে (তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ৬০ বৎসর) দেহরক্ষা করেন। স্বর্গলাভের মাত্র ৪২ দিন পূর্বে তিনি প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন; সন্ন্যাস জীবনের কঠোরতা তাঁহার সহ্য হয় নাই।

বল্লভের পুত্র বিঠলনাথ এবং চুরাশী জন প্রধান শিষ্যের চেষ্টায় রুদ্র সম্প্রদায় অতি শীঘ্র পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিঠলনাথ অতি শক্তিশালী ধর্মপ্রচারক ছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশের বিত্তশালী বণিক সমাজে এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁহার শেষ জীবন মথুরার নিকটবর্তী গোকুলে অতিবাহিত হয়, এবং এজন্য তিনি গোকুল গোসাঁইজী নামে অভিহিত হন। তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ সকলেই গোসাঁই উপাধিধারী, এবং সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তগণের মধ্যে ইঁহাদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা অত্যধিক। ইঁহারা শিষ্যগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অবতার ও মহারাজ বলিয়া পূজিত হইতে থাকেন। এই গুরুমহারাজ-গণের 'আখড়া' উত্তর প্রদেশের মথুরা প্রভৃতি স্থানে, রাজস্থান এবং পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান সহরে স্থাপিত আছে। আখড়াগুলির মধ্যে উদয়পুরের নিকটবর্তী নাথদ্বারায় অবস্থিত আখড়াটি এবং শ্রীনাথজীর মন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঐশ্বর্যশালী। ঔরংজেবের হিন্দু-নির্যাতন কালে মথুরা হইতে শ্রীনাথজীর বিগ্রহ এখানে আনীত হয় এবং এই মন্দির নির্মিত হয়। ইহা রুদ্র সম্প্রদায়ীদিগের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মস্থান বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। এ

সম্প্রদায়ে গুরুবাদ এত প্রবল যে ইঁহাদের শিষ্যেরা সব কিছুই ইঁহাদিগকে প্রথমে নিবেদন করিয়া তবে প্রসাদ পান। পুষ্টিমার্গের সাধক ইঁহারা, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাস ইঁহাদের নিকট নিন্দনীয় ছিল না, এবং ইহার কুফল নৈতিক অধোগতি তাঁহাদের কাহারও কাহারও চরিত্র কলঙ্কিত করিয়াছিল। এই কলঙ্ক ও দুর্নীতি ক্রমশঃ সম্প্রদায় মধ্যে এরূপ ভাবে আত্মপ্রকাশ করে যে স্বামীনারায়ণ নামক উত্তর প্রদেশীয় এক ব্রাহ্মণ (ইঁহার জন্মকাল ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ, ইনি পরে আহমদাবাদ সহরের স্থায়ী অধিবাসী হন) বল্লভাচারীদিগের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইতে থাকেন। ধর্মসংস্কারক হিসাবে তাঁহার প্রভূত সাফল্য লাভ ঘটে, এবং তিনি নিজে রুদ্র সম্প্রদায় বিরোধী এক নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপে পরিগণিত হন।

পূর্ব ভারতে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে যে এক অভিনব বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুত্থান হয়, উহা সর্বপ্রকার বিশেষ গুণসম্পন্ন ছিল। ভাবাবেগপূর্ণ ঈশ্বরপ্রেম ইহার মূল ভিত্তি, এবং ইহা কিশোর কৃষ্ণ, তাঁহার সঙ্গী ব্রজবালক ও গোপিনীগণ এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা, ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া স্ফূর্ত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই নব ধর্মসম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ ছিলেন ইহা সত্য, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই বঙ্গদেশ এবং মিথিলা প্রভৃতি নিকটবর্তী স্থান লাস্য ও মাধুর্যভাবপূর্ণ রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঈশ্বরভক্তি ও প্রেমের কেন্দ্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেনদিগের রাজত্বের শেষভাগে আনুমানিক ১১৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙালী কবি জয়দেব তাঁহার বিখ্যাত গীতিকবিতা গ্রন্থ গীতগোবিন্দ সুললিত সংস্কৃত ভাষায় রচনা করিয়া দেশমধ্যে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের বন্যা প্রবাহিত করেন। ভক্ত কবি জয়দেবের সমকালীন উমাপতি ধর, গোবর্ধনাচার্য এবং সম্রাট্ লক্ষ্মণসেন রাধাকৃষ্ণ-লীলাকে কেন্দ্র করিয়া বহু শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের পূর্বে এবং পরেও যে গোপিনীরমণ কৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ পূজা বাংলা দেশে

বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের শ্যামলবর্মণের পুত্র ভোজবর্মণের বেলাবা তাম্রশাসনে 'গোপীশতকেলিকারঃ' কৃষ্ণের কথা বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে শ্রীধর দাস কর্তৃক রচিত সদুক্তিকর্ণামৃত নামক গ্রন্থে গোপালকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু ভক্তিরসাত্মক কবিতা সংগৃহীত আছে। মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি বিদ্যাপতি এবং বাংলার সহজসাধক ভক্ত কবি চণ্ডীদাস (এক বা ততোধিক) আজিও তাঁহাদের রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় সুললিত পদাবলীর জন্য বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অল্প কিছুকাল পূর্বে যে মহাপুরুষ প্রেমধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। তাঁহার ন্যূনাধিক ১৯ জন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়। এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তিনি ও তাঁহার শিষ্যেরা চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই উনিশজন শিষ্যের ভিতর কয়েক জনের সহিত শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল; ইঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, কেশবভারতী, অদ্বৈত প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র, ও তাঁহার পিতা ও মাতা ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র এবং শচী দেবী। তাঁহারা অদ্বৈতাচার্যের ন্যায় আদিতে শ্রীহট্টের অধিবাসী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা পুত্রের জন্মের কিছু পূর্বে নদীয়ায় আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে নদীয়ায় বিশ্বম্ভরের জন্ম হয়। বাল্যকালেই তাঁহার বিশেষ মেধা প্রকাশ পায়, এবং কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার অশেষ শাস্ত্র পারদর্শিতা জন্মে। বাল্য ও কিশোর বয়সে তাঁহার বুদ্ধি ও বিদ্যাবত্তার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যাইলেও তখন তাঁহার ভবিষ্যৎ ধর্মজীবনের বিশেষ কোনও আভাস পাওয়া যায় নাই। প্রথম যৌবনে, তখন তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়স, তিনি গয়ায়

তীর্থযাত্রা করেন, এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার জীবনধারার পরিবর্তন ঘটে। ভাবাবেগপূর্ণ ধর্মোন্মাদনা তাঁহার চরিত্রে তখন হইতেই প্রকাশ পায়, এবং হরি ও কৃষ্ণনাম শ্রবণে ও কীর্তনে তাঁহার ভাব-সমাধি হইতে আরম্ভ হয়। গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহার এই ধর্ম ও প্রেমভাব প্রবলতর হইয়া উঠে, এবং অদ্বৈত, শ্রীবাস, মুবাসাদি বহু পুরবাসী তাঁহার সহিত নামগান ও কীর্তনে প্রেম-ভাবোন্মত্ত হইয়া উঠেন। তিনি ২৩ বৎসর বয়সে ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, এবং উহার পর পূর্ণ দুই বৎসর অতীত না হইতেই কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ কবেন। তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের সময় হইতে ক্রমশঃ তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভাবের প্রকাশ হইতে থাকে, এবং তাঁহার নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি পার্ষদ ও ভক্তগণ পুরীতে রথযাত্রার সময় তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে ঈশ্বরের অবতাব বলিয়া ঘোষণা করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি প্রায়ই পুরীতে অবস্থান করিতেন, এবং তাঁহার পুরী বাসকালে কোনও এক রথযাত্রার সময় ভক্তগণ কর্তৃক সর্বসাধারণের নিকট তাঁহার ঈশ্বরত্ব ঘোষিত হয়। তিনি দক্ষিণ ও উত্তর ভাবতের বহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন, এবং এই তীর্থ পরিক্রমা কালে তিনি রায় রামানন্দ, পবমানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী প্রভৃতি তদানীন্তন বহু ভক্ত সাধকের সংস্পর্শে আসেন। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে, ৪৭ বৎসর পূর্ণ হইবার কয়েক মাস পবে, তিনি নীলাচলে (পুরীতে) দেহবক্ষা করেন। কিন্তু দীক্ষা ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর কিঞ্চিন্ন্যূন ২৫ বৎসরের মধ্যে তিনি এমন এক প্রেমোন্মাদনাপূর্ণ রাধাকৃষ্ণ ভক্তির তরঙ্গ দেশমধ্যে বহাইয়া দেন, যাহার পূর্ণ আলোড়ন পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলা ও উড়িষ্যাদেশে, আজিও বর্তমান। চৈতন্য নিজে কোনও তত্ত্বমূলক গ্রন্থ প্রণয়ন কবিয়া না যাইলেও (তাঁহার নামে মাত্র কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক প্রচলিত আছে) তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্তী ভক্তগণ সংস্কৃত, বাংলা ও উড়িয়া ভাষায় বৈষ্ণব-

তত্ত্বমূলক বহু কবিতা ও শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। উঁহার প্রায় ৪৯০ জন বিভিন্ন জাতি (ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর, ইঁহাদিগের মধ্যে ২১ জন মুসলমানও ছিলেন) ভুক্ত পরিকর ছিলেন ; উঁহাদিগের ভিতর ৫৮ জন ছিলেন লেখক। তন্মধ্যে পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ, কবি কর্ণপুর, গোপাল ভট্ট, প্রবোধানন্দ, মুরারিগুপ্ত, রূপ ও সনাতন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁহার পরবর্তী ভক্ত লেখকগণের মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী, বৃন্দাবন দাস, জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ (ইনি বিখ্যাত চৈতন্য চরিতামৃতের রচয়িতা) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজে কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন সে বিষয়ে বিশেষ মতানৈক্য আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা লন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর অন্যতম প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, অনুরাগবল্লী, ভক্তিরত্নাকর, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মাধবেন্দ্রপুরী মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার ও তচ্ছিষ্য ঈশ্বরের 'পুরী' উপাধি হইতে অনুমান করা স্বাভাবিক যে তাঁহারা শঙ্কর প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ অনুমান ঠিক নাও হইতে পারে। প্রাণতোষিণী তন্ত্রের এক উক্তি (জ্ঞাততত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণ-তত্ত্বপদে স্থিতিঃ। পরব্রহ্মপদে নিত্যং পুরি-নামা স উচ্যতে॥) অনুযায়ী যে কোনও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি পুরী হওয়া অসম্ভব ছিল না। অথবা মাধবেন্দ্র আদিতে শঙ্করের সম্প্রদায়ভুক্ত থাকিলেও পরে অদ্বৈতমতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া দ্বৈতমতের সমর্থক হন এবং নিজে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক প্রেমধর্মের আদি প্রবর্তক রূপে পরিগণিত হন। শ্রীজীব গোস্বামীর এক উক্তি (এতদ্বৈষ্ণববন্দনং সর্বার্থসিদ্ধি-প্রদম্। শ্রীমন্মাধবসম্প্রদায়গণনং শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদম্॥—তৎকৃত বৈষ্ণব বন্দনা) হইতে জানা যায় যে শ্রীজীব গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে

মাধব সম্প্রদায় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও যে মাধবেন্দ্রপুরীকে প্রেমভক্তিধর্মের আদি প্রচারক বলিয়া মনে করিতেন, উহা আমরা তাঁহার অনুগ্রহভাজন বয়ঃকনিষ্ঠ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত চৈতন্যভাগবত হইতে জানিতে পারি। ভক্তকবি গাহিয়াছেন: 'ভক্তিরসে আদি মাধবেন্দ্র সূত্রধার। গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বার বার॥' কিন্তু মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য চৈতন্যদেবকে বিশেষ কোনও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

মাধবেন্দ্র ও তাঁহার শিষ্যেরা প্রেমভক্তিধর্মের যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই উপর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সৌধ নির্মাণ করিয়া যান। এই কার্যে সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁহার প্রধান সহকর্মী ছিলেন নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য প্রভৃতি পার্ষদগণ, এবং তাঁহাদের পরে রূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি মহাপুরুষগণ। ইঁহাদের দ্বারা রচিত গ্রন্থসমূহেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্বাদি বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। খুব সংক্ষেপে তাহার পরিচয় এইরূপ: কৃষ্ণই পরমব্রহ্ম, এবং তাঁহার শক্তি মায়াশক্তি রূপে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ আচ্ছাদিত করিয়া রহিয়াছে। যে শক্তি অনুযায়ী তিনি নিজে বহু রূপে প্রতিভাত হন, উহার নাম বিলাসশক্তি এবং উহা দুইপ্রকার—প্রাভববিলাস এবং বৈভববিলাস। প্রথম শক্তিবশে ব্রজগোপীদিগের সহিত রাসলীলাকালে তিনি বহু কৃষ্ণে পরিণত হন, এবং অপর শক্তি অনুযায়ী তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, এই চতুর্ব্যূহ রূপ পরিগ্রহ করেন। বাসুদেব বুদ্ধির, সঙ্কর্ষণ চেতনার, প্রদ্যুম্ন প্রেমের এবং অনিরুদ্ধ লীলার,—শ্রীকৃষ্ণের এইসব শক্তির দ্যোতক। এখানে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে পাঞ্চরাত্র চতুর্ব্যূহবাদ ইহাতে মাত্র অংশতঃ গৃহীত হইয়াছিল, কারণ পাঞ্চরাত্র মতে প্রদ্যুম্ন মনের এবং অনিরুদ্ধ অহংজ্ঞানের অধিষ্ঠান দেবতা। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের প্রাবল্য অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ

যথাক্রমে বিষ্ণু, ব্রহ্মদেব এবং মহাদেবের রূপ গ্রহণ করেন, এবং ভগবানের এক বা অন্য ব্যূহরূপ হইতেই তাঁহার অবতারসমূহের উৎপত্তি হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলা শাশ্বত, এবং লীলাস্থল গোলোক। তাঁহার প্রধান শক্তি প্রেম, ইহার কণামাত্র যখন ভক্তের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়, তখন ভক্ত মহাভাবে অভিভূত হইয়া পড়েন। সর্বগুণবতী শ্রীমতী রাধা শ্রীকৃষ্ণের মহান প্রেমভাবের মূর্ত প্রতীক বা তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি। ব্রজগোপীদিগের সহিত তাঁহার যে লীলা উহা এই শুদ্ধ প্রেম হইতেই সঞ্জাত, এবং উদ্ধবাদি ভক্তগণ লীলাসহচর রূপে এই বিশুদ্ধ ঈশ্বর প্রেমাভিলাষী। শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে অসীম এবং পূর্ণ চৈতন্য-স্বরূপ। জীবাত্মা ইঁহার আণবিক অংশ রূপে চিৎশক্তির অধিকারী। অংশী ও অংশ রূপে এই দুইএর সম্বন্ধ চিরন্তন—শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে সর্বাশ্রয় এবং জীব তাঁহাতে অবলম্বনশীল, আশ্রিত। আবার অন্যদিকে পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে চিরবিভেদ বর্তমান। মধুমক্ষিকা পুষ্প-মধু হইতে পৃথক্; যখন সে মধুপান করে এবং ফুলের চারিপার্শ্বে উড়িয়া বেড়ায়, তখন তাহার দেহাভ্যন্তরে মধু থাকিলেও সে বাহ্যতঃ মধু হইতে পৃথক্ থাকে। সেইরূপ জীব ঈশ্বর হইতে পৃথক্ হইয়াও যখন তাঁহার কৃপায় ঈশ্বরপ্রেমের অধিকারী হয় এবং ভগবৎ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় তখন সে তাঁহাতে পূর্ণ থাকিলেও উহার পৃথক্ সত্তা বর্তমান থাকে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণের বৈদান্তিক মতবাদ 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'এর স্বরূপ কিছুটা এই প্রকারে বোধগম্য হয়। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন যে চৈতন্য সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতবাদ নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈত মতবাদের অনুরূপ (*op. cit.*, p 85)। অন্যান্য কয়েকটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ভক্তি তথা প্রপত্তিমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিবেচনা করেন। ঐকান্তিক নিষ্কাম ভক্তির পাঁচটি বিভিন্ন ভাব, যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য। এই পঞ্চমুখী ঈশ্বরপ্রেমের উৎস

ভগবান শ্রীহরি-কৃষ্ণ, এবং ইহার রসাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী হইবার অন্যতম প্রকৃষ্ট উপায় ভাবাবেগময় হরি-কৃষ্ণনাম সংকীর্তন—'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।'

সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব আচার্যদিগের কথা এই অধ্যায়ে বলা হইল। এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ আজিও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্মাচরণ স্ব স্ব রুচি ও সাধ্যানুযায়ী করিয়া যাইতেছেন। যে প্রগাঢ় ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তির আদর্শ লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা আচার্যগণ তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, সে আদর্শ যে আজিও অক্ষুণ্ণ আছে এ কথা বলা যাইতে পারে না। যুগ ও পারিপার্শ্বিকের নিত্য পরিবর্তন আদর্শ ও চিন্তাধারার ক্রমিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে। প্রবর্তক আচার্যদিগের ধর্মভাবের মহতী প্রেরণা ও ধর্মপ্রচারের সুসংহত কার্যাবলী, আজ অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই সকল বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উত্থান ও ক্রমবিবর্তনের প্রসঙ্গ আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগীয় বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্যগণ তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমতের রূপদানে ও ব্যাখ্যানে পূর্ব পূর্ব সূরিদিগের প্রদর্শিত পন্থাসকল যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াছিলেন। ঐকান্তিক ও বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম ও ভক্তি যে তাঁহাদের মূল উপজীব্য ছিল, এ কথা বিশেষভাবে এই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেম, ভক্তি ও প্রপত্তিবাদের ব্যাখ্যান ও প্রচারে তাঁহারা দার্শনিক তত্ত্বের পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দার্শনিক তত্ত্ব ও তথ্যসমূহের মূল উৎস ছিল বিভিন্ন প্রধান উপনিষদ বা বেদান্ত। শঙ্করাচার্য গৃহীত অদ্বৈতবাদই যে বেদান্তের একমাত্র প্রতিপাদ্য ছিল না, এ প্রমাণ এই বৈষ্ণব আচার্যগণই দিয়াছিলেন। তাঁহারা উপনিষদ হইতে উদ্ধৃত ভিন্ন ভিন্ন

উক্তির সাহায্যে বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত প্রভৃতি বিভিন্ন তত্ত্ব সম্যক্ সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য প্রণয়নকালেই তাঁহারা প্রধানতঃ এই সকল তত্ত্ব বিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু বাদরায়ণের পূর্বেও কয়েকজন বৈদান্তিক পণ্ডিত এই তত্ত্ববিচারের পথ প্রদর্শক ছিলেন। ঋষি আশ্মরথ্য বলিতেন যে আত্মা (জীব) ঈশ্বর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ নহে, আবার ঈশ্বর হইতে পৃথক্ও বটে ; এই মতবাদ বহু পরবর্তী কোনও কোনও বৈষ্ণব আচার্যের 'ভেদাভেদ' বা 'দ্বৈতাদ্বৈত'বাদের সহিত তুলনীয়। ঋষি ঔডুলোমির মতে জীবাত্মা দেহবন্ধ হইতে চিরন্তন মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত ঈশ্বর (পরমব্রহ্ম) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট ; ইহা আমাদিগকে পরবর্তী যুগের 'সত্যভেদ' বা 'দ্বৈতবাদে'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ঋষি কাসকৃৎস্নের মতে আত্মা (জীব) পরমব্রহ্ম (ঈশ্বর) হইতে সম্পূর্ণ ও শাশ্বতভাবে অভিন্ন ; ইহাই পরবর্তী কালের শঙ্কর সমর্থিত অদ্বৈতবাদ।

সপ্তম অধ্যায়

শিব—শৈব

শিব দেবতার প্রাক্‌বৈদিক, বৈদিক ও পৌরাণিক রূপ—
শিবলিঙ্গ পূজা ও শিবমূর্তি পরিচয়

গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়গুলির কেন্দ্রীয় দেবতা বিষ্ণুর আদি রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে ইহার মূল রূপটি একটি ঐতিহাসিক মহামানবের চরিত্রকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। কালক্রমে যে ইহার সহিত আরও কয়েকটি কিংবদন্তী-মূলক দেবতার সংমিশ্রণ ঘটিয়া উহাকে অধিকতর ব্যাপক ও শক্তিশালী করিয়া তুলে, ইহাও উক্ত অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু শৈব ধর্ম-সম্প্রদায়গুলির প্রধান দেবতা শিবের আদিম রূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায় যে ইহা মূলতঃ এক কাল্পনিক দেবসত্তাকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে অন্ততঃ একজন ঐতিহাসিক পুরুষ এই ভয়ঙ্করের দেবতার অবতার রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং মূল দেবতার সহিত তাঁহার সত্তার পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল; ইহা পরে আলোচিত হইবে। এই ঐতিহাসিক পুরুষের নাম ছিল লকুলীশ, এবং ইনি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে পশ্চিম ভারতের কাথিয়াবাড় প্রদেশের কায়ারোহণ (বর্তমান কার্বান) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন যুগে আরও অনেক দেবতার শিবের সহিত সম্মিলন সংঘটিত হয়, এবং ইহার ফলে কেন্দ্রীয় দেবতার প্রভূত শক্তিবৃদ্ধি হয়। গৌণ দেবতাগুলি কিন্তু মূল দেবতার ন্যায় প্রধানতঃ মানব কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক দেবতা বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে অপর এক পার্থক্য ছিল এই যে বাসুদেবকেন্দ্রিক বিষ্ণুর উৎপত্তি হইয়াছিল উত্তর বৈদিক ঐতিহাসিক যুগে, কিন্তু শিবের উৎপত্তি যে প্রাক্‌বৈদিক—তথা

প্রাগৈতিহাসিক যুগে হইয়াছিল, ইহা অনেক পণ্ডিতই স্বীকার করিয়া থাকেন। দেবতাদ্বয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্য একটা দিকও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণু প্রধানতঃ প্রেম ও ভক্তির দেবতা; যদিও তাঁহার নরসিংহাদি বিভবরূপে তাঁহাকে উগ্র সংহারকর্তা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছিল, তথাপি তিনি প্রহ্লাদাদি বিপন্ন ভক্তের একাত্মিকা ভক্তি ও প্রেমের পাত্র এবং ত্রাণকর্তা রূপে কিংবদন্তীকারগণ কর্তৃক কল্পিত হইয়াছিলেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি শিবের যে মূলগত প্রকৃতি কি ছিল, উহা নির্ণয় করার উপায় আজিও জানা যায় নাই। কিন্তু দেবতার বৈদিক প্রতিরূপ রুদ্রের কল্পনায় যে প্রাকৃতিক ধ্বংস ও সংহারলীলা প্রতিফলিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে প্রধানতঃ সিন্ধুনদ ও তাহার দুই একটি অববাহিকা আশ্রয় করিয়া বহুকাল পূর্বে (অনেকের মতে বৈদিক যুগ আরম্ভ হইবার বেশ কিছু আগে) যে বিশিষ্ট নাগর সভ্যতা গড়িয়া উঠে তাহার অনেক নিদর্শন হরপ্পা, মহেঞ্জো-ডারো, নাল প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। নিদর্শনগুলি সেখানকার সুপ্রাচীন অধিবাসীদিগের জীবনধারার ভিন্ন ভিন্ন দিকের উপর প্রভূত আলোক পাত করে। তাহাদের শিল্প ও সংস্কৃতি, পৌর ও ধর্ম জীবন, আর্থিক ও সামাজিক সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে এই নিদর্শনগুলি আমাদিগকে অনেক তথ্য প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে নরম পাথর (steatite), এক জাতীয় মৃত্তিকা (faience) প্রভৃতি দ্রব্যে নির্মিত 'শিলমোহর' (sealings) বা 'শিলকবচ' (seal amulets) গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহেঞ্জো-ডারোতে প্রাপ্ত এইরূপ একটি চতুষ্কোণ শিলমোহরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র বোধ হয় প্রাচীন সিন্ধুতট-বাসীদিগের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেয়। ইহাতে ত্রিমুখ, দ্বিশৃঙ্গ, দ্বিভুজ, নাতিউচ্চ আসনের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট একটি মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। বসার বিশিষ্ট ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে ইহা

পরবর্তী কালে বর্ণিত কূর্মাসন ; মূর্তিটির বহুবলয় ভূষিত দুইটি বাহু পূর্ণ প্রসারিত এবং জানুদ্বয়ে ন্যস্ত ; ইহার কণ্ঠে ও বক্ষে কয়েকটি মালা (গ্রৈবেয়ক) লম্বমান ; ইহার শৃঙ্গমধ্যস্থ শিরোভূষণ দীর্ঘ ও ঊর্ধ্বে কিঞ্চিৎ প্রসারিত ; মূর্তির উভয় পার্শ্বে হস্তী, ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও মহিষ— এই চারি প্রাণী অঙ্কিত রহিয়াছে ; আসনের নীচে দুইটি মৃগ এবং একটি পুস্তকাধার (?) চিত্রিত আছে ; শিলমোহরের উপর দিকে বাম পার্শ্বে একটি মনুষ্যমূর্তি রেখাকারে অঙ্কিত আছে। এই মূর্তি যে মহেঞ্জো-ডারোর প্রাচীন অধিবাসীদিগের দ্বারা পূজিত এক দেবতার প্রতিকৃতি এ বিষয়ে স্যার জন মার্শাল নিঃসংশয় ছিলেন। কূর্মাসনে আসীন মূর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য ঊর্ধ্বলিঙ্গতা (ইহা খুব স্পষ্ট নহে), এবং উপরে বর্ণিত অন্যগুলি এই দেবতার পরিচয় প্রদানে মার্শালকে সাহায্য করিয়াছিল। তিনি ইহাকে পৌরাণিক শিবের আদি প্রতীক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এ মত যদিও সকল পণ্ডিত গ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহাকে বহু পরবর্তী কালের মহাযোগী ও পশুপতি রূপে কল্পিত শিব দেবতার আদিম নিদর্শন রূপে গণনা করা খুব অযৌক্তিক নহে।

মহেঞ্জো-ডারোতে প্রাপ্ত আরও কতিপয় শিলমোহরে অনুরূপ দেবতা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকার আর একটি শিলমোহরে বোধ হয় এই দেবতারই অন্য এক রূপ প্রদর্শিত আছে। এখানেও দেবতা যোগাসনে উপবিষ্ট (আসন ঠিক কূর্মাসন নহে), এবং ইহার উভয় পার্শ্বে মিশ্র মানব ও সর্পাকৃতি হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনারত দুইটি নাগমূর্তি দেখা যায়। ইহাকেও পরবর্তী যুগের নাগ পরিবেষ্টিত শিবের আদিম রূপায়ণ বলিয়া মনে করা বিশেষ অসঙ্গত না হইতে পারে। অপর কয়েকটি শিলে মনুষ্যমুখবিশিষ্ট মেষ, ঐরূপ অর্ধ হস্তী ও অর্ধ বৃষ প্রভৃতি বহু মিশ্রাকৃতি (hybrid) মূর্তি স্বতই আমাদিগকে পরবর্তী কালের মিশ্রাকৃতি শিবগণসমূহের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্পাতে

পাওয়া একটি পোড়া মাটির (terracotta) শিলে অঙ্কিত চিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপর দু একটি দৃশ্যের সহিত ইহাতেও যোগাসনে উপবিষ্ট এবং নাতিদীর্ঘ ও উর্ধ্বে প্রসারিত শিরোভূষণ যুক্ত, নানা প্রাণী পরিবেষ্টিত এক দেবতা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিলমোহরের পিছনের দিকে প্রদর্শিত বৃষমূর্তি ও ত্রিশূলধ্বজ, দ্বিতল গৃহের সম্মুখে দণ্ডায়মান অপর এক মনুষ্য (দেবতা ?) মূর্তির ও যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটিব পরিচয় প্রদানে সাহায্য করে। এম. এস. বৎস অনুমান করিয়াছিলেন যে দ্বিতল গৃহ একটি দেবায়তন, এবং আসীন ও দণ্ডায়মান মূর্তিদ্বয় মার্শাল বর্ণিত আদি শিবের বিভিন্ন রূপায়ণ (M. S. Vats, *Excavations at Harappa*, pp. 129-30)। এ অনুমানের যৌক্তিকতা অস্বীকার কবা যায় না, কারণ বৃষ এবং ত্রিশূল, পরবর্তী কালের শিব দেবতার বিশেষ লাঞ্ছন। এ অনুমান সত্য হইলে প্রাচীন সিন্ধুতটবাসীদিগেব পূজার দেবতা এই আদি শিবের কি নাম ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শিলমোহরগুলিব গাত্রে খোদিত চিত্রাত্মক লিপিমালার (pictographs) যদি সর্বজনগ্রাহ্য পাঠোদ্ধাব সম্ভব হইত তাহা হইলে হয়ত আমরা উহা জানিতে পারিতাম।

প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার অপর কয়েকটি নিদর্শন বোধ হয় এই দেবতার পূজা-প্রতীক সম্বন্ধে আরও কিছু ইঙ্গিত প্রদান করে। নরম প্রস্তর বা পোড়া মাটিতে নির্মিত হ্রস্বাকৃতি এমন কতকগুলি দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে লিঙ্গ-প্রতীক বলিয়া মার্শাল মনে করেন। ইহাদের আকৃতি ও গঠনপ্রণালী এই অনুমান সমর্থন করে, এবং ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে যে সিন্ধুতটবাসীদিগের অনেকে ইহা-দিগকে তাঁহাদের দ্বারা পূজিত পিতৃদেবতার পূজা-প্রতীক রূপে ব্যবহার করিতেন। এ কথা গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, এবং এই অধ্যায়ের শেষভাগে শিবলিঙ্গ পূজাব আলোচনা-

কালে শিশ্ন-প্রতীক পূজার আরও কিছু আলোচনা করা হইবে। মহেঞ্জো-ডারো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত এই নিদর্শনগুলির উক্তরূপ ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য হয় নাই সত্য, কিন্তু এ মত গ্রহণ করিলে ঋগ্বেদে জুগুপ্সিত শিশ্নদেব বলিয়া বর্ণিত প্রাচীন জনগণের সঙ্গত পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য সে ক্ষেত্রে শিশ্নদেব কথাটির অর্থ শিশ্নপূজক বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। বলা আবশ্যক যে সায়নাচার্য তাঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্যে ইহার অর্থ অন্যরূপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে শিশ্নদেব শব্দ কামুক ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণকেই বুঝাইত। কিন্তু কয়েক জন আধুনিক পণ্ডিত প্রদত্ত ব্যাখ্যা অন্যরূপ, এবং ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীনকালের আদি শিবের পূজা প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস পাই। হরপ্পাতে আবিষ্কৃত গাঢ় ধসর বর্ণের স্লেট পাথরে তৈয়ারী অর্ধভগ্ন একটি ক্ষুদ্র মূর্তি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। ইহার মস্তক, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়ের অর্ধাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কিন্তু যাহা অবশিষ্ট আছে উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে অভগ্ন অবস্থায় ইহাকে নৃত্যরত ভঙ্গিমায় দেখানো হইয়াছিল। ইহার ভূমিন্যস্ত দক্ষিণ পদ, উর্ধ্বে উত্থিত বামপদ, কটির উপরস্থ দেহভাগের বামাভিমুখীনতা এবং বাঁদিকে উৎক্ষিপ্ত বাহুদ্বয়,—এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ইহা যে একটি নৃত্যরত মূর্তি ছিল তাহা প্রমাণিত করিতেছে। ইহার গ্রীবার স্থূলতা দেখিয়া মার্শাল প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে মূর্তিটির তিন মস্তক ছিল। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি ইহাকে পৌরাণিক নটরাজ শিবের আদিম প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র মূর্তিটি যদি পুরুষ-মূর্তি হয় তাহা হইলে তাঁহার মত গ্রহণযোগ্য হইতে পারে। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে ইহা নৃত্যরতা স্ত্রীমূর্তি। সে যাহাই হউক, পূর্বে লিখিত অপর কয়টি নিদর্শন হইতে প্রাচীন সিন্ধুতটবাসীরা যে শিবের আদিপুরুষ এক দেবতার পূজাপরায়ণ ছিলেন ইহা অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হয় না।

বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে আমরা দেবতারূপী শিবকে পাই না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতিরূপ রুদ্রকে ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে স্তূয়মান দেখিতে পাই। 'শিব' শব্দ এই সময়ে কতিপয় বৈদিক দেবতার বিশেষণ রূপে 'মঙ্গলদায়ক' অর্থে ব্যবহৃত হইত। উত্তর বৈদিক সাহিত্যে যে 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' পদ পাওয়া যায়, সেখানেও ইহা পরম ব্রহ্মের বিশেষণ রূপে একই অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যের শেষের দিক হইতে ইহা এক বিশেষ দেবসত্তাকে বুঝাইতে আরম্ভ করে। সে কথা পরে বলা হইতেছে। কিন্তু রুদ্রই যে পৌরাণিক শিবের আদি বৈদিক প্রতিরূপ সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই বৈদিক দেবতার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণকালে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে প্রলয়ঙ্কর ঝড়বাত্যা ও অশনি, বিশ্বদাহী অগ্নি, মৃত্যু আনয়নকারী দারুণ সংক্রামক ব্যাধিপুঞ্জ প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংহারলীলার মধ্যে বৈদিক ঋষিগণ ভীতি উদ্রেককারী রুদ্রের উগ্র রূপের প্রকাশ দেখিতে পাইতেন। কিন্তু মানব মন উপাস্য দেবতার কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়াই সন্তোষ পায় না; মানুষ চায় ভয়ের দেবতাকে স্তব স্তুতি অর্চনার দ্বারা তুষ্ট করিতে, যাহাতে তিনি তাহাকে অভয় ও মঙ্গলদান করেন। ঋগ্বেদে রুদ্র দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত অনেক সূক্তে ঋষিগণ এই দুই ভাবের যুগপৎ ব্যঞ্জনা করিয়াছেন। ইহার প্রথম মণ্ডলে ১১৪ সূক্তের অষ্টম অনুবাকে ঋষি বলিতেছেন, 'হে রুদ্র, তুমি ক্রোধবশে আমাদের সন্তান সন্ততি ও উত্তরাধিকারিগণের অনিষ্ট করিও না, আমাদের অনুগত লোকদিগকে, আমাদিগের পশুগণকে বিনাশ করিও না, আমাদিগের গৃহগুলিও যেন তোমার কোপে ধ্বংস না হয়। আমরা তোমাকে স্তব স্তুতি ও বলি প্রদান করিয়া সর্বদা আবাহন করি।' রুদ্র যেমন ব্যাধি প্রয়োগে জনগণের বিনাশ সাধন করেন ও পশুদিগের মৃত্যু ঘটান, তেমন তিনি স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্যাধি মোচন করেন ও পশুদিগকে

রক্ষা করেন, কারণ তিনি ভেষজের দেবতা, তিনি পশুপ (পশুপতি)। যজুর্বেদের শতরুদ্রীয় নামক অংশে (ইহাতে রুদ্রের শতনাম কীর্তিত আছে) ইঁহার চরিত্রের প্রভূত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নামগুলির কয়েকটি তাঁহার উগ্র রূপ ব্যঞ্জনা করে, আবার অপর কয়েকটি তাঁহার মঙ্গলময় সত্তার দ্যোতক। এই দুই রূপ তাঁহার ঘোর ও শিব বা শান্ত তনু। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে মহাভারতেও রুদ্র-শিব দেবতার দুই তনুর কথা একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে—দ্বে তনূ তস্য দেবস্য ব্রাহ্মণাঃ বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ। ঘোরামন্যাং শিবামন্যাং···। অথর্ববেদে রুদ্র দেবতার সাত মুখ্য নাম যথা—রুদ্র, শব, উগ্র, ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান; দেবতা এই সাতটি নামে বিভিন্ন দিকের প্রাণিগণের সংরক্ষক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ভব নামধারী দেবতা পূর্বদিকের মধ্যভাগে স্থিত আর্যগোষ্ঠী হইতে বহিষ্কৃত ব্রাত্য-দিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র ঊষাদেবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং প্রজাপতি এক এক করিয়া তাঁহাকে আটটি নাম প্রদান করেন। অথর্ববেদোক্ত সাতটি নামের সহিত অশনি (বজ্র) নাম যোগ করিয়া তালিকার সংখ্যা পূরণ করা হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে রুদ্র, শর্ব, উগ্র ও অশনি দেবতার ঘোর রূপ এবং বাকী কয়টি যথা ভব, পশুপতি, মহাদেব এবং ঈশান তাঁহার মঙ্গলময় রূপ ব্যঞ্জনা করে। শতপথ ব্রাহ্মণের কয়েকটি অংশে রুদ্রকে অগ্নির আর এক রূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত আট নাম অগ্নির এবং এই বিভিন্ন নামে দেবতা ভিন্ন ভিন্ন দেশে পরিচিত ছিলেন। পূর্বদেশের লোকেরা তাঁহাকে শর্ব নামে এবং বাহীকেরা তাঁহাকে ভব নামে অভিহিত করিত। রুদ্র সম্বন্ধে এই সকল এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ আলোচনা করিয়া ইহা অনুমান করা যায় যে এই দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে বিভিন্ন সমগোষ্ঠীয় দেবসত্তার সহিত ইঁহার সংমিশ্রণ বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদের যুগে তাঁহার অন্যতম

নাম মহাদেব বৈদিক দেবগণের মধ্যে তাঁহার প্রধানতম স্থান সম্বন্ধে ইঙ্গিত প্রদান করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে তাঁহাকে মহেশ্বর নামে অভিহিত করা হইয়াছে ; তিনি প্রকৃতি রূপ মায়ার অধীশ্বর এবং এই বিশ্বভুবন তাঁহারই বিভিন্ন রূপ বা অবয়বের দ্বারা পরিব্যাপ্ত (মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ)। তবে ইহাও এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে রুদ্র দেবতার পূর্ণ বিবৃদ্ধিকালেও তাঁহাকে 'শিব' এই বিশেষ নামে কদাচিৎ বর্ণিত করা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের কয়েক স্থানে শিব রুদ্র দেবতার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় (৩, ১১ ; ৪, ১৬ ; ৫, ১৪)। কিন্তু এই প্রকারেই ক্রমশঃ শিব নামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং আর্যেতর জাতির দ্বারা পূজিত অনুরূপ দেবতার যখন বৈদিক রুদ্রের সহিত মিলন ঘটে তখন মিশ্র দেবতা শিব নামেই পরিচিত হন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র এরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছেন যাহাতে তিনি যে উপনিষদকারের ভক্তি ও পূজার পাত্র ছিলেন ইহা অনুমান করা যায়। ইহাতে ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক একেশ্বরবাদ এবং প্রাচীনতর গদ্য উপনিষদগুলির নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মবাদ একত্র মিলিত হইলেও ঈশ্বরবাদেরই প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। উপনিষদকারের মতে একমাত্র ঈশ্বর ভগবান রুদ্র ব্যতীত আর কেহই নহেন। এক ও অদ্বিতীয় রুদ্র স্ব শক্তির সাহায্যে বিশ্ব চরাচর নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি স্রষ্টা, পালনকর্তা এবং সংহারকর্তা,—প্রলয়কালে তাঁহাতেই সমস্ত ভুবন আশ্রয় গ্রহণ করে (একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমান্ লোকানীশত ঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ্ জনাংস্তিষ্ঠতে সঙ্কোপান্তকালে, সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপ্তা ॥ ৩, ২)। অনেক স্থানে তিনি কেবলমাত্র দেব বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন ('জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ'

বাক্যটি কতিপয় শ্লোকের শেষ চরণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে) ;—তিনি মহাদেব, তিনি মহর্ষি, তিনি সর্বব্যাপী ভগবান, তিনি সর্বশরণ, তিনি ঈশ ও ঈশান, তিনি বিশ্বাধিপ এবং অন্য দেবতাদিগের সৃজন ও সংহার কর্তা, তিনি সর্বভূতে স্থিত শিব (শিবং সর্বভূতেষু গূঢ়ম্), তিনি ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর এবং দেবতাদিগের পরম দৈবত (তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্), তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও তাঁহার অনেক রূপ (বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্), ইত্যাদি নানা নামে তাঁহাকে অভিহিত করিয়া গ্রন্থকার নিজ উপাস্য দেবতার প্রতি অন্তরের একান্তিকা ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন। এজন্য রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। তিনি বলিয়াছেন, 'The *Śvetāśvatara Upanishad* stands at the door of the Bhakti school, and pours its loving adoration on Rudra-Śiva instead of on Vāsudeva-Kṛṣhṇa as the *Bhagavad Gītā* did in later times when the Bhakti doctrine was in full swing.' (*op. cit.*, p. 110) ইহার ভাবার্থ এই—'পরবর্তী কালে ভক্তিবাদের পূর্ণ প্রচলন হইলে যেরূপ ভগবদ্গীতা গ্রন্থে বাসুদেব-কৃষ্ণের প্রতি একান্তিকা ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল, সেরূপ ভক্তি সম্পর্কিত শাখার দ্বারে অবস্থিত (অর্থাৎ ভক্তিবাদ প্রচলনের আদি যুগে) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বাসুদেব-কৃষ্ণের পরিবর্তে রুদ্র-শিবের উদ্দেশ্যে ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সমন্বিত ভক্তি নিবেদিত হইয়াছিল।' এই উপনিষদোক্ত একমাত্র ঈশ্বরের বর্ণনা আমাদিগকে স্বতই ভগবদ্গীতার বিভূতিযোগ অধ্যায়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষে শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুন যেমন শ্রীভগবানে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার চরণে শরণ লইয়াছিলেন, তেমনই শ্বেতাশ্বতর ঋষি রুদ্র দেবতাকে বিবিধ উপায়ে স্তুতি করিয়া তাঁহার ঐকান্তিকী ভক্তি ও

প্রেমের পাত্র ব্রহ্মসৃজ্ ভগবান রুদ্র-শিব সকাশে মুক্তিকামী হইয়া শরণ লইয়াছিলেন—

যো ব্রহ্মাণংবিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ (৬.১৮)।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে একেশ্বরবাদ ও ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া গেলেও ইহাতে সাম্প্রদায়িকতার কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। অথর্বশিরস্ অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষদ। ইহাতেই সাম্প্রদায়িকতাপূর্ণ রুদ্র-শিব উপাসনার অন্যতম প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে রুদ্র বিভিন্ন বৈদিক দেবতা, যথা ব্রহ্মা প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, বরুণ প্রভৃতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন ত বটেই, সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পৌরাণিক দেবতা, যথা স্কন্দ, বিনায়ক, উমা (কেনোপনিষদে উমার নাম প্রথম পাওয়া গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি মহাকাব্য ও পুরাণের যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন) প্রভৃতিও তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে সপ্ত লোক, পঞ্চ মহাভূত, অষ্ট গ্রহ (তথাকথিত গ্রহের সংখ্যা আদিতে আট, পরে কেতু এই সংখ্যায় যুক্ত হইলে নব গ্রহ পূরণ হয়), কাল, অমৃত প্রভৃতি সবই ইঁহার বিভিন্ন রূপ। তিনি বিশ্বস্রষ্টা ও জগৎপাতা এবং সংহারকর্তা। তাঁহার এই রূপ কল্পনায় সুস্পষ্টভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখা না যাইলেও রুদ্রোপাসকদিগের এক বিশেষ ব্রতের কথা এখানে বলা হইয়াছে। ইহার নাম পাশুপত ব্রত, এবং এই ব্রতের অনুষ্ঠানে 'অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতিভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোম ইতি ভস্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভস্ম মনঃ এতানি চক্ষুংষি ভস্মানি' মন্ত্র পাঠ করিয়া উপাসক তাঁহার সর্বাঙ্গে ভস্ম স্পর্শ করাইতেন। এই ব্রত পালনের ফলে উপাসক পশুপাশ হইতে মুক্ত হইতেন (পশুপাশবিমোক্ষণ) এবং ঐশী শক্তির অধিকারী হইতেন। পাশুপত ব্রত ও পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আরও আলোচনা

করা হইবে ; কিন্তু এই অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন উপনিষদে আমরা যে সাম্প্রদায়িকতার অন্যতম প্রথম ইঙ্গিত পাই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পরবর্তী কালের যে সব সাহিত্যে রুদ্র ও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি খৃষ্টপূর্ব যুগের। পাণিনি আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বৈয়াকরণিক, পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থ এবং বৈদেশিক সাহিত্যও খৃষ্টপূর্ব যুগের বলিয়া স্বীকৃত। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণগ্রন্থের এক সূত্রে (৪, ১, ৪৯) দেবতার এই কয় নামের কথা বলিয়াছেন, যথা—রুদ্র, ভব, শর্ব এবং মৃড়। ইহার সবগুলিই আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই (মৃড় নামটি যজুর্বেদোক্ত শত-রুদ্রীয় স্তোত্রে রুদ্রের শত নামের অন্যতম)। এই তালিকায় শিবের নাম পাওয়া না গেলেও, আমরা শিবের নাম অপর এক সূত্রে পাই। পাণিনির 'শিবাদিভ্যোন' সূত্রে (৪, ১, ১১২ ; ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে) শিবের উল্লেখ রহিয়াছে। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে রুদ্র ও শিবের নাম কয়েকবার করিয়াছেন। রুদ্র সম্বন্ধে তিনি দুইবার বলিয়াছেন যে দেবতার উদ্দেশে পশুবলি হইত ; অপর দুই স্থলে রুদ্রের কল্যাণকর ভেষজের কথা বলা হইয়াছে (শিবা রুদ্রস্য ভেষজী)। শিবের উল্লেখও তিনি দুইবার করিয়াছেন। পাণিনির সূত্র 'দেবতাদ্বন্দ্বে চ' (৬, ৩, ২৬) ও ইহার কাত্যায়ন কৃত বার্তিক 'ব্রহ্মপ্রজাপত্যাদীনাং চ' এর ভাষ্যকালে তিনি দ্বন্দ্ব সমাসের তিনটি উদাহরণ দিয়াছেন, যথা ব্রহ্ম-প্রজাপতি, শিব-বৈশ্রবণৌ এবং স্কন্দ-বিশাখৌ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন যে এইরূপ দেবতার নাম সম্বলিত দ্বন্দ্ব সমাস বেদে পাওয়া যায় না। এ উক্তি যথার্থ, কারণ প্রজাপতি ব্যতিরেকে অপর দেবতা কয়টি অবৈদিক। মহাভাষ্যকার এই

প্রসঙ্গেই শিব, বৈশ্রবণ, স্কন্দ ও বিশাখ দেবতাদিগকে লৌকিক দেবতা-নিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। পাণিনির অন্যতম সূত্র 'জীবিকার্থে চাপণ্যে' (৫, ৩, ৯৯) র ভাষ্যকালে পতঞ্জলি স্কন্দ ও বিশাখের মূর্তির সহিত শিবের মূর্তির কথা বলিয়াছেন। পাণিনির আর এক সূত্রের (৫, ২, ৭৬) ব্যাখ্যানে তিনি শিবের ভক্তদিগেরও উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রের ও উহার ভাষ্যের বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব পরবর্তী অধ্যায়ে শৈব সম্প্রদায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্লেষিত হইবে।

প্রায় সমকালীন বৌদ্ধ সাহিত্যেও শিবের নাম কখনও কখনও পাওয়া যায়। চুল্লবগ্‌গ এবং সংযুক্ত নিকায়ে শিব দেব বা দেবপুত্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দীঘ নিকায় গ্রন্থে বুদ্ধ সকাশে দেবতাদিগের আগমন কাহিনী বর্ণনায় বেন্‌হু ও ঈশানের নাম আছে। বলা বাহুল্য যে প্রথমটি বিষ্ণুর পালি রূপ, এবং দ্বিতীয়টি শিবের আর এক নাম। পেতবত্থু, বিমানবত্থু, মিলিন্দ পঞ্‌হো এবং জাতকাদি বৌদ্ধ গ্রন্থে কখনও কখনও শিবের উল্লেখ পাওয়া যায় (শেষোক্ত গ্রন্থদ্বয় খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পরবর্তী কালের রচনা)। নিদ্দেস গ্রন্থে শিব যে দেব নামে অভিহিত হইয়াছেন, এ কথা প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি। আনুমানিক খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত মহামায়ূরী গ্রন্থে শিব ও শিবভদ্র যথাক্রমে শিবপুর ও ভীষণ (ভীষণা ?) নামক দুই স্থানের বাস্তু দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (শিব শিবপুরাহারে শিবভদ্রশ্চ ভীষণে)। এই শিবপুর ও ভীষণ বা ভীষণা (ভীমা) যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত ছিল উহা আমার গ্রন্থে দেখাইয়াছি (*D. H. I.*, 2nd edition, pp. 449-50)। পতঞ্জলি তাঁহার মহাভাষ্যে পাণিনির সূত্র 'অব্যয়াৎ ত্যপ' (৪, ২, ১০৪) এর বার্তিকের ব্যাখ্যা কালে বলিয়াছেন যে শিবপুর (শৈবপুর) একটি উদীচ্য গ্রাম, অর্থাৎ উত্তর দেশের গ্রাম।

ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে যে শিব পূজার বিশেষ

প্রচলন ছিল, উহা আমরা সুপ্রাচীন বৈদেশিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানের বিদেশী ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে পঞ্চনদ প্রদেশের একাংশে, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমের নিকট শিবয় (শিবি) নামক এক জাতীয় লোক বাস করিত। ইহারা খুব সম্ভব শিবপূজক ছিল, উহাদের কথা আরও বিশদভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। হেক্যাটিয়স নামক খৃষ্টপূর্ব যুগের এক গ্রীক গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে বৃষভ (শিবের পশুমূর্তি, পরে তাঁহার বাহন রূপে কল্পিত) গন্ধার প্রদেশের অধিবাসীদিগের অন্যতম প্রধান দেবতা ছিল। বৃষরূপী দেবতার মূর্তি পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশের যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি সেখানকার প্রাচীন যুগের (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী) বৈদেশিক রাজগণের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। শকরাজ মোঅস (Maues), পহ্লব রাজ গণ্ডোফেরিস (Gondophares) এবং কুষাণ রাজ বিম কদফিস (Wema Kadphises) ও কণিষ্ক প্রভৃতির মুদ্রায় শিবের মনুষ্য মূর্তি খোদিত দেখা যায়। এই সমস্ত সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্ব গত প্রমাণ বৌদ্ধ গ্রন্থ মহামায়ূরী ও মহাভাষ্যের উক্তি পূর্ণ-রূপে সমর্থন করে।

এই অধ্যায়ে এ যাবৎ শিব দেবতার প্রাক্‌বৈদিক ও বৈদিক রূপ এবং উহার পরবর্তী যুগে প্রধানতঃ খৃষ্টাব্দ গণনা আরম্ভের পূর্বে তাঁহার পূজা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল। মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, তাঁহার পূজা এবং প্রতিষ্ঠার কথা কত বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এখন তাহার যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। রামায়ণ ও মহাভারতের বহু অংশে এই দেবতার প্রাধান্য ও সম্যক্ প্রতিষ্ঠার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একাধারে রুদ্র, শিব, ও মহাদেব; তিনি গিরীশ, গিরিত্র, কপর্দী, কৃত্তিবাস (যাঁহার পরিধানে পশুচর্ম), হর (যিনি হরণ অথবা সংহার করেন), ভব। এই

সকল নাম ঋগ্বেদ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাঁহাতে অর্পিত দেখা যায়। এ যুগেও তিনি এই সব নামে অভিহিত হইয়াছেন ত বটেই, পরন্তু আরও নূতন নূতন বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তিনি চিহ্নিত হইয়াছেন। মহাকাব্য-দ্বয় ও প্রধান প্রধান পুরাণগুলিতে তাঁহার সম্বন্ধে বহু কাহিনী ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, যাহাদের মধ্যে অন্ততঃ কোনও কোনওটির উৎপত্তি স্থল শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে নির্ণীত হয়। গজাসুর বধ করিয়া শিব কর্তৃক গজচর্ম পরিধানের পৌরাণিক গল্প আমরা শত রুদ্রীয়তে প্রদত্ত রুদ্রের অন্যতম নাম 'কৃত্তিবাস' হইতে উৎপন্ন মনে করিতে পারি। শিবের দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কাহিনীর উৎস বোধ হয় তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। দেবতারা বলির পশু নিজেদের মধ্যে ভাগ করিতেছিলেন। তাঁহারা রুদ্রকে এড়াইয়া গিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহাকে ভাগ দেন নাই (দেবাঃ বৈ পশূন্ ব্যভজন্ত। তে রুদ্রমন্তরায়ন ; ৭, ৯, ১৬)। এই কাহিনী রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে কোথাও স্বল্প পরিসরে কোথাও বা অতি বিস্তৃত আকারে বর্ণিত দেখা যায়। দক্ষ প্রজাপতি অনুষ্ঠিত দৈব যজ্ঞে সকল দেবতা নিমন্ত্রিত হইলেও রুদ্র-শিব নিমন্ত্রিত হন নাই, কারণ বৈদিক যজ্ঞের ভাগে তাঁহার কোনও অধিকার ছিল না। শিবের স্ত্রী দক্ষের অন্যতমা কন্যা ইহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া বিনা নিমন্ত্রণে স্বামীর নিষেধসত্ত্বেও পিতৃগৃহে আসিয়া পিতার নিকট পতিনিন্দা শ্রবণে দেহত্যাগ করিলে, শিব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন এবং বৈদিক দেবতাগণের, দক্ষের, ও যজ্ঞে উপস্থিত ব্রহ্মর্ষিগণের প্রভূত শাস্তি বিধান করেন। এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা সংক্ষিপ্ত বিবরণ রামায়ণের আদিকাণ্ডে পাওয়া যায় (১, ৬৬, ৭ ···)। মহাভারতের সৌপ্তিক ও শান্তিপর্বে ইহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বর্ণনা দেখি। শান্তিপর্বোক্ত আখ্যানে দধীচী মুনি রুদ্র-শিবের পক্ষ লইয়া দক্ষ ও যজ্ঞে সমবেত বৈদিক দেবতা ও ঋষিগণের সহিত বিতণ্ডাকালে রুদ্র মহেশ্বরকে পশুভৃৎ, স্রষ্টা, জগৎপতি, সকলের প্রভু এবং প্রকৃত যজ্ঞভোক্তা বলিয়া

বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে দক্ষ প্রজাপতির একটি উক্তি লক্ষ্য করিবার বিষয়। দক্ষ বলিতেছেন যে শূলধারী জটামুকুটবিশিষ্ট একাদশ রুদ্র আছেন বটে, কিন্তু মহেশ্বরকে আমি জানি না (সন্তি নো বহবো রুদ্রাঃ শূলহস্তাঃ কপর্দিনঃ। একাদশ স্থানগতাঃ নাহং বেদ্মি মহেশ্বরম্)। এখানে যেন বৈদিক রুদ্র হইতে পৌরাণিক রুদ্র-শিবকে পৃথক্ করা হইয়াছে।

ভাগবত পুরাণে (৪র্থ স্কন্ধ, ২-৭ অধ্যায়) এই কাহিনীর বৃহত্তম বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং ইহা একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে ইহা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন। শৈব সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাকে ভাগবত সম্প্রদায়ভুক্ত পুরাণকাব নানাভাবে কটূক্তি করিয়াছেন। দক্ষ ইহাকে মর্কটলোচন, প্রেত-ভূতগণ সহ শ্মশানচারী, ক্রিয়াবিহীন অশুচি (লুপ্তক্রিয়াশুচয়ে), দিগম্বর, প্রসারিত জটাবিশিষ্ট, কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন করিতে করিতে উম্মত্তবৎ পরিভ্রমণশীল, চিতাভস্মে স্নানকারী, অস্থিভূষণ ও মুণ্ডমালী, প্রকৃতপক্ষে অশিব (অমঙ্গলদায়ক) কিন্তু শিবনামধারী, উন্মাদ ও উন্মাদগণপ্রিয়, তমোগুণান্বিত, প্রমথ ও ভূতপতি ইত্যাদি কটূক্তি কবিয়াছেন। পাশুপতদর্শনোক্ত বিধি আলোচনাকালে পরবর্তী অধ্যায়ে দেখানো হইবে যে একদল শিবপূজক যে প্রক্রিয়ায় ধর্মাচরণ করিতেন উহা পুরাণকার কর্তৃক তাঁহাদের দেবতার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। শান্তিপর্বে যেমন দধীচী মুনি রুদ্র-শিবের স্বপক্ষে ছিলেন, এখানে তেমন নন্দীশ্বর তাঁহার সমর্থক। নন্দীশ্বর দক্ষ ও ঋষিগণ দ্বাবা আচরিত বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। এই সমস্ত আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে শিবপূজার যে সব পদ্ধতি শিবোপাসকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল উহা বেদবিবোধী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং শিবভক্তগণও বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডের তীব্র সমালোচক ছিলেন। বৈদিক রুদ্র দেবতার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি

শিব দেবতার মধ্যে রূপায়িত হইলেও, শিবেব মধ্যে আরও এমন কিছু ছিল যাহাব মূল সুপ্রাচীন আর্যেতর ও প্রাক্‌বৈদিক এবং আর্যেতর ও বেদ পরবর্তী এক বা একাধিক দেবপূজার মধ্যে নিহিত ছিল। শিব যে প্রধানতঃ লৌকিক দেবতা ছিলেন ইহার প্রমাণ আমরা মহাভাষ্যে পাই,—এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। রামায়ণের এক অংশেও ইহাব সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইহার এই অংশে (৫, ৮৯, ৬ ···) শিব ও উমার সহিত কৈলাস পর্বতে কুবের ও তাঁর পত্নী ঋদ্ধির একান্তভাবে মিলন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কুবের বা বৈশ্রবণও যে লৌকিক দেবতা এ কথা পতঞ্জলিই বলিয়াছেন। এই দেবদম্পতীদ্বয়ের মিলনকালে যক্ষ ও গুহ্যকগণ তাঁহাদের পরিচর্যা করিয়াছিলেন।

শিবের বেদবাহ্যতার মূলে যে মুখ্যতঃ শিশ্ন বা অনুরূপ দেবপূজকদিগের দ্বারা আচরিত আর এক বিশেষ ধর্মাচরণ ছিল ইহার ইঙ্গিত পূর্বে করিয়াছি। ইহা ছিল লিঙ্গপূজা। সিন্ধুঘাটীর প্রাক্-আর্য অধিবাসীরা খুব সম্ভব এক আদিশিব জাতীয় দেবতাকে লিঙ্গপ্রতীক সাহায্যে পূজা করিত, ইহারাই যে ঋগ্বেদে 'শিশ্নদেব' বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক নিন্দিত হইয়াছে ইহাও অনেক পণ্ডিত স্বীকার করেন। এই বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান যে আর্য ও আর্যেতর ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলে ভারতীয় জনসমাজের উচ্চস্তরের একাংশের মধ্যে ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করে ইহা একরূপ সুনিশ্চিত। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগের সাহিত্যেই শিবলিঙ্গ পূজা সাহিত্যকারদিগের আংশিক সমর্থন লাভ করিয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় সন্দেহ করিয়াছিলেন যে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের দু একটি শ্লোকে বোধ হয় এই প্রতীক পূজার সমর্থনসূচক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রথমটি এই—

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যস্মিন্নিদং সং চ বি চেতি সর্বম্।
তমীশানং বরদং দেবমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥ (৪, ১১)

অপর শ্লোক এইরূপ—

যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চ সর্বাঃ।
ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ॥

(৫, ২)

এই দুটি শ্লোকেরই প্রথম চরণে ঈশান (শিব) দেবতাকে প্রতি যোনিতে অধিষ্ঠিত থাকিবার বর্ণনা দেখিয়া ভাণ্ডারকরের মনে এইরূপ সংশয় জাগিয়াছিল। কিন্তু এখানে যোনি যে স্ত্রীচিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া মূল কারণ বীজ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্বমূলক প্রমাণও আমাদের এই উক্তি সমর্থন করে। লিঙ্গপ্রতীকের আদিমতম ও কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের যে সব নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এগুলির কোনওটিতেই লিঙ্গ ও যোনি একত্র করিয়া দেখানো হয় নাই। এই দুইটি পূজা প্রতীকের একত্র সমাবেশ আমরা গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগের নিদর্শনগুলিতেই পাই,—তখন ইহার শিশ্নাকৃতি অনেকাংশে প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং ইহা ক্রমশঃ সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়াছিল। গুপ্তপূর্ব কালের এবং খৃষ্টপূর্ব যুগের যে সব শিবলিঙ্গ বা তাহার চিত্র মুদ্রায় বা শিলমোহরে দেখা যায়, সেগুলিতে পরবর্তী কালের যোনিপট্ট দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং ইহাদিগকে ঊর্ধ্বোত্থিত মুক্তমুখচর্ম পুংলিঙ্গের আকারে রূপায়িত দেখা যায়। গোপীনাথ রাও মহাশয় খৃষ্টপূর্ব যুগের এইরূপ একটি পরশু ও মৃগধারী দ্বিভুজ শিবের আকৃতি সংযুক্ত সুদীর্ঘ শিবলিঙ্গ অন্ধ্র প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা অদ্যাবধি পূজা পাইয়া আসিতেছে। ইহাতে কোনও যোনিপীঠ বা যোনিপট্ট নাই।

উজ্জয়িনীতে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের একটি লেখবিহীন তাম্রমুদ্রার একদিকে আছে শিব দেবতার দণ্ড কমণ্ডলুহস্ত দ্বিভুজ মনুষ্য মূর্তি, পার্শ্বে তাঁহার বাহন বৃষভ (দেবতার পশুমূর্তি) এবং অপরদিকে দেখা যায় স্থূলবৃক্ষের সম্মুখে তাঁহার অনুরূপ লিঙ্গ মূর্তি। মথুরা, লক্ষ্ণৌ

প্রভৃতি উত্তর প্রদেশস্থ সহরের চিত্রশালায় খৃষ্টীয় প্রথম তিন শতাব্দীর যোনিপট্টবিহীন এমন সব শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে, যেগুলি হইতে উচ্ছ্রিত মুক্তমুখচর্ম মনুষ্যলিঙ্গের সহিত তাহাদের আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এই সব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে শিবলিঙ্গ পূজার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝা যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে লিঙ্গপূজা বৌদ্ধ স্তূপপূজা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। আদি মধ্য ও মধ্যযুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ পূজা সংক্রান্ত স্তূপগুলির মেধি ও দীঘাকৃতি অণ্ডের সহিত গুপ্তপরবর্তী কালের রূপান্তরিত শিবলিঙ্গের আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অনুভূত হয়। কিন্তু মনে রাখা আবশ্যক যে এই দুই বিভিন্ন পূজা প্রতীকের কোনওটিই গুপ্ত বা প্রাক্-গুপ্ত কালের নহে। প্রাক্-গুপ্তযুগের উপবিলিখিত এবং অনুরূপ অন্যান্য শিবলিঙ্গগুলির আকৃতির বিষয় স্থিরচিত্তে বিবেচনা কবিলেই ইহাদেব যথার্থ তাৎপর্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। শিবলিঙ্গ পূজার উৎপত্তি যে এক পিতৃ-দেবতার সৃজন-শক্তিকে কেন্দ্র করিয়াই হইয়াছিল উহা গোপীনাথ রাও মহাশয় বহু অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন পৌবাণিক ও তান্ত্রিক গ্রন্থাদির সাহায্যে প্রমাণ কবিতে চেষ্টা পাইয়াছেন (*Elements of Hindu Iconography*, Vol. II, pp. 61-2)। ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অধিবাসীদিগের একাংশের মধ্যে প্রচলিত এইরূপ এক বিশেষ ধর্মানু-ষ্ঠানের জন্য আধুনিক কালের ভারতীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ লজ্জা পাইয়া থাকেন। এ মনোভাব নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। বৈদিক ও উহার পরবর্তী যুগের বহু ভারতীয় মনে হয় এ অনুষ্ঠান সমর্থন করিতেন না। বিশাল মহাভারতেব দু একটি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অংশেই শিবলিঙ্গ পূজার সমর্থন পাওয়া যায়। শিবের আকৃতি বর্ণনা কালে মহাকাব্যকার বলিয়াছেন—ঊর্ধ্বকেশঃ মহাশ্চেপঃ নগ্নো বিকৃতলোচনঃ। অনুশাসন পর্বের কৃষ্ণ-উপমন্যুসংবাদ পর্বাধ্যায়েই আমরা প্রথম লিঙ্গ ও যোনি পূজার স্পষ্ট সমর্থন পাই। কিন্তু এখানেও লিঙ্গ-যোনির যুক্ত

রূপের কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নাই,—উহা অনেক পরবর্তী কালের তান্ত্রিক গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে।

প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে অনেকে যে এক বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের এই পূজা পদ্ধতি সুচক্ষে দেখিতেন না উহা তাঁহাদের এ সম্পর্কে প্রথম দিকে উদাসীনতা ও নীরবতাই প্রমাণিত করে। কিন্তু তাঁহাদের উপেক্ষা ও অসমর্থন ইহাকে অপসারিত করিতে পারে নাই। ইহা যে শৈবদিগের মধ্যে শুধু কোনও রূপে টিঁকিয়া গিয়াছিল তাহা নহে, বরং কালক্রমে ইহার উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই শক্তি বৃদ্ধির মূলে তান্ত্রিক উপাসনার ক্রমবিকাশ বর্তমান থাকিলেও, লিঙ্গ প্রতীকের আমূল রূপ পরিবর্তন ঘটায় আপাত-দৃষ্টিতে ইহার অশ্লীলতার ভাব সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া যায়, এবং এই প্রতীক পূজা শৈব ও স্মার্তদিগের মধ্যে অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠে। ক্রমশঃ ইহা পূজাপ্রতীক রূপে এত অধিক জনপ্রিয় হইয়া পড়ে যে ইহা প্রতি শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে প্রধানতম ও মুখ্য পূজার বস্তু হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। শিব দেবতার অসংখ্য মনুষ্যমূর্তি, তাঁহার অগণিত লীলার প্রকাশ, এই সব মন্দিরের বিভিন্ন অংশে গৌণ স্থান অধিকার করিতে বাধ্য হয়। যাঁহারা ঈলোরার কৈলাস মন্দির দেখিয়াছেন তাঁহারা আমার এই উক্তির পূর্ণ সমর্থন করিবেন। সুবৃহৎ গর্ভগৃহে বিশালকায় লিঙ্গের ভগ্নাবশেষ অবস্থিত, আর মন্দিরের অন্যান্য অংশে দেবতার অগণিত লীলামূর্তি রক্ষিত আছে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গ-রাজ মন্দিরের মূর্তিসংস্থানও এই রূপ। শিবলিঙ্গ পূজার এত অধিক জনপ্রিয়তা সম্ভব হইয়াছিল গুপ্ত ও তৎপরবর্তী যুগ হইতে, কারণ গুপ্তকাল হইতেই লিঙ্গ প্রতীকের আকৃতি পরিবর্তিত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ ইহা এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে ইহার আদি প্রকৃতি বহুলাংশে প্রচ্ছন্ন হয়। কিন্তু শিবলিঙ্গ নির্মাণের বিধি প্রসঙ্গে মধ্যযুগীয় মূর্তিশাস্ত্রে উহার উর্ধ্বাংশে (রুদ্র বা পূজাভাগে) ব্রহ্মসূত্র পাতনের যে

ব্যবস্থা লিখিত আছে উহাতেই ইহার প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ পূজা বিষয়ক আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। বহু প্রাচীনকাল হইতে স্বর্গত পিতৃপুরুষাদির স্মারক হিসাবে স্তম্ভ স্থাপন প্রথা পৃথিবীর সর্ব দেশে প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। শিবলিঙ্গ পূজার সর্বাধিক প্রচলনের মূলে এই প্রথাও মনে হয় কিছু পরিমাণে কার্যকরী হইয়াছিল। সাধু মহাত্মাদিগের সমাধি বা শ্মশানমন্দিরে এবং স্বর্গত নৃপতিবর্গের (বিশেষ করিয়া রাজপুতানা অঞ্চলে) শ্মশানক্ষেত্রে তাঁহাদের নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজার ব্যবস্থা এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে।

শৈবদিগের প্রধান পূজাপ্রতীক শিবলিঙ্গের প্রকৃতি ও প্রচলন বিষয় অনুশীলনকালে আমি দেবতার অসংখ্য লীলামূর্তির উল্লেখ করিয়াছি। লিঙ্গ প্রতীক ও লীলামূর্তিগুলি শিবের পঞ্চকৃত্যের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, প্রসাদ বা অনুগ্রহ এবং তিরোভাব) মধ্যে অন্ততঃ তিনটির, যথা সৃষ্টি, সংহার ও অনুগ্রহের রূপ দান করে। লিঙ্গ প্রতীক দেবতার সৃজন-শক্তি বা প্রথম কৃত্যেরই বাহ্য রূপ। অপর দুইটি কৃত্যের ও দেবতার অন্য সব বৈশিষ্ট্যেরও শাস্ত্রসঙ্গত রূপায়ণ মধ্যযুগীয় শিল্পীরা নানাভাবে করিয়াছিলেন। অধ্যায় শেষে এই সব বিবিধ মূর্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক। শিবের মানবোচিত মূর্তি সকল প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। বৈদিক ও বেদপরবর্তী সাহিত্যে রুদ্র-শিব দেবতার দুই রূপের (উগ্র ও সৌম্য) বর্ণনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শিবমূর্তির অধিকাংশ এই দুই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। ইহাদিগের মধ্যে আবার এক বৃহত্তর সংখ্যা দেবতা সম্বন্ধীয় কোনও না কোনও পৌরাণিক কাহিনীর রূপ প্রদান করে। মূর্তিগুলির অল্পাংশ দুরূহ শিবতত্ত্বেরও কিঞ্চিৎ পরিচয় দেয়। শেষোক্ত প্রতিমাসমূহের এবং উগ্র ও সৌম্য বিভাগদ্বয়ের কয়েকটির ভিত্তিমূলে সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক কাহিনীর অস্তিত্ব

নাই। শিবের কাহিনী সম্বলিত উগ্র বা সংহারমূর্তির কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথমে তাঁহার এই সকল প্রতিমার কথাই মনে পড়ে,—যথা গজাসুরসংহার মূর্তি, ত্রিপুরান্তক, অন্ধকাসুরবধ, জালন্ধরবধ, কালারি, কামান্তক, শরভেশ মূর্তি ইত্যাদি। ইহাদের অন্তর্নিহিত পৌরাণিক কাহিনী বা মূর্তিশাস্ত্রোক্ত ইহাদের বিভিন্ন বর্ণনা এবং মধ্যযুগীয় ভারতশিল্পে ও ভাস্কর্যে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ বর্তমান গ্রন্থের বিষয়ীভূত নহে। তবে এ কথা পূর্বেও বলা হইয়াছে, এবং এখানেও বলা আবশ্যক যে ইহাদের ও সৌম্য মূর্তিসমূহের কয়েকটির অন্তর্নিহিত গল্পের মূল শেষের দিকের বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। যে সব রৌদ্র মূর্তির মূলে কোনও পৌরাণিক গল্প নাই, উহাদিগের মধ্যে এগুলি উল্লেখযোগ্য, যথা—ভৈরব, অঘোর, রৌদ্র-পাশুপত, বীরভদ্র, বিরূপাক্ষ ইত্যাদি। সৌম্য মূর্তিসমূহের যে অংশের মূলে বিশেষ কোনও পৌরাণিক উপাখ্যান নাই, নিম্নলিখিত মূর্তিগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত; যথা—চন্দ্রশেখর মূর্তি, উমাসহিত মূর্তি, আলিঙ্গন-চন্দ্রশেখর, বৃষবাহন, সুখাসন, উমা-মহেশ্বর, সোমাস্কন্দ (উমা ও স্কন্দ সহিত) মূর্তি, ইত্যাদি। সৌম্য মূর্তিসমূহের এক বৃহৎ অংশ দক্ষিণা-মূর্তি ও নৃত্য-মূর্তির পর্যায়ে পড়ে। ইহাদিগের মূলেও সাধারণতঃ কোনও পৌরাণিক কথা নাই। যোগ দক্ষিণা, জ্ঞান দক্ষিণা, ব্যাখ্যান দক্ষিণা, বীণাধর দক্ষিণা-মূর্তি, এবং নাদন্ত, ললিত, তলসংস্ফোটিত, ললাটতিলক, কটিসম প্রভৃতি করণের বিভিন্ন নটরাজ মূর্তিগুলি দেবতার নানা বিদ্যায় পারদর্শিতার কথাই প্রকট করে। সৌম্য মূর্তিপর্যায়ের অনুগ্রহ-মূর্তিগুলির প্রত্যেকটির মূলে কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী বর্তমান। পুরাণাদি গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শিব ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের (ইহাদের মধ্যে বিষ্ণু প্রভৃতি কয়েকটি দেবতাও ছিলেন) স্তবে তুষ্ট হইয়া নানাভাবে তাঁহাদের মঙ্গল করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মূর্তি-গুলির মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত কয়টি প্রধান বলা যাইতে পারে—

বিষ্ণ্বনুগ্রহ বা চক্রদান মূর্তি, পাশুপতাস্ত্রদান মূর্তি (অর্জুনের স্তবে তুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে পাশুপত অস্ত্র দান করেন), চণ্ডেশানুগ্রহ মূর্তি, রাবণানুগ্রহ মূর্তি। দেবতার সৌম্য যথা গঙ্গাধরাদি মূর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূর্তি হইল কল্যাণসুন্দর বা বৈবাহিক মূর্তি ; ইহার বিষয় শিব ও উমার বিবাহ। ভারতীয় শিল্পী এলিফ্যাণ্টায় এবং অন্যত্র দেব-দম্পতীর মিলন ভাস্কর্যশিল্পে অতি অনবদ্য ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। শিল্পকলার দিক দিয়া এরূপ উচ্চস্তরের না হইলেও শৈব দার্শনিক তত্ত্ব ব্যাখ্যাকারী কয়েকটি মূর্তির এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সদাশিব মূর্তি, মহাসদাশিব মূর্তি, মহেশ মূর্তি প্রভৃতি দেবপ্রতিমা সকল কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য উপায়ে আগমান্ত ও শুদ্ধশৈব সম্প্রদায়ের দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বকে রূপ প্রদান করে। কয়েকটি বিশিষ্ট শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচনাকালে দেখানো হইবে যে এই ভয় ও ভক্তির দেবতাকে আশ্রয় করিয়া কত বিভিন্ন প্রকার দার্শনিক তত্ত্ব কল্পিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল।

উপরিলিখিত বিভিন্ন শৈব মূর্তি ব্যতীত আরও অনেক শৈব প্রতিমা ভারতের বিভিন্ন অংশে পাওয়া গিয়াছে। বাহুল্যভয়ে সেগুলির নামোল্লেখ করা হইল না, এবং উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। তথাপি এ প্রসঙ্গে এই দেবতার সাম্প্রদায়িকতামূলক ও সমন্বয়সূচক দু একটি মূর্তি সম্বন্ধে অধ্যায়শেষে কিছু বলা আবশ্যক। মহাকাব্যদ্বয়ে ও পুরাণাদি গ্রন্থে ঈশ্বরের ত্রিত্ব কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি ব্রহ্মা রূপে স্রষ্টা, বিষ্ণু রূপে গোপ্তা বা পালনকর্তা এবং শিব রূপে সংহারকর্তা। সাম্প্রদায়িক শৈব বা বৈষ্ণবদিগের নিকট শিব বা বিষ্ণুই একাধারে এই তিন শক্তির অধিকারী। ধর্মসম্বন্ধীয় সাম্প্রদায়িকতার পূর্ণ উদ্ভবের পূর্বে রচিত প্রগাঢ় ঈশ্বরবাদমূলক শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্র দেবতাকে একাধারে শক্তিত্রয়ের উৎস রূপে কল্পনা করার কথা পূর্বে বলিয়াছি। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদেব ইষ্ট দেবতার দত্তাত্রেয় রূপ কল্পনায় হরি-হর-পিতামহ

(ব্রহ্মা) কে একত্র সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও শৈব সাধক তাঁহাদের দেবতার ত্রিমূর্তি কল্পনা সাধারণতঃ এইভাবে করিতেন —পরশু-মৃগ-বরাভয় হস্ত চতুর্ভুজ, ও একপাদ শিব ঋজ্বায়তভাবে দণ্ডায়মান ; তাঁহার দক্ষিণ ও বাম পার্শ্বদেশ হইতে শিবকে করজোড়ে স্তূয়মান ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অর্ধনির্গমনশীল। বলা বাহুল্য দেবতার এই রূপায়ণে সাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বর্তমান। কিন্তু ত্রিমূর্তি বলিয়া সাধারণতঃ বর্ণিত (এ বর্ণনা ভ্রান্ত) মস্তকত্রয় ও দেহের উপরার্ধ একত্র সংযুক্ত দেবতার মূর্তিবিশেষ অতি সুন্দরভাবে শিব-শক্তি সমন্বয়ের বাহ্য রূপ প্রকাশ করে। যে সমন্বয়ের আর এক প্রকাশ শিবের অর্ধনারীশ্বর মূর্তিতে দেখিতে পাওয়া যায়, উহারই অপর এক সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা আমরা এই তথাকথিত ত্রিমূর্তিগুলিতে পাই। ভারতের নানাস্থানে এবং এমন কি ভারতের বাহিরে চীনদেশের পশ্চিম প্রান্তেও (দণ্ডান-ইউলিক, কুড়ুকখোল প্রভৃতি স্থানে) যে এই জগৎপিতা ও জগন্মাতার সম্মিলিত রূপ তত্তৎ দেশের মধ্যযুগীয় শিল্পিগণ কর্তৃক ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের মাধ্যমে প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি নিদর্শন অদ্যাবধি পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে প্রাচীনতম ও সুন্দরতম মূর্তি এলিফ্যাণ্টা গুহা মন্দিরে আনুমানিক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে খোদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যস্থিত মুখ ও দেহার্ধ দেবতার সৌম্য রূপ, দক্ষিণস্থ দংষ্ট্রাকরাল ভৈরব-বক্ত্র তাঁহার রৌদ্র রূপ এবং বামভাগে প্রদর্শিত লাজনম্র দৃষ্টি পেলবাধর-বিশিষ্ট, সুবিন্যস্ত কেশপাশসংযুক্ত উমাবক্ত্র তাঁহার শক্তি রূপ—এই তিন রূপের সমন্বয় প্রকাশ করিতেছে। জগৎপিতা রুদ্র-শিবের ঘোরা ও শিবা তনুর কল্পনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এলিফ্যাণ্টা গুহামন্দিরের সুবৃহৎ আবক্ষ শিব মূর্তিটিতে মহাকবি কালিদাসের শিবশক্তি সমন্বয়ের অপূর্ব বর্ণনা অনবদ্যভাবে রূপায়িত হইয়াছে।

বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ॥

অষ্টম অধ্যায়

শিব—শৈব

শৈব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—পাশুপত, কাপালিকাদি 'অতিমার্গিক' সম্প্রদায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে শৈবদিগের উপাস্য দেবতা রুদ্র-শিবের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাঁহার গোষ্ঠীবদ্ধ উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের বিষয় আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনায় সাহিত্যগত প্রমাণ প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করে, এবং এ কারণেই ইহাতে প্রাক্‌বৈদিক বা প্রাগৈতিহাসিক প্রমাণপঞ্জীর কোনও স্থান নাই। বৈদিক যুগের পূর্বেকার কোনও সাহিত্য অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, ভবিষ্যতে যে কখনও উহা হইবে এমন ভরসাও নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক কালের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ হইতেই আমাদের এতদ্বিষয়ক অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে হইবে। ইহার দশম মণ্ডলের ১৩৬ সূক্তে কেশী এবং মুনিগণের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা পাওয়া যায়। সূক্তটি পুরুষসূক্তের ন্যায় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী স্তরের, এবং ইহার প্রধান বিষয়বস্তু কেশী ও মুনিগণের বর্ণনা দ্বারা বৈদিক ঋষিরা যে ঠিক কাহাদের লক্ষ্য করিয়াছেন ইহা সহজবোধ্য নহে। স্বর্গত অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয় তাঁহার এক অপ্রকাশিত রচনায় (ইহা আংশিক মুদ্রিত হইলেও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই) এই সূক্ত প্রাচ্যদেশবাসী এক ভ্রাম্যমাণ ও তপশ্চর্যানিরত পরিব্রাজক মণ্ডলীর বৈদিক ঋষি কর্তৃক বর্ণনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সপ্তসংখ্যক অনুবাক বিশিষ্ট এই সূক্তটির দ্বিতীয় অনুবাকে মুনিগণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছেন—'(প্রায়) দিগম্বর মুনিগণ ধূলিমলিন পিঙ্গলবর্ণ বস্ত্র' (পরিধান করেন; এই বর্ণনায় কি মুনি কর্তৃক কৌপীন পরিধানের ইঙ্গিত আছে?—মূল পদ

এইরূপ—মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশঙ্গা বসতে মলা)।[১] প্রথম ও আরও কয়টি অনুবাকে কেশীকে এই মুনিগণের অন্যতম বলা হইয়াছে ; কেশী (দীর্ঘকেশ বিশিষ্ট), বায়ুর সখা, দেবতাদিগের দ্বারা অনুপ্রাণিত, তপশ্চর্যার দ্বারা উন্মদিত (উন্মত্ত—উন্মদিতাঃ মৌনেয়েন), মুনি (কেশী) পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে বাস বা ভ্রমণ করেন, তিনি বিষপাত্রের দ্বারা যাহা নত হয় না এইরূপ দ্রব্যসকলকে ভগ্ন করেন, এই বিষপাত্র তিনি রুদ্রের সহিত পান করিয়াছিলেন (···পিনষ্টি স্ম কুননংনমা। কেশী বিষস্য পাত্রেণ যদ্রুদেণাপিবৎ সহ)। দীর্ঘকেশ (জটা ?) মণ্ডিত প্রায় দিগম্বর ধূলিমলিন পিঙ্গল বস্ত্রাংশ পরিহিত উন্মত্ততাপূর্ণ মুনি কি পাশুপত ব্রতধারী রুদ্র-শিব পূজকদিগের পূর্বপুরুষ ? এই অনুমান আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অসঙ্গত কল্পনা নাও হইতে পারে। পাশুপত সাধকদিগের ন্যায় কেশী-মুনিগণেরও তপশ্চর্যারূপ ব্রতসাধনার দ্বারা অতিপ্রাকৃত ঐশী শক্তি অর্জনের কথা এ সূক্তে বলা হইয়াছে। সর্বোপরি রুদ্রসহচর কেশী-মুনি রুদ্রের সহিত যে বিষপান করিয়াছিলেন ইহারও উল্লেখ এ সূক্তে বর্তমান। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৬, ৩৩) ঐতস মুনির উন্মত্ততা ও প্রলাপ ভাষণের যে আর এক দুর্বোধ্য বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়, উহাও পাশুপতদিগের উন্মত্ত আচরণ ও প্রলাপ ভাষণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু উক্তরূপ অনুমানের সাপক্ষে এইসব যুক্তি থাকিলেও, ইহা যে সর্বাংশে গৃহীতব্য এ কথা বলা যায় না। কারণ যেকালে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল, তখন রুদ্র-শিব দেবতা আর্যগণের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেন নাই। এতদ্ব্যতীত সূক্তটির কোন অংশেও রুদ্রদেবতার পূজার এমন কি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত পর্যন্ত নাই। ইহার শেষ চরণে মাত্র একবার রুদ্রের

১। 'বাতরশনা' কথাটির এক অর্থ হইতে পারে 'বায়ু যাহাদের পরিধেয়'। চাকলাদার মহাশয় ইহার অর্থ করিয়াছেন 'বায়ু যাহাদের আহার্য বস্তু' (those who live on the wind)।

নাম পাওয়া যায়, তাহাও বিষপান প্রসঙ্গে। সায়ন এ বিষ কালকূট বিষ অর্থে গ্রহণ করেন নাই, ইহার 'জল' অর্থ গ্রহণ করিয়া প্রখর রশ্মিরূপ অসংখ্য জটাবিশিষ্ট সূর্যদেবতা কর্তৃক জলশোষণের ইঙ্গিত সূক্তটিতে দেখিয়াছেন। সে যাহা হউক, কেশী সূক্তের প্রকৃত অর্থ এত দুরূহ এবং অনিশ্চিত যে ইহার একরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া ইহার রচনাকালে রুদ্রপূজক গোষ্ঠীর অস্তিত্বের বিষয় নির্বিচারে স্বীকৃত হইতে পারে না। তবে এই সূক্তের শেষ চরণে রুদ্র কর্তৃক বিষ (জল ?) পানের কথাই যে পৌরাণিক যুগের নীলকণ্ঠ শিব কর্তৃক কালকূট বিষপান কাহিনীর উৎস সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

রুদ্রপূজক গোষ্ঠীর উপরিলিখিত সন্দেহাত্মক উল্লেখের কথা বাদ দিলে, শিবপূজক-শৈবদিগের অস্তিত্বের প্রথম অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ইঙ্গিত পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ের একটি সূত্র (৪, ১, ১১২) 'শিবাদিভ্যোন' পরোক্ষভাবে শিবপূজকগণকেই বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। সূত্রের অর্থ এই যে শিবাদি শব্দের পর 'অন' প্রত্যয় করিয়া যে পদ নিষ্পন্ন হয় উহা দ্বারা শিব ইত্যাদির অপত্যগণকেই বুঝায়। প্রত্যয়ান্ত শৈব শব্দ অপত্যার্থে দেবতার এক-ভক্ত পূজকদিগের কথাই যে বলিতেছে এ অনুমান অসঙ্গত নহে। বহু পরবর্তী কালে রচিত লিঙ্গপুরাণের একটি উক্তি এই অনুমান সমর্থন করে। শিবের লকুলীশাবতারের কথা বলিতে গিয়া, পুরাণকার লকুলীশের প্রধান চারিজন ভক্ত শিষ্য, যথা কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং কৌরুষ্যকে তাঁহার পুত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাণিনি ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে সিন্ধু নদের অপর পারে গন্ধার প্রদেশের সলাতুর নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার সময়ে (খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে) ঐ অঞ্চলে শিবের পূজা যে প্রচলিত ছিল এ কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। পাণিনির সময়ের ন্যূনাধিক এক শতাব্দী পরে পঞ্জাব প্রদেশের এক অংশে যে শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত লোকগণ

বাস করিতেন, ইহার প্রমাণ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত সমসাময়িক গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালের বৈদেশিক গ্রন্থকারদিগের উদ্ধৃতি হইতে জানা যায়। কুইন্‌টাস কার্টিয়াস, ডিও-ডোরাস প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে শিবি (Sibae, Siboi) নামক এক জাতি আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণকালে ঝিলাম ও চিনাব নদীর (তাঁহাদের গ্রন্থে এই দুই নদীর নাম—Hydaspes ও Accsines, সংস্কৃত বিতস্তা এবং অসিক্নীর গ্রীক রূপ) সঙ্গমস্থলের নিকট বাস করিতেন। বহু পূর্বে পণ্ডিতপ্রবর ল্যাসেন (Christini Lassen) যথার্থ অনুমান করিয়া-ছিলেন যে গ্রীক গ্রন্থে বর্ণিত শিবি বা শিবয় এবং মহাকাব্য ও পুরাণা-দিতে লিখিত ঔশীনর শিবি ইহারা একই প্রাচীন ভারতীয় জাতিকে বুঝাইতেছে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলান্তর্গত অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম অনুবাকে অলিন, পক্‌থ, ভলানস, বিশানিন প্রভৃতি জাতির সহিত শিব জাতির নাম দেখা যায়। কোনও কোনও পণ্ডিত মনে করেন যে এই শিব এবং শিবি এক জাতি। সে যাহাই হউক, শিবি জাতির যে বর্ণনা উপরিলিখিত গ্রীক গ্রন্থকারগণ দিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় তাঁহারা শিবপূজক গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। শিবিরা বন্যপশুর চর্ম পরিধান করিতেন, তাঁহারা দণ্ডপাণি ছিলেন, এবং তাঁহাদের পশু-দিগকে দণ্ডাঙ্ক দ্বারা চিহ্নিত করিতেন। এই বর্ণনা শিবভক্তদিগের যে বিবরণ মহাভাষ্যে পাওয়া যায় তাহার সহিত আংশিক ভাবে মিলে। মহাভাষ্যে উদ্ধৃত শিবপুর বা শৈবপুর নামে এক উদীচ্য গ্রামের উল্লেখ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। বৌদ্ধ মহামায়ূরী গ্রন্থেও শিবপুরের কথা আছে। পঞ্জাবের এই অঞ্চলের একটি নগর যে গুপ্তযুগেও শিবিপুর বলিয়া পরিচিত ছিল তাহা বর্তমান সোরকোট নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি বৃহৎ ধাতুপাত্রে উৎকীর্ণ ৮৩ গৌপ্তাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায়।

পাণিনির সূত্র, 'অয়ঃশূলদণ্ডাজিনাভ্যাং ঠক্‌ঠঞৌ' (৫, ২, ৭৬) এর ভাষ্যকালে পতঞ্জলিই প্রথম সুস্পষ্টভাবে শিবভক্তদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে 'শিবভাগবত'দিগের নাম করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে পাণিনীয় সূত্রানুসারে 'ঠক্' ও 'ঠঞ্' প্রত্যয় দুইটি 'অয়ঃশূল' ও 'দণ্ডাজিন' শব্দদ্বয়ের পরে প্রয়োগ করিলে এমন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝাইবে যাঁহারা লৌহশূল, দণ্ড ও অজিন (পশুচর্ম) ইত্যাদি ব্যবহারের দ্বারা স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান। পতঞ্জলি আরও বিশদভাবে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে শিবভাগবতগণই আয়ঃ-শূলিক অর্থাৎ লৌহত্রিশূলধারী; তিনি দণ্ডাজিনিক কথাটি বোধ হয় বাহুল্যবোধে এ স্থলে ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু মূলসূত্রে দণ্ডাজিন কথাটি থাকা হেতু শিবভাগবতরা যে দণ্ডাজিনিকও (দণ্ডধারী ও পশু-চর্ম পরিধানকারী) ছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন, লৌহত্রিশূল ও দণ্ডধারণ প্রভৃতি ক্রিয়া শিবভাগবতেরা তাঁহাদের একান্তিকা শিবভক্তির বাহ্য রূপ বলিয়া বিবেচনা করিলেও সকলে যে তাঁহাদের এই সব ক্রিয়া সুচক্ষে দেখিতেন না ইহার সাহিত্যগত প্রমাণ বর্তমান। পতঞ্জলি নিজেই ইহার অনুমোদন করিতেন না, কারণ তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই জাতীয় শিবভক্তদিগের দল যে সিদ্ধি শান্ত প্রক্রিয়ার দ্বারা অন্বেষণ করা যায়, তাহা উগ্র বেগশীল অনুষ্ঠানের সাহায্যে পাইতে ইচ্ছা করেন (যো মৃদুনোপায়েনান্বেষ্টব্যানর্থান্ রভসেনান্বিচ্ছতি)। প্রখ্যাত বৈয়া-করণিক অতি অল্প কথায় শিবভাগবতদিগের বাহ্য ধর্মাচরণের রূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া উহার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। এখানে পাণিনির পূর্ববর্তী সূত্র, 'পার্শ্বেনান্বিচ্ছতি' (৫, ২, ৭৫) র ভাষ্যকালে রাজপুরুষ-দিগের উপর তাঁহার কটাক্ষপাতের কথা বলা যাইতে পারে। তিনি রাজপুরুষগণকে 'পার্শ্বক' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন এবং ইঙ্গিত করিয়াছেন যে 'ইঁহারা সোজা উপায়ে যে কাজ পাওয়া যায়, তাহা

বাঁকা পথ অবলম্বন করিয়া পাইতে ইচ্ছা করেন, এবং এজন্য তাঁহাদিগকে পার্শ্বক বলা হয়' (যো ঋজুনোপায়েনান্বেষ্টব্যানর্থান অনৃজুনোপায়েনান্বিচ্ছতি স উচ্যতে পার্শ্বকঃ)। এই শিবভাগবতগণই কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে পাশুপত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ; পাশুপতদিগের ধর্মাচরণ প্রণালী যে কিরূপ উগ্রবেগশীল ছিল তাহা আলোচনাকালে প্রদর্শিত হইবে। পতঞ্জলিপ্রমুখ সামাজিক ব্যক্তিগণ তাহাদিগের উগ্র পন্থার বিরোধী ছিলেন, এবং এজন্যই পতঞ্জলির পরবর্তী ভাষ্যকারেরা 'দণ্ডাজিনিক' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'দাম্ভিক'। সে যাহাই হউক, মহাভাষ্যোক্ত শিবভাগবতদিগের বর্ণনার সহিত বৈদেশিক লেখকগণ প্রদত্ত শিবিদিগের বর্ণনার আশ্চর্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

শিবভাগবত প্রসঙ্গে ও অন্যত্র পাশুপতদিগের কথা বলা হইয়াছে। এই পাশুপত যে এক ধর্মসম্প্রদায় তাহার অন্যতম পরোক্ষ পরিচয় আমরা মহাভারত হইতে পাই। শান্তিপর্বস্থ নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে সাংখ্য, যোগ, পাঞ্চরাত্র, বেদ এবং পাশুপত এই পঞ্চবিধ জ্ঞান ও ধর্ম মতের তালিকা দেওয়া আছে। সাংখ্যের বক্তা পরমর্ষি কপিল, যোগের ব্যাখ্যাতা হিরণ্যগর্ভ, বেদের আচার্য অপান্তরতমা—তাঁহাকে কেহ কেহ প্রাচীনগর্ভ ঋষি নামে অভিহিত করেন, সমস্ত পাঞ্চরাত্র মত স্বয় ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) সকলকে জানাইয়াছেন, এবং ব্রহ্মার পুত্র উমাপতি ভূতনাথ শ্রীকণ্ঠ শিবই স্থিরচিত্তে পাশুপত জ্ঞান প্রচার করিয়াছিলেন (উমাপতির্ভূতপতি শ্রীকণ্ঠঃ ব্রহ্মণঃ সুতঃ। উক্তবানিদমব্যগ্রো জ্ঞানং পাশুপতং শিবঃ॥ শান্তিপর্ব, অধ্যায় ৩৪৯, ৬৪-৮)। মহাভারতে পাশুপত জ্ঞান বা মতবাদের বক্তা বলিয়া বর্ণিত ব্রহ্মাপুত্র শিব-শ্রীকণ্ঠের ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের সংশয় যৌক্তিকতাপূর্ণ। কিন্তু বায়ু, কূর্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় পুরাণ এবং কয়েকটি প্রাচীন লেখ হইতে পাশুপতশাস্ত্রের প্রবর্তক যে একজন ঐতিহাসিক পুরুষ ছিলেন ইহা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এ বিষয়ে প্রাথমিক অনুসন্ধান আরম্ভ করেন তাঁহার পুত্র স্বর্গীয় দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর। পুরাণ কয়টি হইতে এই ঐতিহাসিক ব্যক্তি সম্বন্ধে যে তথ্যাদি সঙ্কলিত হয় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ— যদুবংশাবতংস বাসুদেব-কৃষ্ণ যখন ভারতে আবির্ভূত হন, তখন ভগবান মহেশ্বর শ্মশানে পরিত্যক্ত এক মৃতদেহে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মচারী লকুলীশ রূপে অবতীর্ণ হন। কায়াবতার, কায়াবরোহণ বা কায়ারোহণ ছিল এই অলৌকিক ঘটনাস্থল (ইহা যে কাথিয়াবাড় প্রদেশের বর্তমান কার্বান গ্রাম এ বিষয়ে সকলে একমত)। ইহাব প্রধান চারিজন শিষ্যের নাম ছিল কুশিক, মিত্র, গর্গ এবং কৌরুষ্য। ইঁহারা শরীরে ভস্মলেপন করিতেন, এবং মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া দেহান্তে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজপুতানা প্রদেশের উদয়পুর সন্নিকটস্থ একলিঙ্গজী মন্দিরের একটি শিলালেখ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে ভৃগুকচ্ছ দেশে (পশ্চিম ভারতের আধুনিক ব্রোচ নগরীর পার্শ্ববর্তী স্থান) ভৃগু ঋষি কর্তৃক তুষ্ট হইয়া শিব লগুড়হস্ত এক ব্রহ্মচারী রূপে অবতীর্ণ হন ও পাশুপত যোগ প্রবর্তন করেন। ভস্মাচ্ছাদিত দেহ, জটিল, বল্কলপরিহিত তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য উক্ত চারিজনের নামও ইহাতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের আব একটি লেখ (সিন্ত্রা প্রশস্তি নামে পরিচিত) হইতেও এতদ্ব্যতীত আরও জানা যায় যে লকুলীশের পাশুপত যোগাশ্রিত এই চাবিজন শিষ্যের প্রত্যেকে এক একটি শাখা সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহের সঙ্কলয়িতা মাধবাচার্য মূল পাশুপত ধর্মমত ও সম্প্রদায়কে নকুলীশ পাশুপত আখ্যা দিয়াছেন; বলা বাহুল্য যে ইহা লকুলীশ পাশুপতেরই নামান্তব। এই সমস্ত তথ্যাদি বিচার করিয়া রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশ পশ্চিম ভারতের এক অংশে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের আগের দিকে আবির্ভূত হইয়া পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন, এবং এই ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত

শৈবেরাই পতঞ্জলির মহাভাষ্যে শিবভাগবত নামে বর্ণিত হইয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ভাণ্ডারকব কর্তৃক লকুলীশকে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপন করিবার মূলে ছিল মহাভাষ্যোক্ত শিবভাগবতদিগের আদিপুরুষ বলিয়া লকুলীশকে স্বীকার করিবার প্রচেষ্টা।

ভাণ্ডারকরের উক্তরূপ প্রচেষ্টা পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেব রাজত্বকালে ৬১ গৌপ্তাব্দের (৩৮০-৮১ খৃষ্টাব্দের) নাতিবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভে খোদিত একটি শিলালিপি কিছুদিন পূর্বে মথুরায় পাওয়া গিয়াছিল। এই শিলালিপি দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদনা করিয়া 'এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা'র একবিংশতিতম সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন (*Ep. Ind.*, Vol. XXI, pp. 1-9)। ইহার বিষয়বস্তু লকুলীশের আবির্ভাবকাল এবং লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায় সংক্রান্ত আরও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে আলোকপাত করে। ইহা এইরূপ—আর্য উদিত নামে একজন মাহেশ্বর (পাশুপতের আর এক নাম) আচার্য গুর্বায়তনে (গুরুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মন্দিরে) তাঁহার গুরু উপমিত ও তাঁহাব গুরুর গুরু কপিলাচার্যের নামে উপমিতেশ্বর ও কপিলেশ্বব বলিয়া আখ্যাত দুইটি শিবলিঙ্গ ৬১ গৌপ্তাব্দে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেখটিতে উদিতাচার্য গুরু-পরম্পরা ক্রমে কুশিক হইতে দশম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এই কুশিক এবং লকুলীশের অন্যতম প্রধান শিষ্য কুশিক যে একই ব্যক্তি দেবদত্ত ভাণ্ডারকরের এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে আর্য উদিত লকুলীশ হইতে অধস্তন একাদশ আচার্য ; তাঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষ পাদে হইলে, সম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য লকুলীশের আবির্ভাবকাল (এক পুরুষের স্থিতিকাল ২৫ বৎসর হিসাবে গণনা করিয়া) খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদের প্রথম

দিকে ফেলিতে হইবে। এ মীমাংসা যুক্তিপূর্ণ ; ইহা মানিয়া লইলে পাশুপতাচার্য লকুলীশকে মহাভাষ্যোক্ত শিবভাগবতগণের আদিপুরুষ বলিয়া কিছুতেই স্বীকার করা যায় না, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি মহাভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। লকুলীশ হইতে আদি শৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই ইহা স্বীকৃত হইলে, ইহার উৎপত্তির স্থান, কাল ও পাত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না। কিন্তু ইহার উৎপত্তি যে খৃষ্টপূব দ্বিতীয় শতাব্দীর বহু আগে হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। পাণিনি লিখিত শৈবেরা এই সম্প্রদায়ের অন্যতম আদিপুরুষ হইলেও হইতে পারেন। পতঞ্জলি আয়ঃশূলিক ও দাণ্ডাজিনিক শিবভাগবতদিগের ধর্মাচরণ সম্বন্ধে যে প্রচ্ছন্ন কটাক্ষপাত করিয়াছেন, অনুরূপ আচরণ আমরা যেমন পরবর্তী কালের লকুলীশ-পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত শৈবদিগের দ্বারা আচরিত ধর্মবিধির (ইহার কথা একটু পরে বলিতেছি) মধ্যে দেখিতে পাই, তেমন মহাবীর ও বুদ্ধের সমকালীন এক সম্প্রদায়ের এবং উহার অন্যতম প্রধান পুরুষের ঐরূপ সাদৃশ্যসূচক ব্যবহারিক অনুষ্ঠানে পাই।

উপরিলিখিত সম্প্রদায়ের নাম ছিল আজীবিক এবং ইহার অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন মস্করী বা মঙ্খলী পুত্র গোসাল। ইনি মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন ; প্রাচীন জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ইনি ও ইঁহার সম্প্রদায় জৈন ও বৌদ্ধদিগের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত হইয়াছিলেন। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত মনে করিতেন যে আজীবিক সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। জৈন ভগবতীসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে মস্করী গোসাল এক সময়ে বর্ধমান মহাবীরের সহিত মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মহাবীর অল্প কিছুদিন তাঁহাকে সহ্য করিলেও, পরে প্রত্যাখ্যান করেন। মস্করী গোসালের সম্প্রদায়ের দুইজন পূর্বাচার্য ছিলেন নন্দবচ্ছ ও কিসসংকিচ্ছ, এবং

ইঁহারা সকলে দণ্ডধারী পরিব্রাজক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। পাণিনি একটি সূত্রে এক শ্রেণীর ভিক্ষু পরিব্রাজকের কথা বলিয়াছেন ; ইঁহারা বংশদণ্ড ধারণ করিয়া যথেচ্ছ ঘুরিয়া বেড়াইতেন (৬, ১, ১৫৪—মস্করমস্করিণৌ বেণুপরিব্রাজকয়োঃ)। এই সূত্রের ভাষ্যকালে পতঞ্জলি বলিয়াছেন যে বংশদণ্ডধারী ভিক্ষু পরিব্রাজকগণ সর্বদা বলিয়া থাকেন যে, 'হে মানবগণ, তোমাদের বিশেষ কোনও কাজ করিবার নাই, কারণ শান্তিই তোমাদের সর্বপ্রধান কাম্য' (মা কৃত কর্মাণি মা কৃত কর্মাণি শান্তির্বঃ শ্রেয়সীত্যাহাতো মস্করী পরিব্রাজকঃ)। পণ্ডিতেরা এই মস্করী পরিব্রাজকগণ এবং আজীবিকরা যে অভিন্ন ইহা স্বীকার করেন। কার্ন এবং ব্যুহ্লার এক সময়ে মনে কবিতেন যে আজীবিকগণ 'নারায়ণ-পূজক' ছিলেন। কিন্তু দেবদত্ত ভাণ্ডারকবের মতে এ মীমাংসা ভ্রান্ত। ভাণ্ডারকর ১৯১২ খৃষ্টাব্দের Indian Antiquary পত্রিকার এক সংখ্যায় আজীবিকদিগের সম্বন্ধে যে একটি অতি তথ্যবহুল প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহা পাঠে আমার মনে হয় যে ইঁহারা আদিতে এক শ্রেণীব শিবপূজক ছিলেন। তাঁহাদের আচরিত ধর্মানুষ্ঠানগুলির মধ্যে এই সকলের নাম করা যাইতে পারে ;—তাঁহারা গাত্রে ভস্ম লেপন কবিতেন, বৎসতরীর মল ভক্ষণ করিতেন, কষ্টকর আসনে উপবেশন করিতেন, কণ্টকশয্যায় শয়ন কবিতেন ইত্যাদি। বৌদ্ধগ্রন্থ মজঝিম নিকায়স্থ তেবিজ্জবচ্ছগোত্তসূত্তে আজীবিকদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, তাঁহারা নানাবিধ কষ্টসাধ্য তপশ্চর্যা অভ্যাস করিতেন। বুদ্ধঘোষ তাঁহার সামন্তপাসাদিকা গ্রন্থে বোধ হয় আজীবিকদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণজাতীয় পাষণ্ড পরিব্রাজকেরা গাত্রে ভস্মলেপনাদি ধর্মানুষ্ঠান করিতেন। এই আচরণসমূহের সহিত লকুলীশ পাশুপতদিগের অনুষ্ঠানগুলির আশ্চর্য মিল দেখা যায়। জৈন ভগবতীসূত্রে কথিত আছে যে মস্করী গোসাল তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে যখন কুম্ভকাব গৃহিণী হালাহলার গৃহে অতিথি রূপে বাস করিতেছিলেন,

তখন তিনি এরূপ সব অদ্ভুত আচরণ করিয়াছিলেন যেগুলি সুস্থমস্তিষ্ক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। মস্করী গোসাল উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতেন, পানাসক্ত হইতেন, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, হালাহলাকে উদ্দেশ করিয়া শৃঙ্গাররসাত্মক অঙ্গভঙ্গী করিতেন ইত্যাদি। জৈন লেখক মন্তব্য করিয়াছেন যে গোসাল জ্বরবিকারের ঘোরে এইরূপ করিয়াছিলেন, এবং এই জ্বরবিকারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। পাশুপতবিধিব সহিত উপরিলিখিত আচরণগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। সব দিক বিবেচনা করিয়া ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হয় না যে মস্করী গোসাল মৃত্যুর পূর্বে পাশুপত বা অনুরূপ কোনও বিধির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন —যে বিধি একশ্রেণীর আজীবিকগণ তাঁহাদের ধর্মসাধনের অন্যতম অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

উপরে উদ্ধৃত নানাপ্রকার তথ্য একত্র আলোচনা করিলে যে মীমাংসায় উপনীত হওয়া যায় তাহা সংক্ষেপে এইরূপ। মহাদেবের অষ্টাবিংশতিতম ও শেষ অবতার বলিয়া পুরাণাদিতে বর্ণিত লকুলীশ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে কাথিয়াবাড় অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়া পূর্বপ্রচলিত শৈব-পাশুপত ধর্মের পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবন করিয়াছিলেন। পাশুপত ধর্ম সংগঠনে তাঁহার অংশ ও অবদান এত অধিক ছিল যে পরবর্তী কালে এই ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের নামের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত হইয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে ইহাকে নকুলীশ (লকুলীশ)-পাশুপত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। লকুলীশ প্রণীত গ্রন্থের নামও তিনি করিয়াছেন— ইহার নাম ছিল পঞ্চার্থবিদ্যা; এই গ্রন্থ হইতে একটি শ্লোকও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শৈব-পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব খুব সম্ভব পূর্ব ভারতে বুদ্ধ মহাবীরেরও পূর্ববর্তী কালে হয়, এবং ক্রমশঃ তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে বিস্তৃত হয়। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে বসব যেরূপ প্রধান অংশ

গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পূর্বে শৈব-পাশুপত ধর্মসম্প্রদায়ের পুনর্গঠনে লকুলীশও তদনুরূপ বা উহা অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। বসব ছিলেন এক রাজপুরুষ, কিন্তু লকুলীশ সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহাতে মনে হয় রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া তিনি ধর্মসংস্কারেই মন দিয়াছিলেন। পাশুপত ধর্মমতের মূলতত্ত্ব সম্বলিত একটি সুপ্রাচীন গ্রন্থের নাম পাশুপত সূত্র[1]। ইহার রচয়িতা কে তাহা সঠিক জানা নাই, তবে লকুলীশ বা তাঁহার পূর্ববর্তী কোনও শিবভাগবত ইহা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। গুপ্তযুগে রাশীকর কৌণ্ডিন্য নামে এক পাশুপতাচার্য ইহার একটি বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়া যান। পাশুপতসূত্র পঞ্চ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ইহাতে পাশুপত ধর্মতত্ত্বসমূহ সূত্রের আকারে সন্নিবদ্ধ আছে। ইহা ও কৌণ্ডিন্য বিরচিত ইহার ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই পণ্ডিত মাধবাচার্য বহু পরবর্তী কালে তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে অল্প কয় পৃষ্ঠায় এই ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিয়া যান। মাধব খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর লোক হইলেও তাঁহার ব্যাখ্যাত পাশুমত মতগুলির সহিত পাশুপতসূত্রে এবং কৌণ্ডিন্যভাষ্যে বর্ণিত ধর্মতত্ত্বগুলির পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। মাধবপ্রদত্ত বিবরণের একটি সুবিধা এই যে ইহা সংক্ষেপে অথচ সুবিন্যস্তভাবে পাশুপত ধর্মদর্শনের পরিচয় দেয়। ইহার বিষয়গুলি মোটামুটি এইরূপ—ধর্মতত্ত্ব পঞ্চ-বিভাগে বিভক্ত; যথা কার্য, কারণ, যোগ, বিধি ও দুঃখান্ত। কার্য তিন প্রকার; যথা বিদ্যা, কলা এবং পশু। পশুই জীব বা জীবাত্মা; বিদ্যা ইহারই গুণস্বরূপ এবং কলাসমূহও পশুকে আশ্রয় করে। সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের[2] শেষেরটিকে বাদ দিলে যে ২৩টি তত্ত্ব

১ রাশীকর কৌণ্ডিন্যভাষ্য সমেত এই গ্রন্থ ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আর. অনন্ত-কৃষ্ণ শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহা ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত গ্রন্থমালার ১৪৩ সংখ্যক গ্রন্থ।

২ পঞ্চ মহাভূত (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম), পঞ্চ তন্মাত্র

অবশিষ্ট থাকে, উহার প্রথম দশটি কার্যরূপী, এবং শেষের ত্রয়োদশটি কারণরূপী কলা। পশু বা জীব যতদিন এই কলাসমূহের অবলম্বন হইয়া দেহের সহিত যুক্ত থাকে ততদিন ইহা অবিশুদ্ধ, এবং যখন ক্রমে ক্রমে এই সকল বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, তখন ইহা শুদ্ধ পর্যায়ে উন্নীত হয়। কারণতত্ত্ব নানাভাবে কল্পিত, এবং ইহা সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্তা একমাত্র ঈশ্বরকেই বুঝায়। তিনি সর্বশক্তিমান ও সর্বক্রিয়াশীল, সাদ্য এবং পতি। যোগতত্ত্ব বুদ্ধি ও চিন্তন সহযোগে পতির সহিত পশুর মিলনপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়াই কল্পিত হইয়াছে। এই মিলনপ্রচেষ্টা দুই প্রকারের ; মন্ত্র জপ, ধ্যানাদি ক্রিয়ার দ্বারা জীব যে ঈশ্বরের সহিত যোগ সাধন করেন ইহা একপ্রকার, অপরটি এরূপ কোনও বাহ্য চেষ্টাসাপেক্ষ নহে, উহা ক্রিয়াবিরতিমূলক এবং ঈশ্বর-সহ মিলন সম্বন্ধীয় এক স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞান হইতে উদ্ভূত। এই ক্রিয়া-নিরপেক্ষ যোগ উন্নততর এ বিষয়ে সন্দেহ নাই, তবে পশুর যোগের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ে উপনীত হইতে হইলে প্রস্তুতির আবশ্যক। এই পূর্ব-প্রস্তুতিই অবশেষে তাহার চেতন ও অবচেতন সত্তাকে পতির সহিত মিলন বিষয়ে সম্বুদ্ধ করে, এবং তাহার তৎকালীন মনোভাবকে বলা হয় সম্বিদ্।

পাশুপত মতের চতুর্থ তত্ত্ব বিধি ; ইহা পশুর পুণ্য ও উৎকর্ষ সম্পাদনকারী ধর্মাচরণ প্রণালী। মুখ্য বিধিগুলির অপর নাম চর্যা ; চর্যা 'ব্রত' ও 'দ্বার' নামক দুই ভাগে বিভক্ত। ভস্মস্নান অর্থাৎ সমস্ত শরীরে ত্রিসন্ধ্যা ভস্মানুলেপন, ভস্মে শয়ন, (অহেতুকী) হাস্য, গীত, নৃত্য, হুড়ুক্কার শব্দকরণ (জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে বৃষভাদি পশুর

(শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্), পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), তিনটি জীবমধ্যস্থ ইন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধি ও অহংকার বা অহংজ্ঞান) এবং পরিদৃশ্যমান সমষ্টিগত জগৎ।

ন্যায় অস্ফুট ধ্বনি), সাষ্টাঙ্গ নমস্কার, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতি ক্রিয়াই পাশুপত ব্রতের অন্যতম অঙ্গ। 'দ্বার', অর্থাৎ অন্য যে সব ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে ধর্মের প্রবেশপথ উন্মুক্ত হয়, ছয় প্রকার ; যথা ক্রাথন (জাগরূক অবস্থায় নিদ্রিত থাকার ভাণ), স্পন্দন (পক্ষাঘাত-গ্রস্ত রোগীর ন্যায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কম্পন), মণ্ডন (ভ্রমণকালে পদদ্বয় ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিক্ষেপ), শৃঙ্গারণ (সুন্দরী যুবতী দর্শনে আদিরসাত্মক ভাব প্রকাশ), অবিতত্‌করণ (অসামাজিক, নিন্দার্হ উন্মত্তবৎ আচরণ) এবং অবিতদ্ভাষণ (অর্থহীন প্রলাপ উচ্চারণ)। চর্যার গৌণ উপায়গুলিও প্রায় সমপর্যায়ের, যেমন শিবলিঙ্গ পূজাশেষে দেহে ভস্মলেপন ও দেবতার প্রতি উৎসর্গীকৃত পুষ্প, পত্র ও মাল্যাদি অঙ্গে ধারণ, অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন ইত্যাদি। পাশুপত সূত্রে উপরোক্ত বিধিগুলি নানাভাবে বর্ণিত আছে।[১] এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের দুইটি (ষষ্ঠ ও অষ্টম) শ্লোক এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ শ্লোকটি এইরূপ—উন্মত্তবদেকো বিচরেত লোকে, অর্থাৎ 'লোকসমাজে পাশুপত ব্রতধারী উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিবেন'। অষ্টম শ্লোকে বলা হইতেছে—উন্মত্তো মূঢ় ইত্যেবং মন্যন্তে ইতরে জনাঃ, অর্থাৎ 'সাধারণ (সামাজিক) লোক তাঁহাকে উন্মত্ত ও মূর্খ বলিয়া মনে করিবে'। ভাষ্যকার কৌণ্ডিন্য এ প্রসঙ্গে এই ক্রিয়াগুলিকে 'ব্রাহ্মণকর্মবিরুদ্ধ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (অব্যক্তপ্রেতোন্মত্তাদ্যং ব্রাহ্মণকর্মবিরুদ্ধং ক্রমং)। এই সকল আপাত-দৃষ্টিতে অদ্ভুত বিধিসমূহের অন্ততঃ কিয়দংশ বোধ হয় প্রাচীন আজীবিক ও শিবভাগবত সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অঙ্গ ছিল। শেষোক্ত সম্প্রদায়

১ ভস্মনা ত্রিষবণং স্নায়ীত (১, ২) ; ভস্মনি শয়ীত (১, ৩) ; হসিত-গীতনৃত্যহুড্ডুক্কার নমস্কার জপ্যোপহারেণোপতিষ্ঠেৎ (১, ৮) ; প্রেতবচ্চরেৎ (৩, ১১ ভাষ্য—উন্মত্তসদৃশদরিদ্রপুরুষস্নাতমলদিগ্ধাঙ্গেন রূঢ়শ্মশ্রুনখরোপধারিণা সর্বসংস্কারবর্জিতেন ভবিতব্যম্) ; ক্রাথেত বা স্পন্দেত বা মণ্ডেত বা শৃঙ্গারেত বা অবিতৎকুর্যাৎ অবিতদ্ভাষেত (৩, ১২-৭), ইত্যাদি।

সম্বন্ধে পতঞ্জলির কটাক্ষপাতের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। বৃহৎসংহিতার দেবপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে যে 'সভস্ম দ্বিজগণ' নিজ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে শম্ভুর মূর্তি অর্থাৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবেন। ভট্ট উৎপল ইহার ভাষ্যকালে বলিতেছেন যে সভস্ম দ্বিজের অর্থ পাশুপত, এবং পাশুপতদিগের শাস্ত্রের নাম বাতুলতন্ত্র (বৃহৎ-সংহিতা, সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ, ৫৯তম অধ্যায়, উনবিংশ শ্লোকের ব্যাখ্যা)। পণ্ডিত দ্বিবেদী উৎপলের বাতুলতন্ত্র যে ঠিক কোন শাস্ত্র সে বিষয়ে সন্দেহশীল ছিলেন। কিন্তু পাশুপতসূত্র, সর্বদর্শনসংগ্রহাদি গ্রন্থে প্রদত্ত পাশুপত বিধির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইল উহা হইতে মনে হয় পাশুপতসূত্র-জাতীয় গ্রন্থাদিই উৎপল নির্দিষ্ট বাতুলতন্ত্র।

পাশুপত ধর্মতত্ত্বের পঞ্চম তত্ত্ব দুঃখান্ত। মানুষের জীবন যে দুঃখময় ইহা বেদান্ত, বৌদ্ধ ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া উক্ত হইয়াছে। উপনিষদের মহাবাক্য, 'অতোঽন্যৎ আর্তম', বুঝায় যে ব্রহ্ম ব্যতীত সব কিছুই দুঃখপূর্ণ, এবং বুদ্ধ প্রচারিত চারিটি আর্য সত্যের মধ্যে দুঃখ অন্যতম। পাশুপতদিগের লক্ষ্য একদিকে যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগ, তেমন অন্যদিকে ঈশ্বরের প্রসাদে সর্বদুঃখের অন্ত। সূত্রকার বলিতেছেন অপ্রমাদী গচ্ছেৎ দুঃখানামন্তম্ ঈশপ্রসাদাৎ (৪, ৪৯)। রাশীকর কৌণ্ডিন্য তাঁহার ভাষ্যে বলেন যে দুঃখ নানাবিধ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক এবং আধিভৌতিক। তন্মধ্যে মানস দুঃখ ক্রোধ, লোভ, ভয়, বিবাদ, ঈর্ষা, অসূয়াদি সঞ্জাত এবং শারীর দুঃখ শরীর সংক্রান্ত ব্যাধিপুঞ্জ হইতে উদ্ভূত। এই দুঃখতালিকা আধ্যাত্মিক পর্যায়ভুক্ত। আধিভৌতিক দুঃখ পাঁচ প্রকার—গর্ভে বাস, জন্মগ্রহণ, অজ্ঞান, জরা ও মরণ। আধিদৈবিক দুঃখও পাঁচ প্রকার—যথা ইহলোকভয়, পরলোকভয়, অহিতসংপ্রয়োগ, হিতবিপ্রয়োগ ও ইচ্ছাব্যাঘাত। এই সমস্ত দুঃখের হাত হইতে ঈশ্বরের প্রসাদে পাশুপত ব্রতচারী মুক্ত হন,

এবং তাঁহার দুঃখের শেষ হয়। ইহাই পাশুপত সাধকের অনাত্মক মোক্ষ। কিন্তু ইহাই তাঁহার একমাত্র কাম্য নহে। তাঁহার মোক্ষ-চিন্তা সাত্মকও বটে, কারণ দুঃখশেষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নানাপ্রকার অপ্রাকৃত শক্তির ও ঐশ্বর্যের অভিলাষী। সূত্রকার বলেন যে পাশুপত যোগী পঞ্চরূপ অলৌকিক জ্ঞান এবং তিন প্রকার ঐশী ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হইবেন। পাঁচটি জ্ঞানের স্বরূপ হইল দূরদর্শন, শ্রবণ, মনন; বিজ্ঞান ও সর্বজ্ঞত্ব, এবং তিনটি ক্রিয়াশক্তি হইল মনোজবিত্ব, কামরূপিত্ব ও বিকরণধর্মিত্ব।[১] এ ক্ষেত্রে দূরদর্শনের অর্থ আণবিক, গুপ্ত ও অতিদূরস্থ বস্তুসমূহ দর্শন ও স্পর্শ করিবার শক্তি; শ্রবণেব অর্থ যাবতীয় শব্দ শ্রবণ করিবার অপার্থিব ক্ষমতা; মনন অর্থাৎ চিন্তাযোগ্য যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে আশ্চর্য প্রকার জ্ঞান; বিজ্ঞানের অর্থ সর্ব বিজ্ঞানশাস্ত্র বিষয়ক অত্যাশ্চর্য বিশেষ জ্ঞান; এবং সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ লিখিত অলিখিত, চিন্তিত অচিন্তিত ও এমন কি অকথিত সম্ভাব্য সর্বপ্রকার শাস্ত্রের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে অলৌকিক এবং অশেষ পারদর্শিতা। মনোজবিত্ব ক্রিয়াশক্তির অধিকাবীর মনে যে কার্য করিবার ইচ্ছা হইবে তিনি অবিলম্বে সেই কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন। দ্বিতীয় ক্রিয়াশক্তির সাহায্যে সিদ্ধযোগী বিনায়াসে যাদৃচ্ছ রূপ ও আকৃতি গ্রহণে সমর্থ হইবেন। তৃতীয় ক্রিয়াশক্তির অধিকারী ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া রুদ্ধ অবস্থাতেও প্রভূত অপ্রাকৃত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের আধার থাকিবেন। সূত্রকার প্রথম অধ্যায়ের শেষ কয়টি সূত্রে যোগীর আরও সব অলৌকিক শক্তির কথা বলিয়াছেন।[২] এই সমস্ত অলৌকিক শক্তি সিদ্ধ পাশুপত

১ পাশুপতসূত্র, ১, ২১-৬, দূরদর্শনশ্রবণমননবিজ্ঞানানি চাস্য প্রবর্তন্তে। সর্বজ্ঞতা। মনোজবিত্বম্। কামরূপিত্বম্। বিকরণঃ ধর্মিত্বম্।

২ সর্বে চাস্য বশ্যা ভবন্তি (২৭); সর্বে চাস্য বধ্যা ভবন্তি (৩১); সর্বেষাং চাবধ্যো ভবতি (৩২); অভীতঃ (৩৩); অক্ষয়ঃ (৩৪); অজরঃ (৩৫); অমরঃ (৩৬) সর্বত্র চাপ্রতিহতগতির্ভবতি (৩৭)।

যোগীর হস্তামলকবৎ সহজে করায়ত্ত হইবে। উপরিলিখিত যাবতীয় ক্ষমতা ও গুণের অধিকারী হইয়া তিনি ভগবান মহাদেবের মহা-গণপতিত্ব প্রাপ্ত হইবেন।[১] রাশীকর কৌণ্ডিন্যের মতে পাশুপত-তন্ত্র যোগনিষ্ঠ, এবং উপরিলিখিত অলৌকিক শক্তিসমূহ রঙীন পতাকা দ্বারা যেমন প্রাণীগণকে প্রলুব্ধ করা যায় তেমন তন্ত্রাভিলাষীর প্রলোভন স্বরূপই যেন ঐ সকল শক্তি অর্জনের কথা বলা হইয়াছে (রঙ্গ-পতাকাদিবচ্ছিষ্যপ্রলোভনার্থমিদম্—পৃ. ৪২)।

পাশুপত সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও দর্শন সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপরে দেওয়া হইল, তাহা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহা রুদ্র-শিবের ঘোর রূপের সহিত অনেকাংশে সংশ্লিষ্ট। এই পন্থা অতি-মার্গিক অর্থাৎ ইহা সহজসাধ্য সামাজিক পথ হইতে বহুলাংশে পৃথক্ এবং বোধ হয় এই অনুরূপ পথকেই পতঞ্জলি রভসাশ্রিত উপায় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা বলা যাইতে পারে যে শৈব সম্প্রদায়দিগের মধ্যে পাশুপত (পরে নকুলীশ পাশুপত আখ্যায় অভিহিত) সম্প্রদায়ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। অপর কয়টি অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন অতিমার্গিক শৈব সম্প্রদায়ের নাম এইরূপ—কাপালিক, কালামুখ, অঘোরপন্থী ইত্যাদি। এগুলির অসামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও অত্যুগ্র ধর্মাচরণ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলে মনে হয় যে ইহাদের উৎপত্তি পাশুপত মত ও সম্প্রদায় হইতেই হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য প্রণীত গ্রন্থাদির ভাষ্যকারগণ বলিয়াছেন যে পাশুপত ও শৈব (আগমান্ত ও শুদ্ধ) সম্প্রদায় ব্যতীত অপর দুটি সম্প্রদায়ের নাম ছিল কারুকসিদ্ধান্তিন এবং কাপালিক। বাচস্পতি শেষেরটিকে কারুণিকসিদ্ধান্তিন আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ এবং কেশব কাশ্মীরিন ইহার নাম দিয়াছেন কালামুখ।

---

১ ইত্যেতৈর্গুণৈর্যুক্তো ভগবতো মহাদেবস্য মহাগণপতির্ভবতি। পাশুপতসূত্র, প্রথম অধ্যায়, সূত্র ৩৮।

আর. জি. ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে লকুলীশের চতুর্থ শিষ্যের নাম কৌরুষ্য কারুক নামের সংস্কৃত প্রতিরূপ। তিনি ইহার অধিক আর কিছু বলেন নাই, তবে ইহা হইতে মনে হয় যে কৌরুষ্যই হয়ত কালামুখ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা না যাইলেও ইহা মনে রাখিতে হইবে যে লকুলীশের প্রধান চারিজন শিষ্যের প্রত্যেকেই এক একটি শাখা সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া শৈবদিগের বিশ্বাস, এবং তাঁহার তুইজন শিষ্যের কাপালিক ও কালামুখ রূপ তুই উগ্রপন্থী অতিমার্গিক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হওয়া অসম্ভব নহে।

রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যে (২, ২, ৩৫-৬) বলিয়াছেন যে কাপালিকদিগের মতে ছয়টি মুদ্রা বা মুদ্রিকার নাম কণ্ঠহার, অলঙ্কার, কুণ্ডল, শিরোমণি, ভস্ম ও যজ্ঞোপবীত, এবং এই মুদ্রিকাগুলি শরীরে ধারণ করিয়া যিনি যোনিতে অধিষ্ঠিত পরমাত্মাকে (শিবলিঙ্গের অন্যরূপ বর্ণনা) নিজ চিত্ত নিবিষ্ট করিবেন তিনি শ্রেষ্ঠ আনন্দের অধিকারী হইবেন এবং তাঁহার আর পুনর্জন্ম হইবে না। কৃষ্ণ মিশ্র তাঁহার বিখ্যাত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে একটি কাপালিক চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রন্থকার ইহার মুখে তাহার আত্মপরিচয় এইভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন—'আমার কণ্ঠহার ও অন্যান্য অলঙ্কার মানুষের অস্থি হইতে নির্মিত ; ......উপবাসের পর আমরা ব্রহ্মকপাল (ব্রাহ্মণ শবের মস্তক করোটি) হইতে সুরা পান করিয়া পারণ করি ; আমাদের হোমাগ্নি নরমাংস, কপাল, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির দ্বারা প্রজ্বলিত থাকে ; আমরা নরবলি ও নররক্তের দ্বারা আমাদের ঘোর ও উগ্র দেবতার তুষ্টি বিধান করি ; আমি স্রষ্টা, পাতা ও সংহারকর্তা, সর্বশক্তিমান ভবানীপতির ধ্যান করি।' কৃষ্ণ মিশ্রের আর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : তিনি বলিয়াছেন যে কাপালিকাদি উগ্রপন্থিগণ অন্য সব দেশ ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ আভীর ও মালব প্রদেশেই একত্রে বাস

করিতে আরম্ভ করিয়াছে; এই প্রদেশদুটিতে সাধারণতঃ নীচ পামর জাতি বাস করিয়া থাকে। অপর উগ্রপন্থী শৈব কালামুখদিগের মতে ইহ ও পরকালে শ্রেষ্ঠ সুখ অর্জন করিতে হইলে তন্ত্রাভিলাষী নিম্নলিখিত বিধিসকল পালন করিবেন—নরকপাল হইতে খাদ্যগ্রহণ, মৃতদেহের ভস্ম সর্বাঙ্গে অনুলেপন, ভস্ম আহার, দণ্ড ধারণ, এক পাত্র কারণ (মদ্য) সঙ্গে রাখিয়া উহাতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকে পূজা সমর্পণ। ঘোরতান্ত্রিক কাপালিক-কালামুখগণের নিকট জাতিভেদের তীব্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, যে কোনও জাতির ব্যক্তি ইঁহাদের ব্রতে দীক্ষিত হইলে (এই ব্রতের নাম ছিল মহাব্রত) ব্রাহ্মণ পর্যায়ে উন্নীত হইতেন। মাধব বিরচিত শঙ্করদিগ্বিজয় কাব্যে উজ্জয়িনী নগরে শঙ্করাচার্যের সহিত কাপালিক গুরুর তর্ক বিচার ও উহার পরাজয়ের বিষয় বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে (১৫, ১-২৮)। কাপালিক গুরু ক্রকচ ভৈরবের উপাসক ছিলেন ও তাঁহার দেবতাকে করধৃত সুরাপাত্রে আহ্বান ও উজ্জীবিত করিয়া শঙ্করাচার্যের বিনাশ সাধন করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু যেহেতু শঙ্কর শিবেরই অংশস্বরূপ ছিলেন, ভৈরব তাঁহার নিধন না করিয়া ক্রকচকেই বিনাশ করিলেন। ভবভূতি রচিত মালতীমাধব গ্রন্থে অন্ধ্রদেশস্থ শ্রীশৈলম্ কাপালিকদিগের প্রধান ধর্মক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকার মুণ্ডমালাধারিণী কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নায়িকা মালতীকে হরণ, শ্মশানপ্রান্তস্থ করালা চামুণ্ডার মন্দিরে তাঁহাকে আনয়ন এবং উহার গুরু অঘোরঘণ্টা কর্তৃক দেবী সমীপে মালতীকে বলিদান প্রচেষ্টা ইত্যাদি অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। কাপালিক ও কালামুখদিগের সম্বন্ধে আমরা মধ্যযুগীয় লেখমালা হইতেও অনেক কিছু তথ্য অবগত হই। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর ভ্রাতুষ্পুত্র নাগবর্ধনের (ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাজত্ব করিতেন) একটি তাম্রশাসনে নাসিক জিলার

ইগাতপুরীর নিকটবর্তী একটি গ্রাম কপালেশ্বর শিবের পূজার ব্যয় নির্বাহার্থ এবং মন্দিরবাসী মহাব্রতীদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত হওয়ার কথার উল্লেখ আছে। মহাব্রতিন বা মহাব্রতধারিন আখ্যা কাপালিক, কালামুখাদি সম্প্রদায়ভুক্ত উগ্রপন্থী শিবোপাসকদিগকেই বুঝাইত। শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী বহু প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে খৃষ্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের বহু স্থানে কালামুখ সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল (*The Colas*, pp. 648-9)। কর্ণাট প্রদেশে প্রাপ্ত ১১৭৭ খৃষ্টাব্দের একটি লেখে একদল তপস্বীকে কালামুখ সম্প্রদায়ভুক্ত এবং লাকুলাগমসময়ের প্রচারক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (*Epigraphia Carnatica*, Vol. V, Pt. I, p. 135)। উক্ত প্রদেশের আসিকেরে তালুক হইতে প্রাপ্ত আরও কয়েকটি মধ্যযুগের লেখ পাঠ ও আলোচনা করিয়া আর. জি. ভাণ্ডারকর সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে এ সময়ে এই অতিমার্গিক শৈব সম্প্রদায়গুলি সাধারণভাবে লাকুল (লকুলীশ পাশুপত) সম্প্রদায়ের শাখা সম্প্রদায় বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার পরোক্ষ সমর্থন আমরা উত্তর আর্কট জিলার মেলপাড়ি এবং দক্ষিণ আর্কট জিলার জম্বই গ্রামস্থ দুইটি লেখ হইতে পাই। এগুলি আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে ঐ দুই গ্রামস্থ কালামুখ সম্প্রদায়ের মঠাধীশ দুইজনের নাম ছিল যথাক্রমে লকুলীশ্বর পণ্ডিত ও মহাব্রতিন লকুলীশ্বর পণ্ডিত। সাধারণতঃ এই সকল উগ্রপন্থী শৈবদিগের নাম শেষে 'রাশি' উপাধি থাকিত ; যথা—শৈলরাশি, জ্ঞানরাশি ইত্যাদি। ভারতবর্ষের উত্তরাংশে বিভিন্ন স্থানে আদি মধ্যযুগের কয়েকটি লেখ পাওয়া গিয়াছে যাহা হইতে এই জাতীয় ঘোরপন্থী শৈবদিগের সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। পঞ্জাব প্রদেশের কাংড়া জিলার অন্তর্ভুক্ত শতদ্রু তীরস্থ নির্মন্দ নামক স্থানে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি তাম্রশাসন আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে নির্মন্দ অগ্রহারে কপালেশ্বর

শিবের এক প্রাচীন মন্দির ছিল এবং তথায় অথর্ববেদাধ্যায়ী একদল শৈব ব্রাহ্মণ দেবতার পূজার্চনার জন্য বাস করিতেন। কপালেশ্বর পূজারত ব্রাহ্মণগণ খুব সম্ভব কাপালিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। মধ্য-ভারতের ত্রিপুরী ও তন্নিকটবর্তী স্থানে খৃষ্টীয় দশম একাদশ শতাব্দীর কয়েকটি শিলালেখ পাওয়া গিয়াছে; ঐগুলি পাঠে জানা যায় যে হৈহয় রাজগণের বংশানুক্রমিক গুরু ছিলেন গুরুপরম্পরাক্রমে একদল শৈব তপস্বী। ইহারা মত্তময়ূর সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং ইহাদের অনেকের নামের শেষে শম্ভু বা শিব পদবী থাকিত, যথা রুদ্রশম্ভু, ধর্মশম্ভু, সদাশিব, চূড়াশিব, কবচশিব, প্রভাবশিব, প্রশান্তশিব, প্রবোধশিব, অঘোরশিব ইত্যাদি। ইহারা মঠাধীশ ছিলেন ও বহু মঠ মন্দিরাদি নির্মাণ করিয়াছিলেন।[১] ইহাদের সম্প্রদায় উগ্রপন্থী অতিমার্গিক ছিল কিনা সঠিক জানা না গেলেও ইহার নাম হইতে মনে হয় যে পাশুপত-বিধি ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

উপরে উদ্ধৃত সাহিত্যগত ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে ইহা বুঝা গেল যে সুপ্রাচীন কাল হইতে মধ্যযুগ পর্যন্ত পাশুপত সম্প্রদায়ের প্রভাব ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক কুষাণরাজ বিম কদফিস শিবোপাসক ছিলেন ত বটেই, তিনি হয়ত এই সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সুবর্ণ ও তাম্র মুদ্রার যে দিকে তাঁহার ইষ্টদেবতা শিব ও তাঁহার বাহন নন্দীর মূর্তি খোদিত, সেই দিকে তৎকালীন খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায় এই লেখটি উৎকীর্ণ আছে--মহরজস রজদিরজস সর্বলোগ ইশ্বরস মহিশ্বরস বিম কঠ্ফিসস ত্রদর। খরোষ্ঠী লিপিতে দীর্ঘস্বর ব্যবহৃত হইত না, সেজন্য 'ঈশ্বরস' ও 'মাহীশ্বরস' মূল শব্দ দুইটি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করিয়াছে। 'মাহীশ্বর' ও 'মাহেশ্বর'

১ R. D. Banerjee, *The Haihayas of Tripuri* (*M. A. S. I.*, No. 23) pp. 110 ff.

সমার্থবোধক, এবং মাহেশ্বর কথাটি পাশুপতের আর এক সংজ্ঞা। এই যুক্তি অনুসারে কুষাণ সম্রাট্ বিম কদফিস পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসক ছিলেন বলিয়া মনে হয়। আপত্তি উঠিতে পারে যে লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক হইলে বিম কদফিস কিরূপে পাশুপত হইতে পারেন? কুষাণ সম্রাট্ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন, এবং মথুরা শিলালিপির সাক্ষ্য অনুযায়ী লকুলীশ তাঁহার ন্যূনাধিক একশত বৎসর পরে আবির্ভূত হন। কিন্তু আগে বলা হইয়াছে যে লকুলীশের বহুকাল পূর্ব হইতে পাশুপত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল, এবং লকুলীশ উক্ত সম্প্রদায়ের প্রথম ঐতিহাসিক সংগঠক ছিলেন, এবং এই সংগঠনে তাঁহার এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল যে পাশুপত ও পাশুপতাশ্রিত অন্য কয়েকটি ঘোর অতিমার্গিক শৈব সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার নাম যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। তবে কুষাণবাজ সম্বন্ধে এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে তাঁহার ধর্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতা রাজকার্যের অন্তরায় স্বরূপ না হওয়াই সম্ভব। তাঁহার কয়েক শতাব্দী পূর্বে মৌর্যসম্রাট্ অশোক দীক্ষিত বৌদ্ধ উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্মবিশ্বাস কৃতিত্ব সহ রাজাশাসনের প্রতিকূল হয় নাই।

প্রাচীন ভারতীয় চিন্তানায়ক ও দর্শনশাস্ত্রকারগণের মধ্যে কেহ কেহ যে পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এ বিষয়ে সাহিত্যগত প্রমাণ বর্তমান। বৈশেষিক সূত্রের রচয়িতা ঋষি কণাদ পাশুপত ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহার ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে কণাদ তাঁহার যোগ এবং আচার বিষয়ক উৎকৃষ্ট জ্ঞান দ্বারা মহেশ্বরকে তুষ্ট করিয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহে বৈশেষিক সূত্র রচনা করিতে সমর্থ হন। উদ্যোত নামক বাৎস্যায়ন কৃত ন্যায়ভাষ্যের টীকার রচয়িতা ভারদ্বাজ তাঁহার গ্রন্থের শেষে পাশুপতাচার্য আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। বরাহমিহির ও তাঁহার ভাষ্যকার উৎপলের পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় মন্তব্যের কথা পূর্বে বলিয়াছি। বাণভট্ট কাদম্বরীতে রক্তবস্ত্র পরিহিত

পাশুপতদিগের কথা বলিয়াছেন ; তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র লালবর্ণের ছিল বলিয়া তাহাদের হয়ত আর এক নাম ছিল রক্তপট। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে অনেকবার পাশুপতদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে এবং ভারতের বাহিরেও যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে পাশুপতগণের মঠ ও মন্দির ছিল তাহা এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়। সিন্ধুনদের অপর পারে সুদূর গন্ধার প্রদেশে ভ্রমণকালে তিনি ভীমাদেবী পর্বতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে উক্ত পর্বতের সানুদেশে তখন দেব (শিব) মন্দির ছিল। উক্ত মন্দিরে ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানে "ভস্মাচ্ছাদিত তীর্থিকেরা" তপশ্চর্যা ও পূজার্চনাদি করিত। এই ভস্মাবৃত তীর্থিকগণ (বৌদ্ধমতে বিধর্মী) ও বরাহমিহির কথিত সভস্মদ্বিজগণ যে পাশুপতদিগকেই বুঝাইতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বারাণসীতে তিনি দশসহস্র পাশুপত তীর্থিক দেখিয়াছিলেন, ইহারা মহেশ্বরের পূজা করিত, দেহে ভস্মলেপন করিত, মস্তকে জটাধারণ করিত এবং কোনও বস্ত্র পরিধান করিত না। দক্ষিণ ভারতের মলয়কূট প্রদেশের একস্থানে পর্বতশীর্ষস্থ হ্রদের পার্শ্ববর্তী একটি দেব (শিব) মন্দিরের উল্লেখ প্রসঙ্গে তিনি পাশুপত তীর্থিকের কথা বলিয়াছেন। মধ্যভারতের মালব প্রদেশে ভ্রমণকালে তিনি শত শত শিব মন্দির দেখিয়াছিলেন ; মালবদেশে বহু অবৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করিতেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে পাশুপতদিগেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। মধ্যপ্রদেশের মহেশ্বরপুর নামক স্থানে তিনি অনেকগুলি দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন, এগুলির বেশীর ভাগই পাশুপত সম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল। সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিম প্রান্তে বেলুচিস্তানের পূর্ব সীমানায় লাংকল নামক দেশের বহুসংখ্যক দেবমন্দির এবং দীক্ষিত পাশুপতের কথা তিনি বলিয়াছেন। ইহার রাজধানীতে একটি বিশাল ও সুন্দর শিবমন্দির ছিল, এবং পাশুপতগণ ইহাকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। বর্তমান আফগানিস্থানের দক্ষিণপূর্ব প্রান্তে বন্ন

প্রদেশেও তিনি পাশুপত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত বহু শিবমন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। খোটান সম্বন্ধীয় সে সময়ে প্রচলিত এক কাহিনীর বর্ণনাকালে তিনি সেই সুদূর দেশেও পাশুপতদিগের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব ভারতে পাশুপত সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সম্পর্কে হিউয়েন সাং বিশেষ কিছু বলেন নাই। কিন্তু উড়িষ্যার কয়েকটি প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মধ্যযুগে এই অঞ্চলে পাশুপত সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। উড়িষ্যার একাম্রক্ষেত্র ভুবনেশ্বরে মধ্যযুগের বহু শিব-মন্দির অদ্যাপি বর্তমান। ইহাদিগের মধ্যে দুটি মন্দির পরশুরামেশ্বর ও কপিলেশ্বর বলিয়া অধুনা পরিচিত। প্রথমটির পূর্বপ্রচলিত নাম যে প(পা)রাশরেশ্বর ছিল তাহা মন্দিরগাত্রস্থ একটি লেখ হইতে জানা যায়। পূর্বোক্ত ৬১ গৌপ্তাব্দের মথুরা শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে আর্য উদিতাচার্য পাশুপতগুরু ভগবান কুশিক হইতে দশম এবং ভগবান পরাশর হইতে চতুর্থ ছিলেন (ভগবতকুশিকাদ্দশমেন ভগবত-পরাশরাচ্চতুর্থেন)। আর্য উদিতের উর্দ্ধতন চতুর্থ গুরু ভগবান পরাশর বোধ হয় পরশুরামেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ প(পা)রাশর হইতে অভিন্ন। শুদ্ধচিত্ত ভগবান কপিল উদিতাচার্যের গুরু পবিত্রচিত্ত ভগবান উপমিতের গুরু ছিলেন (ভগবতকপিলবিমলশিষ্যশিষ্যেণ ভগবদুপমিতবিমলশিষ্যেণ)। এই ভগবান কপিলেরই নাম হয়ত কপিলেশ্বর মন্দিরের সহিত যুক্ত আছে। এ অনুমানের সপক্ষে যুক্তি এই যে ভুবনেশ্বর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থান মধ্যযুগে লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ধর্ম ও কর্মক্ষেত্র ছিল। 'রাজারাণী', 'মুক্তেশ্বর', 'শিশিরেশ্বর' প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের শিবমন্দিরগুলির গাত্রে উৎকীর্ণ লকুলীশ ও তাঁহার প্রধান চারিজন সাক্ষাৎ শিষ্যের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ভুবনেশ্বরের সরকারী চিত্রশালাতে রক্ষিত এরূপ এবং কিছু ভিন্নপ্রকারের আরও কয়েকটি মূর্তি আমি দেখিয়াছি। উড়িষ্যার দক্ষিণ

সীমানাস্থ মুখলিঙ্গম গ্রামের সোমেশ্বর মন্দিরগাত্রেও অনুরূপ মূর্তি খোদিত আছে। এই সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উড়িষ্যা প্রদেশে লকুলীশ পাশুপত সম্প্রদায়ের সমধিক বিস্তার সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রদান করে। বাংলাদেশে ইহার প্রসার কিরূপ ছিল উহা সঠিক বলা যায় না। এখানে যে সব মধ্যযুগীয় দেবমূর্তি পাওয়া গিয়াছে উহা-দিগের মধ্যে লকুলীশের মূর্তি বিরল—একরূপ নাই বলিলেই চলে। বর্দ্ধমান জিলার বরাকরের নিকটবর্তী বেগুনিয়া গ্রামে আদি মধ্যযুগের একটি শিবমন্দির আজিও বর্তমান ; ইহার শিখরের সম্মুখস্থ মধ্যভাগে যোগাসনে উপবিষ্ট ঊর্ধ্বলিঙ্গ দণ্ডধারী (লকুলীশের আর এক নাম লকুটপাণীশ অর্থাৎ যিনি লকুট বা লগুড় অর্থাৎ দণ্ড হস্তে ধারণ করেন) লকুলীশের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি খোদিত আছে।[১] এ প্রসঙ্গে কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠস্থ কালীঘাট মন্দিরের সহিত লকুলীশ পূজার সম্পর্কের কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই দেবস্থান অধিক প্রাচীন না হইলেও ইহার সহিত শক্তিপীঠের অন্যতম কাহিনী জড়িত। কালীঘাট মাহাত্ম্যে ইহা বর্ণিত আছে যে দেবীর অঙ্গুষ্ঠ এখানে পতিত হয়, এবং দেবীর এই অঙ্গের প্রহরায় থাকেন লকুলীশ ভৈরব। কালীমন্দিরের অনতিদূরে একটি শিবমন্দির আছে, ইহার অভ্যন্তরস্থ শিবলিঙ্গ আজিও লকুলীশ ভৈরবের প্রতীক বলিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে।

অধ্যায়শেষে পাশুপত, লকুলীশ পাশুপত ও অনুরূপ অতিমার্গিক সম্প্রদায়ের বিধি ও দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আরও দুএকটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। আর. জি. ভাণ্ডারকর মহাশয় এইসব অতিমার্গিক শৈব সম্প্রদায়গুলির ধর্মসাধন সম্বন্ধে অত্যন্ত তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহার ভাষাতেই বলি— "It will be seen how fantastic and

১ এই মূর্তিটির প্রতি অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মহাশয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ইহার একটি ছায়াচিত্রও আমাকে দেন।

wild the processes prescribed in this system for the attainment of the highest condition are. Rudra-Śiva was the god of the open fields and wild and awful regions away from the habitations of men and worshipped by aberrant or irregular people. This character did impress itself on the mode of worship for his propitiation, which was developed in later times." (*op. cit.*, p. 124). ইহার ভাবার্থ এই—'ইহা, হইতে বুঝা যাইবে যে (যোগীর) শ্রেষ্ঠ অবস্থা লাভের জন্য যেসব উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছিল সেগুলি কিরূপ অদ্ভুত এবং বন্যভাবাপন্ন ছিল। রুদ্র-শিব লোকালয় বহির্ভূত উন্মুক্ত প্রান্তর ও ভীতি উৎপাদনকারী অরণ্যানী প্রভৃতি স্থানের দেবতা ছিলেন, এবং পূর্বে অসামাজিক ও ভ্রান্তপথাশ্রয়ী ব্যক্তিদিগের দ্বারা পূজিত হইতেন। (তাঁহার পূজার) এই রূপটি পরবর্তীকালে তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য (পাশুপতাদি অতিমার্গিক) পূজা-পদ্ধতিকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়াছিল।' পাশুপত সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহার এই উক্তি কাপালিক, কালামুখ সম্প্রদায় সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এ উক্তি যে অনেকাংশে সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুসংযত সমাজ ব্যবস্থায় এইসব ধর্মাচরণ নিন্দার্হ ছিল। বাংলাদেশে 'কালামুখো' (কালামুখের অপভ্রংশ) 'হাঘোরে' (অঘোর-পন্থীর সংক্ষিপ্ত ভাষারূপ) প্রভৃতি আজিও অত্যন্ত নিন্দাসূচক গালাগালি। কিন্তু এইসব আচরণের আর একটা দিক সম্বন্ধে বিস্মৃত হইলে চলিবে না। পাশুপত সূত্র ও উহার ভাষ্যাদি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে পাশুপতাদি সম্প্রদায়ভুক্ত সত্যকারের যোগীরা এইসব প্রক্রিয়া সাহায্যে আপনাদিগকে লোকনিন্দার ঊর্ধ্বে স্থাপিত করিয়া চিত্তশুদ্ধি ও স্থৈর্যের সাধনা করিতেন। জৈন আচারাঙ্গ সূত্রে বর্ণিত আছে যে বর্ধমান মহাবীর রাঢ়দেশে আসিয়া

সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা অপমানিত ও নির্যাতিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা হইতে পারে যে তিনিও এইরূপ নির্যাতন আহ্বান করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা তাঁহার চিত্তবিকার রহিত হয়। অন্ততঃ ভাগবত-পুরাণের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে আদিনাথ ঋষভদেবের (তিনি পুরাণকার কর্তৃক মহাভাগবত উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন) অনুরূপ পরিক্রমা, প্রক্রিয়া ও জনসাধারণের হস্তে নিগ্রহের বিবরণ পাঠ করিলে এইরূপ অনুমান করা বিশেষ অসঙ্গত হয় না। এইসব বিবরণের ঐতিহাসিকত্ব না থাকিতে পারে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ধর্মসম্প্রদায়গত অসামাজিক আচরণের আর একটা দিক সম্বন্ধে ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। পরিশেষে পাশুপতদিগের দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে ইহা বলা আবশ্যক যে ইঁহারা দ্বৈতবাদী অথবা বহুত্ববাদী (dualistic or pluralistic) ছিলেন। সাম্প্রদায়িক আচার্যগণের মতে পরমাত্মা ও জীবাত্মা শাশ্বত পৃথক্ সত্তা, এবং প্রধানই জগৎ প্রপঞ্চের চিরন্তন উপাদানীভূত কারণ। জীব মুক্ত অবস্থায় সমস্ত অজ্ঞান ও দৌর্বল্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় এবং অসীম জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির অধিকারী হইয়া ঈশ্বরের প্রসাদে মহাদেবের মহাগণপতিত্ব প্রাপ্ত হয় (ইত্যে-তৈর্গুণৈর্যুক্তো ভগবতো মহাদেবস্য মহাগণপতির্ভবতি, পাশুপত সূত্র, ১, ৩৮)।

নবম অধ্যায়

শিব-শৈব

দক্ষিণ ভারতের শিবভক্তগণ ও ভারতের উত্তর প্রান্তের কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে পাশুপত সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে এ জাতীয় উগ্রপন্থী শৈব গোষ্ঠীর প্রাদুর্ভাব সুপ্রাচীন কালে প্রথমে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রবল হয়। দক্ষিণ ভারতে ইহা সে সময়ে কিরূপ ছিল তাহার সঠিক তথ্য আমাদের জানা নাই। দাক্ষিণাত্যে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ ব্যাপক আকারের ছিল না, কাজেই তথাকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তৎকালীন ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু তিনি যে দক্ষিণ ভারতের মলয়কূট প্রদেশে ভ্রমণ-কালে বৃহৎ শিবমন্দির দেখিয়াছিলেন এবং পাশুপত তীর্থিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন ইহার কথা অষ্টম অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে। মহীশূর প্রদেশে সির তালুকের অন্তর্বর্তী হেমাবতী গ্রামে প্রাপ্ত ৯৪৩ খৃষ্টাব্দের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে ঐ স্থানে লকুলীশ মুনিনাথ চিল্লুক রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্মে তাঁহার ব্রত ছিল লকুলীশের নাম ও মতবাদসমূহ সেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করা। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে এতদ্দেশে প্রাচীন-কালে পাশুপত সম্প্রদায় প্রবল ছিল, কিন্তু কালক্রমে ইহা ক্ষীয়মাণ হইলে মুনিনাথ চিল্লুক নামধারী একজন পাশুপত যোগী ইহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান হন। কর্ণাটদেশের অন্য এক অংশে প্রাপ্ত ১১০৩ খৃষ্টাব্দের আর একটি লেখ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে বিশেষ পারদর্শী সোমেশ্বর সূরি নামক জনৈক পাশুপত সাধক লাকুল অর্থাৎ লকুলীশ পাশুপত মতবাদ প্রচারে অশেষ কৃতিত্ব

প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রাচীনকালে পাশুপত ধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব-সমর্থক আরও সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়।

কোনও বিশেষ শৈব সম্প্রদায়ের ধর্মানুষ্ঠান রূপে শিবপূজার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণভাবে এই দেবতার পূজা তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি ভাষাভাষী অঞ্চলে সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে দেবতা হিসাবে শিব নামটি 'রক্তবর্ণ' এই অর্থবাচক তামিল শব্দ 'শিবপ্পু' হইতে গৃহীত। এ মত সত্য হইলে শিব যে অনার্য দ্রাবিড়গণের পূজার দেবতা ছিলেন ইহা স্বীকার করিতে কোনও বাধা থাকে না। মহাকাব্য ও পুরাণাদিতে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞ বিনাশের কাহিনীও বৈদিক দেবতা হইতে শিবের পার্থক্য নির্দিষ্ট করে। বৈদিক দেবতামণ্ডলীর অপাংক্তেয় শিবের আদিম অনার্য রূপ সম্বন্ধেও ইহা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। আর্য ও অনার্য, জেতা ও বিজিত, জাতির ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণের ফলে শিব ভারতীয় জনসমাজে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পরিগণিত হন। এদিক দিয়া বিচার করিলেও ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে শিবপূজার প্রাচীনত্ব সহজেই স্বীকৃত হয়। সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে ইহার প্রাচীনতম আদিম প্রতীক অন্ধ্র প্রদেশের গুডিমল্লম গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; ইহা এখনও গ্রামবাসীদিগের পূজা পাইয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে বহু পরবর্তী কাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের অনেক অংশে বহু শিব মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি বংশীয় নৃপতি ও সে' দেশের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ এই সব দেবগৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও বর্তমান। পট্টডাকল, বিরূপাক্ষ, সোমেশ্বর, শিবকাঞ্চীর মন্দিরসমূহ, তিরুকাজু-কুণ্রম, তিরুবোয়িয়ুর, কৈলাস, সুন্দরেশ-মীনাক্ষীর মন্দিরসমূহ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তামিল শিবভক্তগণের রচিত গীতিকবিতাসমূহে

অনেক স্থানীয় শিব মন্দিরের নাম পাওয়া যায়। ভক্তগণ মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে গান গাহিতে গাহিতে ভ্রমণ করিয়া শিবভক্তির প্রচার করিতেন। কিন্তু এ কথাও বলা আবশ্যক যে পুরাকালে এবং পরেও বাসুদেব-বিষ্ণুর ন্যায় শিব এই দেশে ও ভারতের অন্যান্য অংশে ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজভুক্ত জনগণের সাধারণভাবে ভক্তি ও পূজার পাত্র ছিলেন। এই জাতীয় শিবভক্তদিগের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সংগঠক শঙ্করাচার্যও ছিলেন। তাঁহার জীবনীকারগণের দ্বারা শিবের অবতার রূপে স্বীকৃত হইলেও, তিনি ধর্ম বিষয়ে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বেদান্ত ও স্মার্তমতের এবং অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাঁহার স্বল্পায়ু জীবনের প্রধান ব্রত ছিল, এবং ইহার সম্যক্ অনুষ্ঠানে তিনি যেমন বৌদ্ধ প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়গুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন, সেরূপ পাঞ্চরাত্র, শাক্ত, কাপালিক, গাণপত্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়সমূহেরও কঠোর সমালোচক ছিলেন। তিনি দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রূপে খ্যাতিমান ; ভারতের বিভিন্ন অংশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত মঠগুলি হিন্দু জনগণের ধর্মজীবনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া আছে। দক্ষিণ ভারতের শৃঙ্গেরী মঠ আজিও বেদান্ত ও স্মার্ত মতের প্রধান পীঠস্থান রূপে পরিগণিত।

বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি অব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়ের তীব্র বিরোধিতা আর একদল শিবভক্তও করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য প্রধানতঃ যুক্তি, তর্ক ও বিচারের সাহায্যে বৌদ্ধ মতের উচ্ছেদ সাধনে সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু এই শিবভক্তদল কর্তৃক তাঁহাদের নিজ মাতৃভাষা তামিলে রচিত গীতিকবিতা ইত্যাদির দ্বারা শিবভক্তির অত্যধিক প্রচারের ফলে বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ দক্ষিণ ভারত হইতে অনেকাংশে লুপ্ত হইয়া যায়। খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পর প্রথম কয় শতাব্দী বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় তথায় সমধিক প্রভাবশালী ছিল। সমসাময়িক স্তূপ, চৈত্য, বিহার,

মূর্তি, মন্দিরাদি এখনও সে বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। বৈষ্ণব, শৈবাদি ব্রাহ্মণ্য ধর্মগুলি খৃষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দী হইতে ক্রমশঃ প্রতিপত্তিশালী হইতে থাকে, এবং এই সকল ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মের অভ্যুত্থানে দক্ষিণদেশীয় বিষ্ণু ও শিবভক্তগণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেন। দ্বাদশ সংখ্যক বিষ্ণুভক্ত আড়বারগণের এ বিষয়ে সক্রিয় অংশের কথা গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। সংখ্যায় অধিকতর (ইঁহাদের সংখ্যা ৬৩ বলিয়া কথিত আছে) শিবভক্তগণের প্রসঙ্গ এখন আলোচনা করা হইবে। তামিল ভাষায় ইঁহাদের নাম নায়নার। গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার প্রামাণিক গ্রন্থ *Elements of Hindu Iconography*র দ্বিতীয় খণ্ডে পেরিয়-পুরাণ নামক তামিল গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাদের নাম, জাতি, জন্মস্থান ও উপজীবিকার একটি তালিকা দিয়াছেন (পৃষ্ঠা ৪৭৫-৭৮)। ইহাতে ৬৩ জন ভক্তের নাম পাওয়া যায়, চারিজন ব্যতীত সকলের জাতির উল্লেখ আছে, তবে তাঁহাদের পেশা ও জন্মস্থান অনেক ক্ষেত্রেই প্রদত্ত হয় নাই। ৫৯ জন ভক্তের মধ্যে মাত্র ১৫ জন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিলেন (ইঁহাদের প্রথম তিন জন, যথা তিরুজ্ঞান সম্বন্ধ, তিল্লাই ব্রাহ্মণ এবং কলয় নায়নার ছিলেন শিবমন্দিরের পুরোহিত—অপর দ্বাদশ জনের পেশা সম্বন্ধে কিছু বলা নাই), অমাত্য ছিলেন তিন জন (খুব সম্ভব ক্ষত্রিয় জাতিভুক্ত), অভিষিক্ত নৃপতি ও শাসনকর্তা (ক্ষত্রিয় জাতির) ছিলেন একাদশ জন, বৈশ্য পাঁচ জন, বেড়্ড়াড় ত্রয়োদশ জন, গোপালক দুই জন, কুম্ভকার, মৎস্যজীবী, ব্যাধ (বেড়ন), তালরস (তাড়ি) আহরণকারী, তন্তুবায়, রজক, তেলি প্রত্যেকটির একজন করিয়া, এবং পানন, পরইতন ও কুরুম্বন এক এক করিয়া তিন জন। এই বিস্তৃত তালিকাটি একটু মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিলেই বুঝা যায় যে ৫৯ সংখ্যক শিবভক্তদিগের মধ্যে অর্ধেকের কিছু বেশী তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক, প্রায় এক-পঞ্চমাংশ শাসক

সম্প্রদায়ভুক্ত ও এক-চতুর্থাংশ শ্রেষ্ঠবর্ণজাত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার যে তিন জন তাঁহাদের ইষ্টদেবতা সম্বন্ধীয় গীতিকবিতার জন্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দুই জন (তালিকার প্রথম ও শেষ জন,—তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ এবং সুন্দরমূর্তি বা সুন্দরর্‌) ব্রাহ্মণ, এবং একজন অর্থাৎ তিরুনাবুক্করশু বেড়্ড়াড জাতিভুক্ত ছিলেন। রাও-এর তালিকায় তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ প্রথম ও সুন্দরমূর্তি সর্বশেষ, এবং তিরুনাবুক্করশু ৪৫ সংখ্যক স্থান অধিকার করিলেও, এই বেড়্ড়াড় জাতিব শিবভক্ত তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ অপেক্ষা বয়সে অনেক বড় ছিলেন। তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ (সংক্ষেপে সম্বন্ধব) কিন্তু উক্ত তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর শিবভক্তকে এত অধিক শ্রদ্ধা কবিতেন যে তিনি তাঁহাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। 'পিতা' কথাটির তামিল প্রতিশব্দ হইল 'আপ্পা' বা 'আপ্পাব', এবং সেজন্য ব্রাহ্মণবংশীয় নায়নারেব শ্রদ্ধাপ্রদত্ত সম্ভাষণ এই বেড়্ড়াড় জাতীয় শিবভক্তের অন্য নাম রূপে জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। উক্ত তিন জন নায়নাব রচিত শিবভক্তিমূলক গীতি-কবিতাবলীর মধ্যে আপ্পার রচিত ভক্তিরসাত্মক গানগুলির অত্যধিক জনপ্রিয়তার সাক্ষ্যস্বরূপ তামিলদেশে প্রচলিত একটি প্রবচন এখানে উল্লেখযোগ্য। শিব যেন বলিতেছেন, "সম্বন্ধরেব গান আত্মপ্রশংসা-মূলক, সুন্দরর অর্থের জন্য আমার প্রশংসামূলক গান রচনা করিতেন, কিন্তু আমার আপ্পার তাঁহার গানে নিষ্কামভাবে কেবল আমারই প্রশংসা করিতেন।"

উপর্যুক্ত তিন জন শিবভক্তের দ্বাবা তামিল ভাষায় রচিত ভক্তি-রসাত্মক গীতিকবিতাগুলি একত্রে 'দেবারম্ স্তোত্র' বলিয়া পরিচিত। একাদশ বৃহৎ খণ্ডে সংগৃহীত বিশাল তামিল স্তোত্রসাহিত্যের ইহা প্রথম সপ্ত খণ্ড। ৩৮৪ সংখ্যক স্তোত্র সম্বলিত এগুলি 'পদিগম্' নামেও খ্যাত। ইহার প্রথম তিন খণ্ড ভক্ত তিরুজ্ঞানসম্বন্ধের রচনা। পরবর্তী তিন খণ্ড তিরুনাবুক্করশু অথবা আপ্পারের এবং শেষ খণ্ড সুন্দরমূর্তি

বা সুন্দররের রচনা। তামিল বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আড়বারগণ রচিত বিষ্ণুভক্তিমূলক নালায়ির প্রবন্ধাবলীর সম্মান ও জনপ্রিয়তা যেরূপ অত্যধিক, উক্ত তিন নায়নার রচিত দেবারম্ স্তোত্রেরও তামিল শৈবগণের মধ্যে সেরূপ আদর ও সম্মান। ইহার আর এক নাম তামিল বেদ। শৈবদিগের বিশেষ যাত্রায় এবং দেবমন্দির মধ্যে বেদপাঠের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল শিবস্তোত্র সুর, লয়, তান সহযোগে আনুষ্ঠানিক ভাবে ও ভক্তিসহকারে নিত্য গীত হইয়া থাকে। সুকুমারমতি বালক বালিকাগণও তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার সহিত দেবারম্ স্তোত্রের আবৃত্তি ও গানের কৌশল শিক্ষা করে। তামিল ভাষাবদ্ধ বিশাল শিব স্তোত্র-সাহিত্যের অষ্টম খণ্ডের নাম 'তিরুবাসগম্' অর্থাৎ 'শ্রীবাক্য', 'পবিত্র উক্তি', এবং ইহা তামিল শৈবদিগের মধ্যে উপনিষদের পর্যায়-ভুক্ত। এই খণ্ডের রচয়িতার নাম মাণিক্কবাসগ(হ)র অর্থাৎ 'যাঁহার শ্রীমুখ হইতে মাণিক বর্ষিত হয়'। দেবারম্ স্তোত্রের অনুকরণে রচিত অনেকগুলি স্তোত্র সংগ্রহাবলীর নবম খণ্ড; ইহার একাংশ চোল সম্রাট্ রাজরাজের ঊর্ধ্বতন পঞ্চম পুরুষ চোলরাজ কণ্ডারাদিত্যের রচনা। সিদ্ধযোগী তিরুমূলর রচিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বলিত গানগুলি ইহার দশম খণ্ড; এই তিরুমূলর এবং রাওএর তালিকাভুক্ত ৪৬ সংখ্যক তিরুমূলর (ইনি আদিতে গোপালক ছিলেন) একই ব্যক্তি হইতে পারেন। অবশিষ্ট বিবিধ স্তোত্রাবলী ইহার একাদশ বা শেষ খণ্ড; এই একাদশতম খণ্ডের শেষ দশটি স্তবক নম্বি আন্দার নম্বির রচনা, এবং ইহার তৃতীয়টি পেরিয়পুরাণ নামে পরিচিত তামিল পুরাণের উৎসস্বরূপ। তামিল ভাষায় রচিত পেরিয়পুরাণ ও একাদশ খণ্ডে বিভক্ত উল্লিখিত স্তোত্র সংগ্রহাবলী (ইহার তামিল নাম তিরুমুরাই, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমে ইহা নম্বি অন্দর নম্বি কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল) একত্রে তামিল শৈবগণের পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত উহাদিগের অন্য পবিত্র শাস্ত্রের নাম সিদ্ধান্তশাস্ত্র; ইহা সংখ্যায় চতুর্দশ, এবং সব

কয়টি সংখ্যার রচয়িতৃগণ একত্রে সন্তান-আচার্য নামে পরিচিত। স্তোত্রসংগ্রহ যেরূপ প্রধানতঃ ভক্তিরসাত্মক, সিদ্ধান্তশাস্ত্রগুলি সেরূপ শৈবতত্ত্ব ও দর্শনমূলক। সিদ্ধান্তশাস্ত্রাবলীর সহিত আগমান্ত ও শুদ্ধ-শৈব ধর্মদর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। আগমান্ত ও শুদ্ধ শৈব ধর্মমত ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

শৈব স্তোত্র সংগ্রহাবলীর বিভিন্ন খণ্ডের রচয়িতৃগণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্ব যেটুকু জানা যায় সে বিষয়ে এখন কিছু বলা আবশ্যক। তিরুজ্ঞানসম্বন্ধ তাঞ্জোর জিলার শিয়ালি নামক ছোট সহরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এক ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব বিশেষ প্রবল হয়, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিবভক্তি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ভক্ত চারণ কবি রূপে তিনি দক্ষিণ ভারতের সে সময়কার অধিকাংশ শিব মন্দির পরিক্রমা করেন এবং শিবভক্তিমূলক স্বরচিত গান গাহিয়া জনসাধারণের মনে তাঁহার দেবতার প্রতি ভক্তি জাগরূক করিতে যত্নবান হন। এই সময়ে তাঁহার ঈশ্বরভক্তি প্রচারকার্য মদুরার তৎকালীন পাণ্ড্যবংশীয় নৃপতি কুনি পাণ্ড্যের এক ক্রিয়া হেতু সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। পাণ্ড্যরাজ তাঁহার বহুসংখ্যক প্রজা ও অনুচরের সহিত পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজমহিষী ও প্রধান পুরোহিত কিন্তু শৈব ধর্ম ত্যাগ করেন নাই, এবং তাঁহারা সম্বন্ধরকে রাজ-সভায় আনাইয়া জৈন সাধুগণের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত করান। তিরুজ্ঞান তর্কবিচারে ইঁহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পর্যুদস্ত করিয়া শৈব ধর্মমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, এবং ধর্মত্যাগী রাজা ও তাঁহার অনেক প্রজা ও অনুচর শৈব সাধুর প্রভাবে স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন। কিংবদন্তী এই যে উক্ত ঘটনার পরে পাণ্ড্যরাজের আদেশে বহু সংখ্যক জৈন শূলদণ্ডে দণ্ডিত হন, এবং জৈন ধর্ম বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহাও কথিত আছে যে তিনি তদানীন্তন আর একটি তামিল রাজ্যে অনুরূপ

অবস্থায় একদল বৌদ্ধ সাধুকে তর্কে পরাভূত করিয়া স্বমতে আনয়ন করেন। তাঁহার জীবন সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা গেলেও, তদ্রচিত 'পদিগম'সমূহ হইতে তাঁহার অপার ঈশ্বরভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলি আপ্পার রচিত গীতাবলীর মত এত সারল্যপূর্ণ ও স্বতঃস্ফূর্ত না হইলেও, ইহাদের ছন্দলালিত্য ও অন্তর্নিহিত তীব্র শিবভক্তি ইহাদিগকে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে, এবং অনেকে বৌদ্ধ জৈনাদি অন্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া শৈব ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার অনেক গানের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈন প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উল্লেখ আছে। 'তিরুজ্ঞান সম্বন্ধর' এই তামিল নামটির অর্থ হইল 'যে মানব দিব্য জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত'।

বেড়্ড়াড় জাতীয় শিবভক্ত তিরুনাবুক্করসু (আপ্পার) মাদ্রাজ প্রদেশের তিরুবামুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া তিনি এক স্নেহময়ী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দ্বারা লালিত পালিত হন। তাঁহার দিদি অত্যন্ত শিবভক্ত ছিলেন, এবং আপ্পার পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন ধর্ম গ্রহণ করিলে এই স্নেহময়ী মহিলা তীব্র মনঃকষ্ট পান। মহিলাটির ঐকান্তিক প্রার্থনা ও চেষ্টায় তাঁহার মনোভাবের পরিবর্তন হয়, এবং তিনি যে নিজে শুধু স্বধর্মে ফিরিয়া আসেন তাহা নহে, ধর্মত্যাগী দেশশাসককেও তিনি শৈবধর্মে পুনর্দীক্ষিত করেন। তিনিও তামিল দেশস্থ প্রায় সমস্ত শৈবতীর্থ কখনও একাকী, কখনও সম্বন্ধর প্রভৃতি শিবভক্তগণের সঙ্গে ভাবাবেগময় ঈশ্বরভক্তিপূর্ণ গান গাহিতে গাহিতে পরিভ্রমণ করেন। চিত্রে ও ভাস্কর্যে তাঁহার যে সব প্রতিকৃতি দেখা যায়, সেগুলির হাতে একটি ঘাস নিড়াই-বার 'নিড়ানী' দেওয়া থাকে। প্রসিদ্ধি এই যে তিনি এই যন্ত্রের দ্বারা শিব মন্দিরগুলির প্রাঙ্গণস্থ তৃণগুল্মাদি উন্মূলিত করিয়া মন্দিরাভ্যন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়াও পরে স্বধর্মে ফিরিয়া যান, এই হেতু জৈনগণ সাধ্যমত তাঁহার

প্রতি নির্যাতন করিতে ক্ষান্ত হইত না; এই সব নির্যাতন হইতে তাঁহার আশ্চর্যরূপ পরিত্রাণের বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার রচিত স্তোত্রগুলিতে সরল ও আবেগপূর্ণ ঈশ্বরপ্রেম, তীব্র পাপবোধ এবং ঈশ্বর সান্নিধ্য কল্পনায় ভক্তের অত্যধিক আনন্দ প্রকাশ, এই সমস্তই স্বতঃস্ফূর্ত আছে। তামিল ভাষায় তাঁহার নামের অর্থ হইল, 'যিনি জিহ্বা অর্থাৎ ভাষার অধীশ্বর'। সুন্দরমূর্তি (সুন্দরর) তিরু-জ্ঞানের ন্যায় ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশস্থ দক্ষিণ আর্কট জিলার তিরুনাবলুর গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগ তাঁহার আবির্ভাবকাল। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা হইলেও জাতিভেদের তীব্রতাবোধ তাঁহার মধ্যে ছিল না, কারণ তাঁহার দুই পত্নীর একটিও ব্রাহ্মণকুলজাত ছিলেন না। একজন তাঁহার গ্রামস্থ শিব মন্দিরের নর্তকী ছিলেন, এবং অপর জন মাদ্রাজ-নিকটবর্তী তিরুবোত্তিয়ুর গ্রামের বেড়্ড়াড় জাতিভুক্ত ছিলেন। তিনি অতি দরিদ্র ছিলেন, এবং তাঁহার জীবনও শান্তিপূর্ণ ছিল না। সম্বন্ধর ও আপ্পার রচিত স্তোত্রাবলীর মত তাঁহার গানগুলি সাধারণতঃ অত উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ ছিল না, যদিও কয়েকটিতে তাঁহার স্বকীয় আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার গানে পূর্ববর্তী নায়নারদিগের উল্লেখ আছে, এবং পেরিয়পুরাণপ্রদত্ত ৬৩ জন শিবভক্তদিগের নামের তালিকায় তাঁহার নাম সর্বশেষে অবস্থিত।

তিরুমুরাই (স্তোত্র সংগ্রহাবলীর তামিল নাম) সঙ্কলনের অষ্টম খণ্ড তিরুবাসগমের রচয়িতা মাণিক্ক বাসগ(হ)র (সংস্কৃত নাম মাণিক্য বাচক) ৬৩ সংখ্যক নায়নারের অন্তর্ভুক্ত না হইয়াও দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছু বলা না গেলেও অনেকে মনে করেন যে তিনি হয় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের নয় দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধের লোক ছিলেন। তিনি খুব সম্ভব ক্ষত্রিয়কুলজাত ছিলেন,

কারণ মদুরার তৎকালীন জনৈক পাণ্ড্য নৃপতির তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পেরুন্দুরাই (তাঞ্জোর জিলার বর্তমান আবুদইয়ারকোইল) মন্দির দর্শনে আসিয়া তিনি ভাগ্যক্রমে এক ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারকের সংস্পর্শে আসেন, এবং তাঁহার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হন। তাঁহার এই ধর্মগুরুকে তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ মনে করিতেন ; তাঁহার অন্তরে জাগ্রত প্রগাঢ় শিবভক্তি গীতিকবিতার আকারে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইতে থাকে। তাঁহার পূজনীয় ব্রাহ্মণগুরুই তাঁহার গানগুলির নাম 'তিরুবাসগম (হর)' অর্থাৎ 'শ্রীবাক্য' এবং তাঁহার নাম 'মাণিক্ক বাসগ(হ)র' অর্থাৎ 'যাঁহার ভাষণ রত্নতুল্য' রাখেন। মদুরায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি উচ্চ রাজপদ, ধনৈশ্বর্য, মান, প্রতিপত্তি সমস্ত ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়েন। পরিব্রাজক কবি রূপে তাঁহার স্বরচিত শ্রুতিসুখকর ঈশ্বরপ্রেমপূর্ণ গানের মাধ্যমে শিবভক্তি প্রচার করিতে করিতে তিনি মন্দির হইতে মন্দিরান্তরে ভ্রমণ করেন। তাঁহার ধর্মজীবন সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কখনও তিনি চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরে তপশ্চর্যানিরত থাকিতেন, কখনও তিনি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাপ্রভাবে চোল নৃপতির মূক কন্যার বাক্‌শক্তির উন্মেষে ব্যস্ত থাকিতেন, আবার কখনও তিনি সিংহল হইতে আগত একদল বৌদ্ধ ভিক্ষুর সহিত তর্কবিচারে নিরত থাকিতেন। তিনি চারিশত শ্লোক সম্বলিত তিরুক্‌কোবইয়ার নামক একটি আপাতঃদৃষ্টিতে আদিরসাত্মক কাব্যের রচয়িতা বলিয়াও খ্যাত ছিলেন। ঐকান্তিকী শিবভক্তিমূলক তামিল ভাষায় রচিত শিবস্তোত্রসমূহের মধ্যে তাঁহার রচিত স্তোত্রাবলী পদলালিত্যে, ভাবমাধুর্যে এবং ঈশ্বরপ্রেম উদ্দীপনে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। চার্লস এলিয়টের মতে ভারতীয় ঈশ্বরভক্তদিগের দ্বারা রচিত কবিতাবলীর মধ্যে তাঁহার তিরুবাসগম অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে। 'ইহা ভগবদ্গীতার ন্যায় ঈশ্বর কর্তৃক তত্ত্বব্যাখ্যান নহে, পরন্তু ঈশ্বরের প্রতি ভক্তের অন্তরস্থ ব্যাকুল ভক্তি নিবেদন ;

পরোক্ষভাবে ইহা কবির মতবাদ প্রকাশ করে, কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য হইল ভক্তের হৃদয়াবেগ, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয় (প্রভুর নিকট) নিবেদন করা'।[১]

দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তগণ তাঁহাদের স্তোত্রাবলীর সাহায্যে বিশুদ্ধ শিবভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেমের সম্যক্ প্রচার ও প্রসারেই আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্মাচরণ যেমন কোনও উগ্র কঠোর বিধি অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রভাবিত ছিল না, তেমন তাঁহাদের রচিত স্তোত্র ও গীতিকবিতাদির মধ্যে বিশেষ কোনও ধর্মদর্শনের তত্ত্ব নিহিত ছিল না। সহজ সরল অনাড়ম্বরভাবে তান, লয়, সুর সহযোগে ভক্তগণের অন্তর্নিহিত শিবভক্তির প্রকাশ সকলের হৃদয় স্পর্শ করিত, এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে তাঁহাদের মত ও পথ গ্রহণ করিতেন। ভারতের একেবারে উত্তর প্রান্তে কাশ্মীর প্রদেশে প্রায় সেই সময়ে বা কিছু পরে এমন এক দল শৈবাচার্যের আবির্ভাব হয় যাঁহাদের অন্তরস্থ শিবপ্রেম দার্শনিক তত্ত্বের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই আচার্য-গোষ্ঠী প্রচারিত শৈবদর্শন এবং ধর্মাচরণও সম্পূর্ণরূপে উগ্রতা ও অতিমার্গিকতা দোষ হইতে মুক্ত ছিল। পাঞ্চরাত্র মত-বাদের বিবর্তন আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ ভাগে বলা হইয়াছে যে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে এই তুষারমণ্ডিত গিরিবেষ্টিত মনোরম উপত্যকায় ভাগবত আচার্যগণ নিজেদের ধর্মমতের পরিবর্তনে ও পরিবর্ধনে ব্যস্ত ছিলেন, এবং কয়েকটি প্রাচীন পাঞ্চরাত্র গ্রন্থও

১ Sir Charles Eliot, *Hinduism and Buddhism*, Vol. II, p. 215; '*Tiruvacagam* of Mānikka Vācagar is one of the finest devotional poems which India can show. It is not like the *Bhagavadgita*, an exposition *by* the deity, but an outpouring of the soul *to* the deity. It only incidentally explains the poet's views; its main purpose is to tell of his emotions, experiences and aspirations.'

বোধ হয় এই স্থানেই রচিত হইয়াছিল। একদল শৈব আচার্যও আদি-মধ্যযুগে ভূস্বর্গ কাশ্মীর তাঁহাদের ধর্মদর্শনের প্রকাশ ও প্রচারের কেন্দ্র করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রথম ও প্রধান আচার্য ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী বসুগুপ্ত। খৃষ্টীয় নবম শতকের প্রথমার্ধ ইঁহার আবির্ভাবকাল। তিনি শিব শ্রীকণ্ঠের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। এই শিব শ্রীকণ্ঠ আগম শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং শিবসূত্রের রচয়িতা বলিয়া খ্যাত। মহাভারতের নারায়ণীয় পর্বাধ্যায়ে পাশুপত যোগের প্রবর্তক বলিয়া যে উমাপতি ভূতপতি ব্রহ্মার পুত্র শিব শ্রীকণ্ঠের নাম পাওয়া যায় (৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তিনি এবং বসুগুপ্তের গুরু বলিয়া পরিচিত শ্রীকণ্ঠ যে স্বয়ং শিব এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কারণ কাশ্মীর শৈবমতের প্রবর্তক আচার্য বসুগুপ্তের নিকট অলৌকিক উপায়ে শিবসূত্রগুলির রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। শিবসূত্র কাশ্মীর শৈবসম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, এবং কি উপায়ে সূত্রগুলি বসুগুপ্তের গোচরে আসে, সে বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী প্রচলিত আছে। এক কিংবদন্তী মতে তিনি শিব কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মহাদেব পর্বতে যান ও পর্বতগাত্রে শিবসূত্রাবলী খোদিত দেখিতে পান। আবার অন্য কাহিনী এই যে তিনি এক সিদ্ধের নিকট হইতে সূত্রাবলী সম্বন্ধে সংবাদ পান। অপর কিংবদন্তী মতে মহাদেব পর্বতে ভগবান শিব বা তাঁহার অনুচর এক সিদ্ধ স্বপ্নে বসুগুপ্তকে শিবসূত্রাবলীর বিষয় জানান। ইহা ব্যতীত এই সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্বমূলক অপর একটি প্রামাণিক গ্রন্থের নাম স্পন্দকারিকা, ইহার রচয়িতা ছিলেন বসুগুপ্ত নিজে এবং তাঁহার প্রধান শিষ্য কল্লট। কল্লট কাশ্মীরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি উৎপলবংশীয় অবন্তীবর্মনের সমসাময়িক ছিলেন (খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে)। স্থানীয় শৈব মত ও সম্প্রদায়ের প্রবর্তনে ও সংগঠনে এই গুরুশিষ্য আচার্যদ্বয় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের মতে বসু-

গুপ্তই প্রকৃতপক্ষে শিবসূত্রের রচয়িতা, এবং সূত্রাকারে রচিত এই গদ্যগ্রন্থের পবিত্রতা, প্রামাণিকতা ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্যই বোধ হয় স্বয়ং ভগবান মহাদেবকেই ইহার রচয়িতা রূপে প্রচার করা হইয়াছিল, এবং এই মর্মে বিভিন্ন কিংবদন্তী কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে রচিত হইয়াছিল।

কাশ্মীর শৈব মত ও সম্প্রদায়ের দুইটি প্রধান শাখা স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাদের ধর্মতত্ত্বের ও দর্শনের আলোচনা করিবার পূর্বে গুরুপরম্পরা ক্রমে এতদ্দেশীয় যে সকল শৈবাচার্যগণ এই মত ও তত্ত্ব ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আচার্য বসুগুপ্তের খুব সম্ভব অপর এক শিষ্য সোমানন্দ খৃষ্টীয় নবম শতকের শেষের দিকে কিংবা দশম শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হন। কল্লট যেরূপ বসুগুপ্তের তত্ত্বমূলক উপদেশসমূহ সম্প্রদায়ের ধর্মনীতির বিষয়ীভূত করিয়া প্রকাশ ও প্রচার করেন, সোমানন্দ সেরূপ অদ্বৈতবাদকে ভিত্তি করিয়া সেগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছিলেন; তিনিই প্রত্যভিজ্ঞা শাখার প্রবর্তক। তিনি ইহার মতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া শিবদৃষ্টি নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্য উদয়াকরই প্রকৃতপক্ষে এই শাখার ধর্মমত ও তত্ত্বের বিশদ পরিচয় সূত্রাকারে কিন্তু পদ্যে রচিত তাঁহার গ্রন্থে প্রদান করেন। এই গ্রন্থের নাম ঈশ্বর-প্রত্যভিজ্ঞা কারিকাবলী বা সূত্রাবলী; ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার গুরুকৃত অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাসমূহ ও অন্যান্য ধর্মতত্ত্ব সুকৌশলে সন্নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর এক নাম উৎপলাচার্য। কল্লটের পর তাঁহার মাতুলেয় ও শিষ্য প্রদ্যুম্ন ভট্ট, ইহার পুত্র ও শিষ্য প্রজ্ঞার্জুন, তাঁহার শিষ্য মহাদেব ভট্ট এবং তৎপুত্র ও শিষ্য শ্রীকণ্ঠ ভট্ট যথাক্রমে সম্প্রদায়ের গুরু হন। ইহার ইতিহাসে এই চারিজনের অংশ তাঁহাদের পূর্ব- ও পরবর্তী আচার্যদিগের মত তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শ্রীকণ্ঠ ভট্টের শিষ্য ও দিবাকরের পুত্র

ভাস্কর খুব সম্ভব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন এবং গুরু-পরম্পরা ক্রমে তিনি আচার্য বসুগুপ্ত হইতে প্রাপ্ত উপদেশাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া শিবসূত্রবার্তিক নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কল্লট হইতে আরব্ধ গুরুপরম্পরা তাঁহাতেই শেষ হয়, এবং এই সময়ে বা কিছু পূর্বে উদয়াকর-উৎপলাচার্যের পুত্র ও শিষ্য লক্ষণের শিষ্য অভিনবগুপ্ত সম্প্রদায়ের গুরু রূপে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন ও নানা শাস্ত্রবিষয়ক শাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। উৎপলাচার্যের গ্রন্থাদির এবং পরাত্রিংশিকা তন্ত্রের উপর তিনি বিবিধ ভাষ্য রচনা করেন; তৎপ্রণীত অন্যান্য গ্রন্থরাজির মধ্যে তন্ত্রালোক এবং তন্ত্রসারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাশ্মীর শৈব মতের ব্যাখ্যানে ও সম্প্রসারণে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর এই আচার্যের অবদান অপরিসীম। এই সময়ে আর দুই জন মনীষী, উৎপল বৈষ্ণব ও রামকণ্ঠ, যথাক্রমে প্রদীপিকা (স্পন্দকারিকার ভাষ্য) এবং স্পন্দ-বিবৃতি নামে কাশ্মীর শৈবমত সম্বন্ধীয় দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রামকণ্ঠ উৎপলাচার্যের অপর শিষ্য ছিলেন। আচার্য অভিনবগুপ্তের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন ক্ষেমরাজ; তিনি তাঁহার গুরুর প্রারব্ধ কার্য অতি যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়া যান। তিনি শিবসূত্রের বিমর্ষিণী নামক একটি ব্যাখ্যান রচনা করেন, এবং স্বচ্ছন্দ প্রভৃতি তন্ত্রসমূহের উপর ভাষ্য লিখিয়া যান। তাঁহার শিষ্য যোগরাজ (ইনি অভিনব-গুপ্তের নিকট হইতেও শিক্ষা লাভ করেন) অভিনবগুপ্তের অন্যতম গ্রন্থ পরমার্থসারের উপর একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। উপরি-লিখিত কাশ্মীর শৈব গুরুদিগের কার্যের ভার খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়রথ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবোপাধ্যায় প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক আচার্যদিগের উপর ন্যস্ত ছিল।

কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের আচার্যপরম্পরা সম্বন্ধে উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইহার আচার্যগণের

মধ্যে প্রায় সকলেই বিদ্যা, বুদ্ধি ও দার্শনিক তত্ত্ববিচারে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জন্য তাঁহারা যে সব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, ঐগুলি বর্তমানকালের দেশী ও বিদেশী তত্ত্বানুসন্ধিৎসু-দিগের অপরিসীম শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কাশ্মীর শৈবদিগের দুই শাখার কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। এখন এ দুটির ধর্মদর্শন পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যে শাখার ভিত্তি আচার্য বসুগুপ্ত ও তচ্ছিষ্য কল্লট প্রণীত স্পন্দশাস্ত্র, উহার দার্শনিক তত্ত্ব প্রথমেই বিচারযোগ্য। এই শাস্ত্রানুসারে বিশ্বসৃষ্টির জন্য ঈশ্বরকে কোনও গৌণ কারণের উপর নির্ভর করিতে হয় না। কোনও কোনও ধর্মতত্ত্বমতে কর্ম ও প্রধান (উপাদানীভূত কারণ) গৌণ কারণ, এবং ঈশ্বর কর্তৃক সৃজনকার্যের মূলে ইহাদেরও সক্রিয় অংশ বর্তমান। আবার বেদান্তসূত্রে গৃহীত মত যে ঈশ্বর নিজেই উপাদানীভূত কারণ, ইহাও এই শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করেন না। শঙ্কর-সমর্থিত মায়াবাদ অনুসারে পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ যে সর্বৈব মিথ্যা উহাও তাঁহাদের দ্বারা স্বীকৃত হয় না। ইঁহাদের মতে ঈশ্বর সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, এবং তিনি তাঁহার অত্যুত্তম ইচ্ছাশক্তির দ্বারা বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্ট জগৎ তাঁহারই প্রতিচ্ছবি, এবং আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বর হইতে উহার যে পার্থক্যবোধ তাহা ভ্রান্তিপ্রসূত; সৃষ্ট জীব ও জগতের তাঁহার সহিত কোনও প্রকৃত বিভেদ নাই। স্ফটিক দর্পণে ধৃত জীবজন্তু গৃহাদির প্রতিচ্ছবিসমূহ যেমন দর্পণের উপর কোনও রেখা বা কলঙ্ক আরোপ করে না, সেরূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহাতেই প্রতিভাত হইয়া তাঁহার অপার মহিমাকে বিন্দুমাত্র কলুষিত করে না। যে ধর্মদর্শন মতে ঈশ্বর উপাদানীভূত কারণ বলিয়া বিবেচিত, উহার অন্যতম মীমাংসা যে সৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়াই তাঁহার বাহ্য প্রকাশ, ইহাও স্পন্দশাস্ত্রকারগণ কর্তৃক সমর্থিত হয় নাই। বসুগুপ্তের মতে ভগবান মহাদেব অতি নিপুণ যাদুকরের ন্যায় পট, বর্ণ, তুলি ইত্যাদি চিত্রকর্মের নানাবিধ

উপাদান আদৌ ব্যবহার না করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চের চিত্র অঙ্কিত করেন। আর একটি সুন্দর উপমার সাহায্যে তাঁহারা ঈশ্বরের অন্য-নিরপেক্ষ ভাবে সৃজনক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন। সিদ্ধ যোগী যেরূপ কোনও উপাদানের সাহায্য ব্যতিরেকে মাত্র তাঁহার একাগ্র ইচ্ছা-শক্তিবশে নানাবিধ বস্তু প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন, সেরূপ পরম শিব তাঁহার অত্যাশ্চর্য ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়াই এবং কোনও কিছুর সাহায্য না লইয়াই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করেন।

কাশ্মীর শৈবমত যে ভাবে স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে উহা সম্পূর্ণরূপে অদ্বৈত-বাদ সমর্থন করে। কিন্তু স্পন্দ ও প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মত প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে আগমশাস্ত্রসম্মত শৈব দর্শন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত ছিল উহা দ্বৈত বা বহুত্ববাদ প্রভাবিত ছিল। পাশুপত দর্শনের অন্তর্নিহিত তত্ত্বও যে এই প্রকারের তাহা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। পূর্ব প্রতিষ্ঠিত দ্বৈতবাদ নিরসনকল্পে বসুগুপ্ত, কল্লট, সোমানন্দ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় শৈবাচার্যগণ 'ত্রিক' দর্শনের পূর্ণ সমর্থন ও প্রচার করেন। 'ত্রিক' শব্দটি এক অর্থে 'শিব-শক্তি-অনু' এবং অন্য অর্থে 'পশু-পাশ-পতি' এই ত্রিতত্ত্বকে বুঝায়। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অর্থই আমাদের আলোচনার বিষয়। তত্ত্ব তিন হইলেও এক, কারণ প্রথম দুই তত্ত্ব, পশু ও পাশ সম্পূর্ণরূপে পতি বা পরম শিবের উপর নির্ভরশীল। পরমেশ্বর তাঁহার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাবলে নিজেই অগণিত পশু বা জীবের আকারে প্রতিভাত হন, এবং তাঁহার অপরা শক্তিবশে এই জীবসমূহ সুপ্তি বা জাগরণের অবস্থায় থাকে। সুপ্ত অবস্থায় জীব মলসংযুক্ত থাকে। মল তিন প্রকার, যথা আণব, মায়ীয় ও কার্ম। জীব অবিদ্যা প্রভাবে যখন নিজের স্বাধীন ও বিশ্বাত্মিকা প্রকৃতি সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে ও দেহাত্মভেদ সম্বন্ধে বিমূঢ় হইয়া শরীরকেই নিজ স্থায়ী সত্তারূপে ভাবে এবং এজন্য সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন সে

আণব মলের দ্বারাই কলুষিত থাকে। জীবের দেহবদ্ধ অবস্থা ঈশ্বর-সৃষ্ট মায়া হেতু হইয়া থাকে, এবং এই অবস্থায় সে মায়ীয় মলসংযুক্ত হয়। দেহস্থ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয়াদির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া যখন সে নানাপ্রকার কর্মাদি করিয়া চলে, তখন সে কার্ম কলুষ দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই ত্রিবিধ মল পরম শিবের নাদাত্মিকা শাশ্বতী শক্তি হইতে সঞ্জাত হয়। নাদ হইতে শব্দেরও সৃষ্টি, এবং শব্দ ব্যতিরেকে জীবের সাংসারিক জীবন রূপ গ্রহণ করে না।[১] উপরিলিখিত ত্রিবিধ মল, নাদ ইত্যাদি একত্রে ত্রিকের দ্বিতীয় তত্ত্ব পাশকে বুঝায়। এই পাশে বদ্ধ হইয়া পশু সুপ্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে। সে এই পাশ ছিন্ন করিতে পারে এবং সুপ্তি হইতে জাগরণের পথে আসিতে পারে। এজন্য তাহার নিজের আত্যন্তিক প্রযত্ন ও উদ্যম এবং সদগুরুর উপদেশ আবশ্যক। উদ্যমের প্রকৃষ্ট পন্থা হইল একাগ্র ও সুতীব্র মননশক্তি। এই শক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগের ফলে পশু বা জীব শাশ্বত সত্যের আভাস পায় এবং সর্বপ্রকার মল হইতে বিমুক্ত হইয়া পরমাত্মাস্বরূপ হইয়া পড়ে। নিরতিশয় উদ্যমপ্রসূত জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মতার স্থায়ী উপলব্ধিই ভৈরব বলিয়া শিবসূত্রের পঞ্চম সূত্রে ও উহার ভাষ্যে বর্ণিত আছে।[২]

প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রের প্রবর্তক ছিলেন সোমানন্দ, খুব সম্ভব বসুগুপ্তের অপর এক শিষ্য। তৎপ্রণীত শিবদৃষ্টি গ্রন্থেই তিনি এই শাস্ত্রমতের ভিত্তি স্থাপন করেন। কিন্তু তচ্ছিষ্য উৎপলাচার্য বা উদয়াকরই যে

১ ক্ষেমরাজ তাঁহার শিবসূত্র বিমর্ষিণী গ্রন্থে প্রথম তিনটি সূত্রের ভাষ্য-কালে এই সকল তত্ত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন; কাশ্মীর গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪—১৬।

২ উদ্যমো ভৈরবঃ। ভাষ্য······ভৈরবো ভৈরবাত্মক স্বস্বরূপাভিব্যক্তি-হেতুত্বাৎ ভক্তিভাজাম্ অন্তর্মুখৈতত্তত্ত্বাবধানঘনানাং জায়তে।

ইহার প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় তাঁহার পদ্যে রচিত ঈশ্বর প্রত্যভিজ্ঞা কারিকা নামক গ্রন্থে প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা একটু আগেই বলা হইয়াছে। জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিবিবরণ এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রকারদিগের মত স্পন্দশাস্ত্রকার-দিগের মত হইতে পৃথক্ নহে। কিন্তু ইঁহারা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন উপায়ে ঈশ্বরের সহিত জীবের মূলগত ঐক্য উপলব্ধির বিষয় ব্যাখ্যা করেন। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন মতে জীবের শিবের সহিত একাত্মতার উপলব্ধি আপনার মধ্যে ঈশ্বরকে জানিবার ও চিনিবার ফলেই হয়। কঠ, শ্বেতাশ্বতর এবং মুণ্ডক উপনিষদগুলিতে এই শ্লোকটি পাওয়া যায়—

> ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥
> (কঠ উপ, ৫, ১৫ , শ্বেতাশ্বতর, ৬, ১৪ ; মুণ্ডক, ২, ২, ১০)

এই শ্লোক অনুসারে জীবের অভিজ্ঞান শক্তি আপাতদৃষ্টিতে ঈশ্বরের উক্তরূপ শক্তির সমান হইলেও প্রকৃতপক্ষে পরমেশ্বরের সব কিছু উদ্দীপিত করিবার শক্তির উপরই নির্ভর করে। কারণ সূর্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তি তাঁহার দীপ্তিতেই অনুভাত হয়। জ্ঞান- ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট জীব ঐশ্বরিক অংশের অধিকারী, এবং মূলে জীব ও ঈশ্বরে কোনও পার্থক্য নাই। কিন্তু জীব আদিতে অজ্ঞানরূপ তমসায় আচ্ছন্ন থাকা নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত তাহার প্রকৃত ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারে না। এই মত ব্যাখ্যানকল্পে স্থানীয় শাস্ত্রকারগণ যে উপমা ব্যবহার করেন উহা অতি সুন্দর। কোনও একটি প্রেমাস্পদ অপরিচিত যুবকের রূপ ও গুণাবলীর বিষয় অবিরত অন্যের মুখে শ্রবণ করিয়া একটি যুবতী তাঁহাকে মনপ্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে। যুবকের সহিত পূর্বপরিচয়ের অভাববশতঃ তাহার প্রেমাস্পদের নিকট নীত হইলেও সে তাঁহাকে অপর সাধারণের মত

ভাবে, ও তাহার চিত্তে প্রিয়মিলনের কোনও আনন্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু যখন তাহাকে কেহ জানাইয়া দেয় যে যাঁহার কথা কানে শুনিয়া সে তাঁহার পায়ে হৃদয় মন সমর্পণ করিয়াছে তিনিই এই পুরুষ, তখন তাহার আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না, এবং সে মিলনানন্দে বিভোর হইয়া পড়ে। জীব সেরূপ পরম শিবের অত্যুৎকৃষ্ট সত্তার বিষয় জানিয়া তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেও অজ্ঞানাবৃত অবস্থায় জানে না যে তাহার ভক্তির পাত্র ভগবান তাহাতেই আসীন আছেন। যখন কিন্তু সদগুরুর উপদেশে তাহার অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হয়, এবং সে বুঝিতে পারে যে সে নিজেই অত্যুৎকৃষ্ট গুণাবলীযুক্ত ঈশ্বরের অধিষ্ঠান ও পরমেশ্বরের সহিত তাহার কোনও সত্যকারের ভেদ নাই, তখন পরম শান্তি ও ভূমানন্দ তাহার চিত্তে চির বিরাজমান হয়। স্পন্দশাস্ত্রমতে ঈশ্বরের সহিত জীবের একাত্মতা বোধ সুতীব্র মনন ও সর্বপ্রকার কলুষ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টার ফলে ভৈরবের আকারে তাহার উপলব্ধির বিষয় হয়, আর প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন অনুসারে জীবের ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা বোধই তাহার পাশমুক্তির প্রাথমিক ও প্রধান উপায়।

সংক্ষেপে কাশ্মীর শৈবদিগের ধর্মদর্শনের যে বিবরণ উপরে দেওয়া হইল, উহা হইতে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আত্মন, পরমশিবের প্রকাশ, শিবতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, সাদাখ্যতত্ত্ব, ঐশ্বরতত্ত্ব, সদ্বিদ্যা, ষট্‌কঞ্চুক, পুরুষ, প্রকৃতি ও গুণসমূহ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সকল স্পন্দশাস্ত্র ও প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রকারগণ অতি নিপুণ ও বিশদ ভাবে তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চ্যাটার্জী মহাশয় তাঁহার *Kashmir Shaivism* নামক গ্রন্থে এই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে এ গ্রন্থে ইহা আলোচনা করা হইল না। এখানে কিন্তু পুনরায় উল্লেখ করা আবশ্যক যে কাশ্মীর শৈবাচার্যেরা তাঁহাদের ধর্মচর্যায় পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি উগ্রপন্থী শৈবসম্প্রদায় কর্তৃক অনুষ্ঠিত

অতিমার্গিক বিধি চর্যাদির প্রয়োগ না করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, তাঁহারা আসন প্রাণায়ামাদির উপরও সেরূপ্ গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। মাধবাচার্য তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে ইঁহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'এই মাহেশ্বরগণ প্রত্যভিজ্ঞানকেই অভীপ্সিত অর্থ ও পরমার্থ লাভের একটি নব উপায় রূপে গ্রহণ করিয়া মনে করিতেন যে ইহা সমানভাবে সকল মানবের আয়ত্তে ছিল, এবং ইহার জন্য প্রাণায়ামাদি বাহ্য ক্লেশকর ধর্মাচরণের কোনও আবশ্যকতা ছিল না'।[১] কেহ কেহ বলেন যে কাশ্মীর শৈব ধর্মমত দ্রবিড়দেশীয় শৈব সিদ্ধান্তের জনক। ইহা দক্ষিণ ভারতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে। ইহা সত্য যে চতুর্দশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতীয় কয়েকটি লেখে কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের কথা বলা আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণদেশীয় শৈব সিদ্ধান্ত মতবাদ আলোচনাকালে ইহা দেখানো হইবে যে কোনও কোনও বিষয়ে এই দুই ধর্মতত্ত্বের কিছু কিছু মতসাদৃশ্যও বর্তমান। কিন্তু ইহাদের মধ্যে বহু পার্থক্যও বর্তমান।[২] দক্ষিণ ভারতে শৈব মত ও তত্ত্ব একাদশ শতাব্দীর পূর্বেও প্রচলিত ছিল, সুতরাং উহা যে কাশ্মীর শৈব মতবাদ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তবে ইহা হইতে পারে যে খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে মুসলমান আক্রমণ-

---

১ সর্বদর্শনসংগ্রহ, ৯০—'...বাহ্যাভ্যন্তরচর্যাপ্রাণায়ামাদি ক্লেশ প্রথা-সকলাবৈধুর্যেণ সর্বসুলভমভিনবং প্রত্যভিজ্ঞামাত্রং পরাপরসিদ্ধ্যুপায়মভ্যুপগচ্ছন্তঃ পরে মাহেশ্বরাঃ প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রমভ্যস্যন্তি।

২ চার্লস্ এলিয়ট বলেন—'The forms which Śivaism in these two outlying provinces present differences: in Kashmir it was chiefly philosophic, in the Dravidian countries chiefly religious. In the South it calls on God to help the sinner out of the mire, whereas the school of Kashmir, especially in its later developments, resembles the doctrine of Śaṅkara, though its terminology is its own.' *op. cit.* Vol. II, p. 224.

কারীদিগের দ্বারা নির্যাতিত হইয়া কাশ্মীর ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানগুলি হইতে বহু শৈব ব্রাহ্মণ দক্ষিণ ভারতের অনুকূল পরিবেশে নিজেদের ধর্মচর্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দশম অধ্যায়

শিব—শৈব

আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দক্ষিণ ভারতীয় শিবভক্তগণ ও ভারতের সর্বোত্তর প্রান্তের কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায় সংক্রান্ত আলোচনাকালে দেখানো হইয়াছে যে প্রথম দল যেমন মাতৃভাষায় রচিত গীতিকবিতার মাধ্যমে শিবভক্তির বহুল প্রচার ও প্রসার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, দ্বিতীয় শৈব-গোষ্ঠী তেমন দার্শনিক তত্ত্ববিচার দ্বারা ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত-মতের প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। দক্ষিণ ও উত্তর প্রান্তের এই দুই বিশিষ্ট শিবোপাসক দল পরবর্তী কালের জন্য যে সাহিত্য ও তত্ত্বগত অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল আজিও চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এই অধ্যায়ে যে কয়টি শৈব সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনা করা হইবে, উহারা প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতেই রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এবং অতিমার্গিকতা দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া নিজেদের বিশেষ বিশেষ পন্থানুসারে শৈবতত্ত্বের প্রচার ও ঐকান্তিক শিবভক্তির প্রসার বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। দক্ষিণ দেশীয় শ্রীবৈষ্ণব আচার্যগণ যেরূপ নালায়ির প্রবন্ধাবলীর স্রষ্টা আড়বারগণকে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া নিজেদের বিষ্ণুভক্তিমূলক ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এই দেশের শৈবাচার্যগণ সেরূপ নায়নার ও অন্যান্য শিবভক্তবৃন্দের স্তোত্ররত্নাবলীকে আদর্শ করিয়া সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ব্যাখ্যানে অগ্রণী হইয়াছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথমে সরল, অনাড়ম্বর ঐকান্তিক ঈশ্বরপ্রেমের সাবলীল প্রকাশ, পরে দার্শনিক তত্ত্বগত মতবাদের প্রচার প্রচেষ্টা।

আগের অধ্যায়ে সন্তান-আচার্যগণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এই আচার্যগোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন চারিজন, যথা মে কণ্ড দেবর, অরুড়্ণন্দি,

মরই জ্ঞান সম্বন্ধর এবং উমাপতি। ইঁহারা ১২২৩ হইতে ১৩১৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কিঞ্চিন্ন্যূন শতাব্দীকাল ধরিয়া শৈব সিদ্ধান্ত মত প্রচার করিয়াছিলেন। চতুর্দশ সংখ্যক সিদ্ধান্ত শাস্ত্রের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহাদের রচিত। দ্বাদশটি কারিকাবিশিষ্ট শিবজ্ঞানবোধ নামক শৈবদর্শন সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ রৌরবাগমের একটি অংশ। মে কণ্ডদেবর এই প্রামাণিক গ্রন্থটি তামিল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। মে কণ্ড দেবরের প্রখ্যাত শিষ্য অরুড়্ণন্দি শিবজ্ঞান-সিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এবং তাঁহার শিষ্য মরই জ্ঞান সম্বন্ধর শৈব সময় নেরি নামক গ্রন্থের রচয়িতা। মে কণ্ড এবং মরই জ্ঞান শূদ্রজাতিভুক্ত ছিলেন, কিন্তু মরই জ্ঞানের শিষ্য উমাপতি ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার গুরুভক্তি এত প্রবল ছিল যে তিনি শূদ্র গুরুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিতেন না। সন্তান-আচার্যদিগের মধ্যে তিনিই সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক সিদ্ধান্তশাস্ত্র প্রণয়ন করেন; তৎপ্রণীত এ জাতীয় গ্রন্থসংখ্যা ছিল আট। মাণিক্য বাসগ(হ)র প্রণীত তিরুবাসগম স্তোত্রাবলীতে যেসব দার্শনিক তত্ত্ব সহজ ও সরলভাবে গীতিকবিতার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল, ঐ সকল ও অন্যান্য গভীরতর শৈব দর্শন এই সব সিদ্ধান্তশাস্ত্রে যুক্তি-তর্কের দ্বারা বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তামিল ভাষায় শৈব ধর্মদর্শন যামুনাচার্য রামানুজ প্রভৃতি আচার্যগণ কর্তৃক শ্রীবৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যান ও প্রচারের পরে পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করে, এবং এ কারণ ইহাতে শ্রীবৈষ্ণব দর্শনের কিছু কিছু গৌণ প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে। পরবর্তী কালে শম্ভুদেব ও শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য প্রচারিত শুদ্ধশৈব মতবাদে যে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের পূর্ণ প্রভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল উহা একটু পরে আলোচিত হইবে। উল্লিখিত চারিজন সন্তান-আচার্যের পূর্বেও কোনও না কোনও রূপে শৈব দর্শনের বর্তমান থাকার বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রামকৃষ্ণ

গোপাল ভাণ্ডারকর বলেন যে শিবকাঞ্চীর রাজসিংহেশ্বর শিবমন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজসিংহ অত্যন্তকাম শৈব সিদ্ধান্ত দর্শনে অতীব পারদর্শী ছিলেন। এই রাজসিংহ অত্যন্ত-কাম খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ পুলকেশীর সমসাময়িক পল্লব নৃপতি ছিলেন।

প্রাচীন শৈব ধর্মতত্ত্বের প্রধান ভিত্তি ছিল আগমশাস্ত্র, এবং আগমশাস্ত্রের অনুমোদিত সংখ্যা ছিল অষ্টাবিংশতি। আগমান্ত শৈব গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে গোদাবরী নদীর তীরে মন্ত্রকালী নামক স্থানে বংশানুক্রমে শৈবাচার্যদিগের বাস ছিল। তথায় মন্ত্রকালেশ্বর শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া আমর্দক প্রমুখ চারিটি শৈব মঠ স্থাপিত হয়। আমর্দক তৎকালীন অতি বিখ্যাত শৈব মঠ, এবং ইহার বহু শাখা ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রবলপ্রতাপ চোল নৃপতি রাজেন্দ্র চোল গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে বিজয়াভিযানকালে উক্ত শৈবাচার্যদিগের সংস্পর্শে আসেন, এবং অভিযান হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে ইঁহাদিগের মধ্য হইতে কয়েকজনকে লইয়া আসিয়া নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। চোল রাজ্যে নবাগত এই আচার্য গোষ্ঠী শৈব ধর্মতত্ত্বমূলক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এবং ইহার ফলে দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্মদর্শনের প্রভূত প্রসার হয়। ইঁহাদের অন্যতম বংশধর অঘোর শিবাচার্য খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন, এবং তিনি ক্রিয়াকর্মদ্যোতিনী নামক শৈবদর্শন সংক্রান্ত এক অতি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে ত্রিলোচন শিবাচার্য সিদ্ধান্ত-সারাবলী, এবং বামদেব শিবাচার্যের পুত্র নিগম জ্ঞানদেব জীর্ণোদ্ধার-দশকম্ নামে এ জাতীয় গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঞ্জোরের সুবিখ্যাত বৃহদীশ্বর শিবমন্দিরের নির্মাতা পরাক্রান্ত চোল নৃপতি রাজরাজ সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্যকে উক্ত মন্দিরের প্রধান পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করেন, এবং এই নির্দেশ দেন যে আর্য, মধ্য ও গৌড়

দেশীয় শৈবগুরুদিগের শিষ্য-প্রশিষ্যগণই ভবিষ্যতে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত-পদ অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে সর্বশিব পণ্ডিত শিবাচার্য উত্তরদেশাগত আচার্য ছিলেন, এবং আগমান্ত শৈব মতের রূপায়ণে দ্রবিড়োত্তর দেশীয় আচার্যগণ এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ চোল নৃপতিগণের ধর্মগুরুর পদে অভিষিক্ত হন, এবং ইঁহারা রাজ্যে এরূপ প্রভাবশালী ছিলেন যে কখনও কখনও তাঁহারা রাজার বিধান পরিবর্তন করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না।

আগমান্ত শৈবগণ বেদ ও উপনিষদে বিশ্বাসী বেদান্ত শৈবগোষ্ঠী হইতে পৃথক্ ছিলেন; তাঁহারা বেদাদি গ্রন্থের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন না। অদ্বৈতবাদী বেদান্ত শৈবদিগের একটি উক্তির, যথা—যস্য নিশ্বসিতং বেদাঃ, 'যাঁহার (ব্রহ্মের) নিঃশ্বাস হইতে বেদাদির (উৎপত্তি)'—উল্লেখ করিয়া আগমান্ত শৈবগণ বলিতেন যে অষ্টাবিংশতি সংখ্যক আগমশাস্ত্র ভগবান মহাদেবের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল বলিয়া ব্রহ্মের দৈহিক ক্রিয়া মাত্র নিঃশ্বাস হইতে সঞ্জাত বেদাদি অপেক্ষা অধিকতর পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহাদেব পঞ্চবক্ত্র; তাঁহার পাঁচটি মুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান। এই বিভিন্ন বক্ত্রের দ্বারাই আটাশটি শৈবাগম নিম্নলিখিত ক্রমে ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া আগমান্ত শৈবদিগের বিশ্বাস। সদ্যোজাত মুখ হইতে কামিকাগম প্রমুখ পাঁচটি আগম, বামদেব মুখ হইতে সুপ্রভেদাগম প্রভৃতি পাঁচটি, অঘোর বক্ত্র হইতে বিজয়াগম প্রমুখ পাঁচটি, তৎপুরুষ বক্ত্রের দ্বারা রৌরবাগম প্রমুখ পাঁচটি এবং ঈশান বদন হইতে কিরণাগম, বাতুলাগম প্রভৃতি ছয়টি আগম ভগবান মহাদেব কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়। এই ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী আগমান্ত শৈবগণ অষ্টাবিংশতি আগমশাস্ত্রের উপর এত অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। ইহাও এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে আগমগুলির

বিভিন্ন তালিকাভুক্ত নামসমূহের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। শিব স্বয়ং ইহাদের রচয়িতা এ কিংবদন্তীর কথা বাদ দিলে ইহা বলা যায় যে অধিকাংশ শৈবাগম খৃষ্টীয় নবম শতকের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ইহাদের রচনাস্থল যে প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারত, তাহার অন্যতম প্রমাণ এই যে এগুলি প্রায় নাগরী অক্ষরে কিন্তু তামিল, তেলেগু, কানাড়ী প্রভৃতি দক্ষিণ দেশীয় ভাষায় রচিত হয়। বহু আগম অনেক পাঞ্চরাত্র সংহিতার ন্যায় এখনও অপ্রকাশিত আছে। আগম-শাস্ত্রে বিশ্বাসী দক্ষিণ ভারতের শৈবগণ অদ্বৈতবাদী ও বেদাচারী মীমাংসকদিগকে পাশবদ্ধ পশু বলিয়া নিন্দা করিতেন, এবং তাঁহাদিগকে শৈব দীক্ষা গ্রহণের অনুপযুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। অপর পক্ষে কুমারিল ভট্ট প্রমুখ মীমাংসক এবং অদ্বৈতমতাবলম্বিগণ ইঁহাদিগকে নাস্তিক্যবুদ্ধি সম্পন্ন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর অপমার্গগত ব্রাহ্মণ এমন কি শূদ্র বলিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। ইঁহারা পরস্পরের প্রতি অপভাষণরত হইলেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে একে অপরের ধর্মাচরণ আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে বিমুখ হইতেন না। আগমান্ত শৈবেরা গৃহ্যসূত্রে বর্ণিত কয়েকটি হোম ও উহাদের উপযোগী মন্ত্র তাঁহাদের ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহার করিতেন এবং বৈদিক মন্ত্রের অনুকরণে কতিপয় মন্ত্রও রচনা করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের পূজাকার্যে ব্যবহৃত সর্বাপেক্ষা পবিত্র পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ছিল—'নমঃ শিবায়', এবং তাঁহাদের দীক্ষাবিধি, অঙ্কুরার্পণ নামক দীক্ষাদানের প্রারম্ভিক ক্রিয়া, এবং ধর্ম-পালনের অপরাপর অঙ্গ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। নিম্নে শৈব দীক্ষাবিধি সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে।

মোক্ষকামী আগমান্ত শৈবগণ তাঁহাদের ধর্মজীবনে সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে এ বিষয়ে অবহেলা করিলে তাঁহারা জীবনে পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন না, এবং অবশেষে মোক্ষলাভ হইতে বঞ্চিত হইবেন।

গুরু বা আচার্য এই দীক্ষাদান ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতেন, এবং শৈব দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুর দ্বারা তিনি সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতা শিব রূপে পরিগণিত হইতেন। প্রধানতঃ সংসারত্যাগী ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিই দীক্ষাগ্রহণের যোগ্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হইতেন, এবং এই যোগ্যতা লাভের জন্য তাঁহাকে দেবীর প্রসাদের উপর নির্ভর করিতে হইত। দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর এই অনুগ্রহ লাভ 'শক্তিপাতম্' বলিয়া শৈব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। দীক্ষাকামীর নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী শক্তিপাত কয়েক প্রকারের হইত; কাহারও পক্ষে ইহা তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা মনোমধ্যে উদয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, কাহারও পক্ষে অচিরে, আবার অন্য সকলের পক্ষে ধীরে বা অতি ধীরে দেবীর অনুগ্রহ লাভ সম্ভব হইত। শক্তিপাতের তারতম্য অনুযায়ী শৈব দীক্ষাও কয় প্রকারের ছিল। বিভিন্ন শৈব দীক্ষার নাম ছিল সময় দীক্ষা, বিশেষ দীক্ষা ও নির্বাণ দীক্ষা। এই সব দীক্ষাবিধির ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আগমান্ত শৈবগণ নানাপ্রকার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার উপর কত অধিক গুরুত্ব প্রদান করিতেন। তবে ইহাও সত্য যে এই অনুষ্ঠানসমূহ অতিমার্গিকতা দোষ হইতে মুক্ত ছিল। পাশুপত বিধি আলোচনা কালে ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত উপাসকগণের যেসব উগ্র ধর্মাচরণের কথা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে সেগুলি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। সময় ও বিশেষ দীক্ষা বিধিতে গুরু বা আচার্যের অংশ অধিকতর প্রধান ও সক্রিয় ছিল। নির্বাণ দীক্ষা সেই সকল শিষ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য হইত, যাঁহারা আধ্যাত্মিকতার পথে পূর্ব হইতেই অধিক অগ্রসর থাকিতেন। সময় দীক্ষায় গুরু কর্তৃক অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা শিষ্য পাশ হইতে মুক্ত হইতেন, এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি জাতি অনুযায়ী শিষ্য বা শিষ্যার নূতন নূতন নামকরণ হইত। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে স্ত্রী ও শূদ্রের শৈব দীক্ষা গ্রহণে কোনও বাধা ছিল না, তবে

জাতি ও লিঙ্গ অনুযায়ী দীক্ষার পর তাঁহাদের নামকরণে পার্থক্য রাখা হইত। নূতন নামগুলি সাধারণতঃ ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ইত্যাদি মহাদেবের পঞ্চবক্ত্রের নামানুযায়ী রাখা হইত, এবং এই সব নাম সকলকেই দেওয়া যাইত; তবে নামগুলির শেষে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য থাকিত। নবদীক্ষিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়জাতিভুক্ত হইলে নামের পিছনে শিব ও দেব উপাধি যুক্ত করা হইত, যেমন ঈশান শিব (ব্রাহ্মণ), ঈশান দেব (ক্ষত্রিয়) ইত্যাদি। কিন্তু তাঁহারা যদি বৈশ্য বা শূদ্র জাতিভুক্ত হইতেন, তাহা হইলে উভয় ক্ষেত্রেই গণ উপাধি প্রযুক্ত হইত, যথা ঈশান গণ নাম বৈশ্য ও শূদ্র উভয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য ছিল। দীক্ষাপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণী হইলে তাঁহার নাম রাখা হইত ঈশান-বা ঈশা-শিবশক্তি, ক্ষত্রিয়াণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-দেবশক্তি, এবং বৈশ্যা ও শূদ্রাণী হইলে ঈশান- বা ঈশা-গণশক্তি। যাঁহারা তাঁহাদিগের গুরুর নিকট হইতে সময় দীক্ষা গ্রহণ করিতেন, তাঁহাদের বলা হইত সময়ী এবং তাঁহারা দেহান্তে রুদ্র পদ প্রাপ্ত হইতেন। যে সব দীক্ষাকামীর শক্তিপাত ধীরে বা অতি ধীরে হইত তাঁহাদের পক্ষেই সময় দীক্ষা উপযোগী ছিল।

বিশেষ দীক্ষার অধিকারীদিগের পক্ষে দেবীর অনুগ্রহ লাভ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়সাপেক্ষ ছিল। ইহার অনুষ্ঠানাবলী অনেকাংশে সময় দীক্ষার বিধিসমূহের অনুরূপ হইলেও কোনও কোনও বিষয়ে অন্য প্রকার ছিল। গুরু শিষ্যকে সময়াচার শিক্ষা দিতেন। এই শিক্ষানুযায়ী শিষ্য শিব, শৈবশাস্ত্র, শিবাগ্নি এবং গুরুর নিন্দা হইতে বিরত থাকিতেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত গুরু ও শিবাগ্নির পূজা অর্চনা তাঁহার নিত্য কর্তব্য ছিল। বিশেষ দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবদ্দশায় পুত্রক নামে অভিহিত হইতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহাদের ঈশ্বর-পদ প্রাপ্তি ঘটিত। পুত্রকগণ সময়ীদিগের অপেক্ষা যে উচ্চ পর্যায়ের শৈব ছিলেন উহা উভয়ের কর্মগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণিত হয়। পুত্রকেরা

চর্যা ও ক্রিয়াপাদের অন্তর্গত কার্যাবলী করিবার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু সময়ীরা সাধারণতঃ দাসমার্গাশ্রয়ী হইতেন। শিবমন্দিরস্থ দেবতার পূজানুষ্ঠানে উভয় গোষ্ঠীর উপরে যে সব কার্যের ভার অর্পিত হইত উহা হইতে এই পার্থক্য স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। পুত্রকেরা আনুষ্ঠানিক দেবপূজার অধিকারী হইতেন, অপর পক্ষে সময়ীরা প্রায়শঃ পুষ্প, পত্র মাল্যাদি পূজোপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্যের ভার পাইতেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উচ্চস্তরের শৈব ছিলেন নির্বাণ দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তিগণ। দীক্ষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যে ইঁহারা জীবদ্দশাতেই সর্বপ্রকার পাশ হইতে শুধু মুক্ত হইতেন তাহা নহে, পরন্তু তাঁহারা পবিত্রতায় তাঁহাদের ইষ্টদেবতা শিবের প্রায় সমকক্ষ হইতেন, এবং সর্বজ্ঞত্ব, পূর্ণকামত্ব, অনাদি জ্ঞান, অপরাশক্তি, পূর্ণস্বাধীনত্ব প্রভৃতি ঐশী ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। এ প্রসঙ্গে ইহা পুনরায় উল্লেখযোগ্য যে দীক্ষিত আগমান্ত শৈবদিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ব্যক্তিগণের নিকটও সিদ্ধ পাশুপত যোগীদিগের মত অপ্রাকৃত ঐশী শক্তিসমূহ কাম্য হইলেও, ইহার অর্জনে তাঁহারা কোনও রূপ উগ্র পন্থার আশ্রয় লইতেন না।

উপরে যে দীক্ষাবিধির কথা সংক্ষেপে বলা হইল, উহা শৈবতত্ত্বভুক্ত চারিটি পাদের মধ্যে দুইটি, যথা ক্রিয়া ও চর্যাপাদের পর্যায়ে পড়ে। অপর দুইটি পাদের নাম বিদ্যা বা জ্ঞান ও যোগ। তামিল শৈব গ্রন্থে এই চারি পাদের নাম সারিথেই (চর্যা), কিরিকেই (ক্রিয়া), য়োকম্ (যোগ) ও জ্ঞানম্ (বিদ্যা বা জ্ঞান)। বিদ্যা বা জ্ঞানপাদের মধ্যেই শৈব ধর্মদর্শনের প্রকৃত তত্ত্ব নিহিত আছে। এই জ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে অর্জন করিলেই দীক্ষিত শৈব তাঁহার পরম গুরু ও ইষ্টদেবতা মহাদেবের সহিত যুক্ত হইবার অধিকারী হইতেন। আগমান্ত শৈব দর্শনে কাশ্মীর শৈব দর্শনের মত ত্রিতত্ত্বের বিষয় ব্যাখ্যাত আছে। এগুলি পতি, পশু এবং পাশ। কাশ্মীর শৈবদর্শনে ত্রিকের দুটি তত্ত্ব পশু ও

পাশ সম্পূর্ণরূপে পতি বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু আগমান্ত শৈব দর্শনে পতি বা ভগবান শিব কিয়ৎ পরিমাণে পশু বা জীবের কর্মাদির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াই যেন সৃষ্টিকার্যে অগ্রসর হয়েন। ঈশ্বর যদি কর্মাদিনিরপেক্ষ কারণস্বরূপ হন তাহা হইলে আগমান্ত শৈবদিগের মতে তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ ঘটে (তমিমং পরমেশ্বরঃ কর্মাদিনিরপেক্ষঃ কারণমিতি পক্ষং বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষদূষিতত্বাৎ—সর্বদর্শনসংগ্রহঃ, শৈবদর্শনম্)। তিনি সর্বক্রিয়াশীল ও সর্বজ্ঞ এবং জীবের ন্যায় কর্ম ও মলাদি পাশযুক্ত দেহবদ্ধ নহেন; তবে এই শাস্ত্রে তাঁহার যে শরীর কল্পনা করা হইয়াছে, উহা তাঁহার সর্বশক্তির ও পঞ্চবিধ মন্ত্রের সূক্ষ্ম সমন্বয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে ৪৩ হইতে ৪৭ অনুবাকে এই মন্ত্র পাঁচটি বর্ণিত আছে।[১] পঞ্চবিধ মন্ত্রই তাঁহার পঞ্চশক্তি রূপে কল্পিত হইয়াছে, এবং ইহা হইতেই তাঁহার পঞ্চকৃত্যের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, অনুগ্রহ ও তিরোভাব) উদ্ভব।

---

১ সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ। ভবে ভবে নাতি ভবে ভজস্ব মাং। ভবোদ্ভবায় নমঃ॥ (৪৩)। বামদেবায় নমঃ জ্যেষ্ঠায় নমঃ শ্রেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ॥ (৪৪)। অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোর ঘোরতরেভ্যঃ। সর্বতঃ শর্ব সর্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ॥ (৪৫)। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহী। তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥ (৪৬)। ঈশানঃ সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোধিপতি ব্রহ্মাশিবো মে অস্তু সদা শিবোম্॥ (৪৭)। সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ এবং ঈশান এই পাঁচটি বক্ত্র যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং ঊর্ধ্বভাগস্থিত, এবং মন্ত্র পাঁচটি বিভিন্ন বক্ত্র প্রতিপাদক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ড ইহার পরিশিষ্ট রূপে গৃহীত এবং আরণ্যকের অন্য অংশের বহু পরবর্তী কালের রচনা।

মন্ত্রাবলী, মন্ত্রেশ্বর, মহেশ্বর এবং মুক্ত জীব,—এই চারি পদার্থ ই ভগবান মহাদেবের প্রকৃতিবিশিষ্ট।

পশু, জীব বা জীবাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া খ্যাত, এবং নিত্য ও সর্বব্যাপী। এই শৈব মতে মুক্ত জীবের প্রতি অত্যধিক মর্যাদা আরোপ করা হইয়াছে। মুক্ত জীব আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত এবং অনেকাংশে ভগবান শিবের সারূপ্যযুক্ত। এই স্তরে উন্নীত হইবার জন্য জীবকে বহু অন্তর্বর্তী স্তর অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়; শৈব দর্শনে স্তরসমূহের পর্যায়ক্রম বিশদভাবে বর্ণিত আছে। পশু বা জীব প্রধানতঃ তিন প্রকারের, যথা বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল এবং সকল। প্রথম প্রকারের জীব সর্বোচ্চ স্তরের: জ্ঞানার্জন, ধ্যান ও তপশ্চর্যাদি সৎক্রিয়ার দ্বারা তাঁহার কর্মক্ষয় হওয়ার ফলে তিনি কলা হইতে মুক্ত হন (পাশুপত দর্শনের বিবরণ প্রসঙ্গে অষ্টম অধ্যায়ে কলার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে), এবং মাত্র আণব মল তাঁহার সহিত সংযুক্ত থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ প্রলয়াকল জীবের বিশ্বপ্রলয়কালে কলামুক্তি ঘটিলেও তাঁহার দেহে কর্ম হইতে সঞ্জাত মল (কার্ম মল) এবং আণব মল এই দুইটিই বর্তমান থাকে। তৃতীয় প্রকারের জীবের কলাবন্ধন হইতে মুক্তি হয় না (স+কল), এবং তাহার শরীরে আণব, কার্ম ও মায়ীয় (মায়া হইতে সঞ্জাত)—এই ত্রিবিধ মলই সংলিপ্ত থাকে। বিজ্ঞানাকল জীব দ্বিবিধ, সমাপ্তকলুষ ও অসমাপ্তকলুষ। এই প্রকার জীবগণ যাঁহাদের সর্বপ্রকার মল এমন কি আণব মলও বিনষ্ট হইয়াছে, ইঁহারা বিদ্যেশ্বর নামে পরিচিত হন। অনন্ত, শ্রীকণ্ঠ, শিখণ্ডিন্, একনেত্র, শিব, রুদ্র প্রভৃতি আটজন বিদ্যেশ্বর। অসমাপ্তকলুষ বিজ্ঞানাকল জীবগণ সপ্তকোটী মন্ত্র পর্যায়ে ভগবান শিব কর্তৃক উন্নীত হন। এইরূপ প্রলয়াকল ও সকল (কলাযুক্ত) জীবগণও দুই দুই ভাগে বিভক্ত। শেষেরটির প্রথম ভাগ পক্বকলুষ; এই পর্যায়ের জীবগণের কলুষ হইতে মুক্তি আসন্ন, এবং ঈশ্বর দীক্ষাগুরুর রূপ ধারণ-

পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে উপযুক্ত দীক্ষাদান করিয়া ইঁহাদের মোক্ষলাভের সাহায্য করেন। দ্বিতীয় ভাগ অপককলুষ ; ইঁহাদের কলুষমুক্তির শীঘ্র কোনও সম্ভাবনা নাই, এবং এজন্য তাঁহারা তাঁহাদের কর্মফল অনুযায়ী সুখদুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন। পাশ চারি প্রকারের, যথা মল, কর্ম, মায়া বা উপাদানীভূত কারণ এবং রোধশক্তি বা বাধাপ্রদানকারী ক্ষমতা। তুষ যেরূপ শস্যকণাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে, মল সেরূপ জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়া আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। ফলকামনাবিশিষ্ট কার্যাদি কার্ম পাশ নামে পরিচিত ; কর্ম সৎ ও অসৎ, এবং বীজ ও উহা হইতে অঙ্কুরোদ্গমের ন্যায় ইহা উত্তরোত্তর পরিভূয়মান এবং অনাদি। প্রলয়কালে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যাহাতে বিলীন হয়, এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে যাহা হইতে বিশ্বচরাচরের ক্রমিক উদ্ভব হইতে থাকে উহার নাম মায়া। রোধশক্তি ভগবান শিবেরই অন্যতম ক্ষমতা, কারণ তিনি ইহা দ্বারা উপরিলিখিত তিনটি পাশকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তিনি যেহেতু ইহার সাহায্যে জীবের যথার্থ প্রকৃতি আবরিত রাখেন সেই হেতু ইহা অন্যতম পাশ বলিয়া পরিচিত।

উপরে খুব সংক্ষেপে আগমশাস্ত্রভুক্ত জ্ঞান বা বিদ্যাপাদের পরিচয় দেওয়া হইল। ক্রিয়াপাদের আংশিক রূপ দীক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, উহার কথা একটু আগে বলা হইয়াছে। উহার অন্যান্য অংশ মন্ত্রসাধন, সন্ধ্যাবন্দনা, পূজা, জপ, হোমাদি নিত্যকর্ম, নানাপ্রকার সকাম নৈমিত্তিক কর্ম, আচার্য ও সাধকের অভিষেক ইত্যাদির সহিত যুক্ত। পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়ে যেমন ক্রিয়াপাদই অধিক স্থান অধিকার করে, তেমন আগমশাস্ত্রেও ক্রিয়াকাণ্ডের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপিত আছে।[১] যোগপাদে

১ স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন, "A large part of the Āgamas deals with rituals, forms of worship, construc-

জীবাত্মা, পরমাত্মা, শক্তি, জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিকারণ মায়া ও মহামায়া, অষ্টসিদ্ধি[১] (ভক্ত সাধক যোগসিদ্ধ হইলে অণিমাদি অপ্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী হন), প্রাণায়াম, ধ্যান, সমাধি, ষট্‌চক্র প্রভৃতির বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত আছে। চর্যাপাদে প্রায়শ্চিত্তবিধি, পবিত্রারোপণ, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠাবিধি, স্কন্দ, গণপতি, নন্দী ইত্যাদি গণমুখ্যগণ ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ের কথা বলা হইয়াছে। এই তিনটি পাদে শৈবাচারাদির বিষয় সাধারণতঃ বর্ণিত হইলেও, বিদ্যা বা জ্ঞানপাদের মধ্য হইতে যে দার্শনিক তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় উহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে পাশুপত দর্শনের ন্যায় আগমান্ত শৈব দর্শনও দ্বিত্ব বা বহুত্ববাদী (dualistic বা pluralistic)। এই দুইটি ধর্মমতে জীব ও ঈশ্বর (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পৃথক্ সত্তা, এবং প্রধান (প্রকৃতি, মায়া বা মহামায়া) জড়জগতের উপাদানীভূত কারণ। পাশুপত মতে মুক্ত জীব অজ্ঞান, দুর্বলতা ও দুঃখ পরিহার পূর্বক অসীম জ্ঞান ও অলৌকিক কর্মশক্তির অধিকারী হন এবং ভগবান শিবের অনুগ্রহে তাঁহার মহাগণপতিত্ব পদ প্রাপ্তি হয়, শৈব মতে মুক্ত জীব এই সকলের অতিরিক্ত তাঁহার ইষ্টদেবতার সারূপ্যেরও অধিকারী হন, শিবের সৃজনশক্তি ব্যতিরেকে আর সমস্ত শক্তিই তাঁহার অধিকারে আসে।

কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে দক্ষিণ ভারতে শুদ্ধশৈব নামে অপর এক শৈব মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। ইঁহাদের ধর্মদর্শনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। শিব পুরাণের অন্যতম অংশ বায়বীয়

---

tion of the places of worship and *mantras,* and the like. These have no philosophical value,......" —*A History of Indian Philosophy*, Vol. V, pp. 17-8.

১ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব—ইহাই অষ্টসিদ্ধি। এগুলি পরনির্বাণসূচক ঐশ্বর গুণ বলিয়াও বর্ণিত হইয়াছে।

সংহিতা ইহার প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থ, এবং এই মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আদি ব্যাখ্যাতা ছিলেন শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য। তিনি ব্রহ্মমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রের এক বিশদ ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, এবং এই ভাষ্যে তিনি নিজেকে শ্বেতাচার্যের শিষ্য রূপে একাধিকবার পরিচিত করিয়াছেন। এই শ্বেতাচার্য যে কে ছিলেন উহা সঠিক জানা যায় না, এবং শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্যও যে কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন সে বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য কৃত ব্রহ্মমীমাংসা (সূত্র) ভাষ্যের সম্পাদক পণ্ডিত এল. শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভূমিকায় বলিয়াছেন যে কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচার্যের সমকালীন ব্রহ্মসূত্রের অপর এক ভাষ্যকার নীলকণ্ঠ ও শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য অভিন্ন। কিন্তু এ মত যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ শ্রীকণ্ঠ শিবাচার্য গৃহীত দার্শনিক মতবাদে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এরূপ ভাবে সমর্থিত হইয়াছে, যাহাতে মনে হয় তিনি শ্রীরামানুজাচার্যের বেশ কিছু পরবর্তী কালের না হইয়া পারেন না। তিনি খুব সম্ভব খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন, এবং অন্যতম সন্তান আচার্য মে কণ্ডদেবরের সমকালীন ছিলেন। দার্শনিক মতবাদের দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে প্রভূত পার্থক্য ছিল। শ্রীকণ্ঠের মতে শৈবমত শ্রুতি বা বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু মে কণ্ডদেবর প্রভৃতি আচার্যগণ তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে বেদ বা বেদান্তকে ইহার ভিত্তি স্বরূপ মনে করিতেন না, তাঁহাদের মতে আগমাদি শাস্ত্রের উপরই ইহা প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীকণ্ঠ বলিতেন যে জীবাত্মা ও জড়-জগতের আণবিক উপাদানসমূহ ভগবান শিবের চিচ্ছক্তিবশে তাঁহাতেই সঞ্জাত হয়, এবং এই শক্তিবলেই তাঁহার দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্ট হয়। ইহাই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের আর এক রূপ।[১] তদ্রচিত ব্রহ্মসূত্র-

১ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর বলিয়াছেন, "This doctrine may, therefore, be called qualified spiritual monism like that of

ভাষ্যের ভূমিকায় শ্রীকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ব্যাসসূত্র (ব্রহ্মসূত্র) পণ্ডিতগণের ব্রহ্মদর্শনের নেত্রস্বরূপ, ইহা পূর্বাচার্যগণের (ভ্রান্ত ব্যাখ্যানের) দ্বারা কলুষিত হইয়াছিল, এখন তিনি নিজকৃত ভাষ্যে ইহার (সঠিক) ব্যাখ্যান দিতেছেন (ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে। পূর্বাচার্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে)। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শৈবাচার্য অপ্পয় দীক্ষিত শ্রীকণ্ঠ বিরচিত ব্রহ্মমীমাংসা (ব্রহ্মসূত্র) ভাষ্যের ভাষ্য রচনা করিয়া শুদ্ধশৈব সম্প্রদায়ের ধর্মদর্শনের উপর প্রভূত আলোকপাত করিয়াছেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন (*op. cit.*, Vol. V, pp. 65-95)।

মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে যে অপর এক শৈব সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহার নাম বীরশৈব বা লিঙ্গায়ৎ। এই শৈবগোষ্ঠীর উদ্ভব ঠিক কোন সময়ে হইয়াছিল সে বিষয়ে মতভেদ আছে ; তবে সুগঠিত সম্প্রদায় হিসাবে ইহা যে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মাধবাচার্য (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর) তাঁহার সর্বদর্শনসংগ্রহে পাশুপত (নকুলীশ পাশুপত) ও আগমান্ত শৈবদিগের বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু বীরশৈবদিগের কোনও উল্লেখ করেন নাই। শঙ্করাচার্য, বাচস্পতি এবং শঙ্করদিগ্বিজয়প্রণেতা আনন্দগিরি ইঁহাদের বিষয়ে কিছু বলেন নাই। শৈবাগম শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কিছু লিখিত নাই, যদিও বাতুলতন্ত্র বা বাতুলাগম নামক ঈশানবক্ত্রনিঃসৃত এক অপ্রকাশিত শৈবাগমের একটি পুঁথির পরিশিষ্ট অংশে বীরশৈবদিগের অন্যতম ধর্মতত্ত্ব ষট্‌স্থলের (ইহার বিষয় পরে কিছু বলা হইবে) কথা বলা হইয়াছে। তবে ইহার উল্লেখ গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে থাকার জন্য অনুমান হয় যে ইহা

Rāmānuja, in as much as Śiva characterised by the Śakti creates."—*op. cit.*, p. 127.

প্রক্ষিপ্ত। ইঁহাদের লিঙ্গধারণ নামক আর এক ধর্মাচরণ সম্বন্ধে দক্ষিণ ভারতের কোনও সুপ্রাচীন গ্রন্থে কিছু লিপিবদ্ধ নাই, এবং এ সত্যও ইঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে স্থাপন করিবার মতের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু ইঁহাদিগের কোনও কোনও ধর্মতত্ত্বের অনুরূপ তত্ত্ব বহু পূর্ববর্তী যুগের দুএকটি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, উহা ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত সুতসংহিতা নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায়। শরীরে শিবলিঙ্গ ধারণ লিঙ্গায়ৎদিগের একটি অবশ্যকরণীয় ধর্মাচরণ। ইহার প্রাচীনতম প্রয়োগ প্রাক্‌গুপ্তকালের উত্তর ভারতীয় ভারশিব নাগ-বংশের রাজাদিগের (ইঁহারা মথুরা, পদ্মাবতী, চম্পাবতী প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন) এক ধর্মপ্রথা হইতে আমরা জানিতে পারি। ইঁহারা শৈব ছিলেন, এবং শরীরে (মস্তকে) শিবলিঙ্গ ধারণ বা বহন করিতেন। এই প্রথা হইতেই মনে হয় তাঁহারা ভারশিব নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বকালের অনুরূপ তত্ত্ব ও ধর্মাচরণ যে লিঙ্গায়ৎদিগের ধর্মতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান প্রভাবিত করিয়াছিল ইহা অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে।

বীরশৈব সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান পুরুষ ছিলেন বসব; কাহারও কাহারও মতে তিনি ইহার আদি প্রবর্তক। কিন্তু লিঙ্গায়ৎদিগের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আলোচনা করিলে মনে হয় যে তাঁহার বেশ কিছুকাল পূর্বে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। তিনি বাগেবাড়ির অধিবাসী কানাড়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং তাঁহার পিতার নাম ছিল মাদিরাজ। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার মধ্যে অপ্রাকৃত শক্তির বিকাশ হয়। প্রথম যৌবনে তিনি বোম্বাইএর নিকটবর্তী কল্যাণের চালুক্যরাজ বিজ্জল বা বিজ্জণ রায়ের মন্ত্রীত্ব পদ গ্রহণ করেন। বিজ্জল ১১৫৭ হইতে ১১৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন; তিনি বসবের সমস্ত কার্য অনুমোদন করিতেন না। রাজা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী বীরশৈব সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বসব শৈবদিগের এবং

বিশেষ করিয়া লিঙ্গায়ং সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু জঙ্গমদিগের নানাভাবে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। এজন্য রাজকোষ হইতে নিজ দায়িত্বে তিনি প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার এই কার্যের নিমিত্ত বসব রাজার বিরাগভাজন হন। নৃপতি বিজ্জল (ণ) তাঁহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া অভিযান করেন, কিন্তু উহা নিষ্ফল হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ, বিশেষ করিয়া শৈবধর্মাবলম্বী প্রজাগণ, বসবের সমর্থক ছিল, এবং রাজা তাঁহার মন্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিছুদিন উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলেও, ক্রমশঃ উভয়ের মনোমালিন্য ও বিরোধ অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং অবশেষে বসবের প্ররোচনায় রাজা বিজ্জল(ণ) রায় আততায়ীর হস্তে নিহত হন। শৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়ের কল্যাণসাধনে আর বিশেষ কোনও বাধা না থাকাতে বসব এ বিষয়ে অধিকতর তৎপর হন। তিনি নিজে সম্প্রদায় সংক্রান্ত কোন উল্লেখযোগ্য শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার নামে কানাড়ী ভাষায় রচিত বহু উক্তি ও প্রবচন প্রচলিত আছে। এগুলি তাঁহার অপরিসীম শিবভক্তির পরিচায়ক; তিনি ভগবান শিবকে পরম ব্রহ্ম এবং নিজেকে তাঁহার দীন সেবক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তবে তদ্রচিত প্রবচনাবলীতে বীরশৈব সম্প্রদায়ের ষট্‌স্থল প্রভৃতি দুরূহ ধর্মতত্ত্বের কোনও উল্লেখ নাই।

উপরে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে বসবের যে জীবনী প্রদত্ত হইল উহার মূল আমরা প্রধানতঃ বসবপুরাণ, এবং বিজ্জলরায়চরিত নামক এক জৈন গ্রন্থ হইতে পাই। গ্রন্থ দুইটির দৃষ্টিভঙ্গী বিপরীতধর্মী হইলেও তাঁহার জীবনেতিহাস উভয় গ্রন্থেই প্রায় এক রূপ। পুরাণে তাঁহার অনেক ঐশী ও অপ্রাকৃত ক্ষমতার কথা বর্ণিত আছে, জৈন গ্রন্থে যেগুলির স্বভাবতঃই কোনও উল্লেখ নাই। জৈন গ্রন্থকার বসবকে বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু বসবপুরাণে তিনি শিবের বাহন নন্দীর অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পুরাণকার বলিয়াছেন

যে এক সময়ে দেবর্ষি নারদ কৈলাসে ভগবান মহাদেবের নিকট আসিয়া নিবেদন করেন যে মর্ত্যধামে বিষ্ণুপূজা, জিনপূজা, বুদ্ধপূজা এবং বৈষ্ণব, জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও শিবপূজা ও শৈব মতবাদ এখন প্রায় অপ্রচলিত, এবং ইহার পূর্ব গৌরব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। পূর্বে বিশ্বেশ্বরারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম প্রভৃতি বিখ্যাত শৈবাচার্যগণ প্রাদুর্ভূত হইয়া শিবভক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন উহার কোনও প্রতিপত্তি নাই। দেবতা তখন নন্দীকে আদেশ দেন যে তিনি যেন মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবভক্তি ও শৈবমত প্রচারে যত্নবান হন। প্রভুর আজ্ঞায় নন্দী বসব রূপে ('বসব' সংস্কৃত 'বৃষভ' শব্দটির কানাড়ী প্রতিরূপ) কর্ণাট দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আদিষ্ট কার্যে ব্রতী হন। এই আখ্যানটির মূলগত ঐতিহাসিক সত্য ইহা হইতে পারে যে এই বিশেষ শৈবধর্মের উদ্ভব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর অন্ততঃ দুএক শতাব্দী পূর্বে হইয়াছিল। পরে ইহার আংশিক অবনতি ঘটিলে বসব উহার পুনরুজ্জীবনে এক সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের দিক দিয়া বিশেষ কিছু না করিলেও তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পদমর্যাদার বলে শৈব এবং বিশেষ করিয়া বীরশৈব সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ধনে কৃতকার্যতা লাভ করেন। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ও প্রায় অনুরূপ বিচারের দ্বারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। বসব লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্তক না হইলে, কে ইহার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে স্বতঃই প্রশ্ন উঠে। বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ Dr. Fleet কিছু প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণের সাহায্যে বলিতে চাহিয়াছিলেন যে একান্ত বা একান্তদ রামায্য নামে অন্য একজন শৈব সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বসবপুরাণের উত্তরাংশে লিখিত আছে যে ইনি জৈনদিগের শত্রু ছিলেন এবং একবার জৈনসাধুসম্মেলনে ও অন্যবার রাজ বিজ্জলে(ণ)র সভায় তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন।

শেষবারের প্রদর্শনীতে বসব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আর. জি. ভাণ্ডারকর যথার্থই বলিয়াছেন যে ইহা হইতে একান্তদ রামায্যের সাম্প্রদায়িক আদি প্রবর্তকত্ব প্রমাণিত হয় না। তিনি বরং পুরাণোক্ত বিশ্বেশ্বরারাধ্য, পণ্ডিতারাধ্য, মহাযোগী একোরাম প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আদি গুরুদিগের নামের সহিত বীরশৈব দীক্ষাবিধিতে প্রযুক্ত পাঁচজন প্রাচীন আচার্যের (বিশ্বারাধ্য, রেবণসিদ্ধ, মরুলসিদ্ধ, একোরাম এবং পণ্ডিতারাধ্য) নাম মিলাইয়া এই মীমাংসা করেন যে এই সম্প্রদায় প্রথমে এক ব্রাহ্মণ গুরুগোষ্ঠী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইঁহাদের কাহারও কাহারও আরাধ্য উপাধি ছিল, এবং বোধ হয় সম্প্রদায়ের পূর্বনাম ছিল আরাধ্য সম্প্রদায়। Brownএর মতেও ইহার পূর্বনাম ছিল আরাধ্য, এবং আরাধ্য ও সাধারণ লিঙ্গায়ৎদিগের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। আরাধ্যগণই বীরশৈব সম্প্রদায়ের প্রাথমিক রূপদান করেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা যে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য সমর্থন করিয়াছিলেন উহা পরবর্তী কালের লিঙ্গায়ৎদিগের মনঃপূত হয় নাই। বীরশৈব আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব প্রভৃতির ন্যায় সৌম্য পর্যায়ের ছিল, কিন্তু ইহার ধর্মদর্শন ব্যাখ্যানকল্পে স্থল, অঙ্গ, লিঙ্গ ইত্যাদি যে সব নাম ব্যবহৃত হইয়াছিল উহাদিগের সহিত ঐ সব ধর্মতন্ত্রে ব্যবহৃত নামাবলীর কোনও সাদৃশ্য ছিল না। ঠিক কোন সময়ে এই আরাধ্য বা বীরশৈব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা না যাইলেও ইহা যে বসবের আবির্ভাবকালের অধিক পূর্ববর্তী ছিল না ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে।

লিঙ্গায়ৎদিগের শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের ব্যক্তিগণ লিঙ্গী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইতেন, অন্য লিঙ্গায়ৎগণ ছিলেন তাঁহাদের অনুচর। লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের দুইটি বিভাগ—আচার্য ও পঞ্চম। পূর্বে যে বিশ্বারাধ্য ইত্যাদি পাঁচজন আচার্যের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারাই ছিলেন আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের পূর্বপুরুষ; আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণেরাই

সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্য ইত্যাদি করিতেন। ইঁহারা মহাদেবের পাঁচটি বক্ত্র হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদের বিশ্বাস, এবং তাঁহারা বীর, নন্দী, বৃষভ, ভৃঙ্গী ও স্কন্দ নামক পাঁচটি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন। পঞ্চমদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে শিবের ঈশানবক্ত্র হইতে একটি পঞ্চবক্ত্র গণেশ্বরের উদ্ভব হয়; এই গণেশ্বরের পাঁচটি মুখ হইতে মখারি, কালারি, পুরারি, স্মরারি এবং বেদারি নামক পাঁচজন পঞ্চমের উৎপত্তি হইয়াছিল। উপপঞ্চম নামে এক শ্রেণীর লিঙ্গায়ৎ পঞ্চম হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। প্রত্যেক পঞ্চমের এক একজন আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণের সহিত গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ বর্তমান ছিল, এবং গুরুর গোত্রই ইঁহার গোত্র বলিয়া স্বীকৃত হইত। গোত্র ব্যতীত পঞ্চমদিগের নিজ নিজ প্রবর, শাখা ইত্যাদি ছিল। অপর এক বিবরণ অনুযায়ী লিঙ্গায়ৎগণ জঙ্গম, শীলাবন্ত, বন্‌জিগ ও পঞ্চমশালী নামক চারিভাগে বিভক্ত ছিলেন, প্রথম বিভাগের লিঙ্গায়ৎগণ ইঁহাদের মধ্যে উচ্চতম পর্যায়ভুক্ত ছিলেন এবং সমাজে পৌরোহিত্য ইত্যাদি কার্যের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন; সুতরাং পূর্বোক্ত আচার্য লিঙ্গী ব্রাহ্মণ এবং জঙ্গম একই শ্রেণীর লিঙ্গায়ৎকে বুঝাইত। শীলাবন্ত অর্থাৎ সদাচারপরায়ণ লিঙ্গায়ৎগণের সামাজিক মর্যাদা প্রথম শ্রেণীর অপেক্ষা অধিক নিম্নপর্যায়ের ছিল না। বন্‌জিগগণ বাণিজ্যাদি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন, এবং পঞ্চমশালী সাধারণতঃ জঙ্গম ও শীলাবন্তাদির অনুচর হইতেন। জঙ্গমদিগের মধ্যেও দুইটি শ্রেণী ছিল। প্রথম শ্রেণীর জঙ্গমগণ 'বিরক্ত' নামে অভিহিত হইতেন; ইঁহারা বিবাহ করিতেন না এবং ধ্যান, ধারণা, তপশ্চর্যা ইত্যাদি ধর্মাচরণে ব্যাপৃত থাকিতেন। ইঁহারা মঠাধীশ হইতেন এবং সকলের অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইঁহারা পরিব্রাজক রূপে বিচিত্র বেশ পরিধান করিয়া ভারতবর্ষের পঞ্চ শৈবতীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এগুলি কড়ুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী, শ্রীশৈল ও

কেদারনাথ। বীর শৈবদিগের নিকট ইহারা সিংহাসন নামে পরিচিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর জঙ্গমেরা বিবাহাদি করিয়া গৃহী হইতেন এবং পৌরোহিত্য ইত্যাদির কার্য ইহারাই করিতেন। জঙ্গম ও শীলাবন্তাদি লিঙ্গায়ৎদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত উপনয়ন সংস্কারের ন্যায় একপ্রকার দীক্ষানুষ্ঠান বর্তমান ছিল। ইহার নাম ছিল লিঙ্গ স্বায়ত্ত-দীক্ষা। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে তাঁহারা উপবীত গ্রহণ করিতেন না এবং ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রীমন্ত্রপাঠ অভ্যাস করিতেন না। তাঁহাদের গায়ত্রীমন্ত্র ছিল পবিত্র পঞ্চাক্ষর শৈবমন্ত্র, নমঃ শিবায় অথবা ওঁ নমঃ শিবায়, এবং তাঁহারা যজ্ঞোপবীতের পরিবর্তে কণ্ঠে ইষ্টলিঙ্গ নামে পরিচিত ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ ধারণ করিতেন। শরীরে ধৃত ইষ্টলিঙ্গের নিয়মিত পূজা তাঁহাদের নিত্য কর্তব্য ছিল, এবং তাঁহারা শিবমন্দিরে যাইয়া দেবপূজা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। দীক্ষার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগের মত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন, এবং লিঙ্গধারণরূপ দীক্ষা গ্রহণ কালের গায়ত্রীমন্ত্রের (ওঁ নমঃ শিবায়) অতিরিক্ত শিবগায়ত্রী পাঠ করিতেন।[১] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পুরুষগণেরই উপনয়ন সংস্কার হইত, কিন্তু জঙ্গম, শীলাবন্ত বা লিঙ্গী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষ ব্যতীত স্ত্রীলোকগণও লিঙ্গস্বায়ত্ত দীক্ষার অধিকারী ছিলেন, এবং তাঁহারাও সন্ধ্যাবন্দনা ও ইষ্টলিঙ্গপূজাদি আহ্নিককৃত্য করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইঁহাদিগের বিবাহসংস্কার ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রচলিত বিবাহসংস্কারের প্রায় অনুরূপ ছিল; বিবাহকালে পাণিগ্রহণের এবং সপ্তপদী গমনের

---

১ ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রী হইতে শেষ চরণে ইহার পার্থক্য ছিল। ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রী এইরূপ—ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ (প্রণব ও ব্যাহৃতি) তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো-দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। শিবগায়ত্রী পূর্বাংশে একরূপ হইলেও ইহার শেষ চরণ এই প্রকার—'তন নঃ শিবঃ প্রচোদয়াৎ'।

মন্ত্র উভয়ক্ষেত্রে এক ছিল, কেবল লিঙ্গী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অগ্নিতে লাজবর্ষণের প্রথা প্রচলিত ছিল না।

উপরে খুব সংক্ষেপে লিঙ্গায়ৎদিগের যে সামাজিক সংগঠন ও আচার-ব্যবহারাদির পরিচয় প্রদত্ত হইল উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহাদের মধ্যে স্থূলতঃ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুর অনুরূপ সামাজিক ব্যবস্থাই অনুসৃত হইত। কিন্তু রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, চার্লস এলিয়ট প্রমুখ মনীষিগণ মনে করিতেন যে বীরশৈবদিগের দ্বারা বহু সামাজিক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। তাঁহারা ধূমপান, মদ্যপান ও মাংস ভক্ষণ করিতেন না; তাঁহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল, এবং সমাজে মহিলারা উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। স্ত্রীলোক-দিগের মধ্যেও যে লিঙ্গস্বায়ত্ত দীক্ষা প্রচলিত ছিল এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের সমাজে বাল্যবিবাহ অনুমোদিত হইত না, এবং ইষ্টলিঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও দেবমূর্তি তাঁহারা পূজা করিতেন না। তবে তাঁহারা গণেশ ও অপরাপর হিন্দুদেবতাকে যে অসম্মান করিতেন তাহা নহে। বেদে তাঁহারা অবিশ্বাসী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের নিকট পবিত্রতম ও প্রামাণিক শাস্ত্র ছিল বসবপুরাণ ও ছন্নবসবপুরাণ।[১] বেদ পরবর্তী ব্রাহ্মণাদি সাহিত্যের উপর তাঁহারা বিশেষ কোনও গুরুত্ব আরোপ করিতেন না এবং বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানও তাঁহাদের সমর্থন লাভ করে নাই। তাঁহাদের মতে প্রকৃত লিঙ্গায়ৎগণ জন্মবন্ধের অধীন

১ এই দুইটি পুরাণ বসব ও তাঁহার ভাগিনেয় ছন্নবসবের অতিপ্রাকৃত ঘটনাপূর্ণ জীবনকাহিনী। এগুলি কানাড়ী ভাষায় রচিত। ছন্নবসবপুরাণ ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদে আচার্য বিরূপাক্ষী কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ছন্নবসব বসবাচার্যের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর গর্ভে শিবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কিংবদন্তী। বসবপুরাণের রচয়িতা কে ছিলেন ইহা সঠিক জানা যায় না; ইহা মনে হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের রচনা।

ছিলেন না, এবং দেহান্তের পর তাঁহাদের আত্মা পুনর্জন্ম গ্রহণ না করিয়া ভগবান শিবে লীন হইয়া যাইত। তাঁহাদের মধ্যে জাতিভেদের কঠোরতা সেরূপ ছিল না, এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য হিন্দুসমাজভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের আধিপত্য অস্বীকার করিতেন।

পরিশেষে বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। ইহার মূলতত্ত্বগুলির কিয়দংশ স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত সূতসংহিতা, কামিকাগম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বিশদ ও সুবিন্যস্ত ভাবে ইহা রেণুকাচার্য প্রণীত সিদ্ধান্ত শিখামণি, প্রভুলিঙ্গলীলা, মায়ীদেবের অনুভবসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত আছে। উপরিলিখিত তুইটি পুরাণেও ইহার আংশিক পরিচয় দেওয়া আছে। সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মই শিবতত্ত্ব নামে পরিচিত। ইঁহার আর এক নাম স্থল; ইঁহাতে মহৎ আদি বিশ্বপ্রপঞ্চের কারণবীজ প্রতিষ্ঠিত এবং প্রলয়কালে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে সঞ্জাত বিশ্বচরাচর সমস্তই ইঁহাতে প্রত্যাবর্তন করিয়া লীন হয়, এ কারণেই ইঁহার এই নাম (স্থ+ল)। ইঁহার অন্তরস্থিত শক্তির আলোড়নের ফলে, ইনি লিঙ্গস্থল ও অঙ্গস্থল নামক তুই অংশে বিভক্ত হন। লিঙ্গস্থলই উপাস্য রুদ্র-শিব এবং অঙ্গস্থল উপাসক জীব বা জীবাত্মা। ভগবান শিবের অন্তরস্থ শক্তিও আবার নিজ ইচ্ছাবশে তুই ভাগে বিভক্ত হন;—একটি ভাগের নাম কলা, ইহা শিবকে আশ্রয় করে, এবং অপরটির নাম ভক্তি, উহা জীবকে অবলম্বনকারী ও জীবের মোক্ষ আনয়নকারী ক্রিয়াবিশেষ। ভক্তিপ্রয়োগের দ্বারাই লিঙ্গস্থল বা শিব ও অঙ্গস্থল বা জীবের মধ্যে যোগ স্থাপিত হয়। লিঙ্গস্থলের অপর তিন বিভাগের নাম ভাবলিঙ্গ, প্রাণলিঙ্গ এবং ইষ্টলিঙ্গ; এই বিভাগ তিনটি যথাক্রমে নিষ্কল, সকল-নিষ্কল ও সকল নামেও পরিচিত। ভাবলিঙ্গ পরমব্রহ্মাত্মক শিবের সৎ, প্রাণলিঙ্গ চিৎ ও ইষ্টলিঙ্গ আনন্দ রূপের প্রকাশ; আবার অন্যদিকে ভাবলিঙ্গাত্মক সৎই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব,

প্রাণলিঙ্গ উঁহার সূক্ষ্ম রূপ এবং ইষ্টলিঙ্গ জড় রূপের অভিব্যক্তি। এই লিঙ্গত্রয় প্রয়োগ, মন্ত্র ও ক্রিয়া গুণান্বিত হইয়া যথাক্রমে কলা, নাদ এবং বিন্দুতে পরিণত হয়। এই তিন তত্ত্বের প্রতিটি আবার দুই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া মহালিঙ্গ বা মহাত্মলিঙ্গ, প্রসাদলিঙ্গ বা প্রসাদঘন-লিঙ্গ, চরলিঙ্গ, শিবলিঙ্গ, গুরুলিঙ্গ এবং আচারলিঙ্গের রূপ পরিগ্রহ করে। এই ছয়টি লিঙ্গের আর এক নাম ষট্‌স্থল[১]। ষড়্‌বিধ লিঙ্গ ছয় শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই বিভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। শক্তিগুলির নাম যথাক্রমে চিৎশক্তি, পরাশক্তি, আদিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি। বীরশৈবদিগের লিঙ্গস্থল অর্থাৎ পরম ব্রহ্মাত্মক শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে আরও যে সকল মতবাদ বর্তমান, বাহুল্যভয়ে সেগুলির উল্লেখ এখানে করা হইল না। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে ঈশ্বরের উপরোক্ত ছয় রূপ তাঁহাকে ছয়টি বিভিন্ন উপায়ে নিরীক্ষণ বা চিন্তন করার ক্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে।[২]

---

১ ষট্‌স্থলের আরও কয়প্রকার রূপ আছে। অঙ্গস্থলের ছয় বিভাগ ষট্‌স্থল নামে পরিচিত। আত্মন, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্‌ ও ক্ষিতি একত্রে ষট্‌স্থল বলিয়া অভিহিত; আত্মন হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে অপ্‌ এবং অপ্‌ হইতে ক্ষিতির উৎপত্তি। ষট্‌স্থল সম্বন্ধে তথ্য কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কানাড়ী ভাষায় রচিত প্রভুলিঙ্গলীলা এবং বসবপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইহার সম্বন্ধে জানা যায়। প্রভুলিঙ্গলীলা হইতে আমরা জানিতে পারি যে বসবের গুরু অল্লম তাঁহার শিষ্যকে ষট্‌স্থল বিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ছন্নবসবও এ বিদ্যায় দীক্ষিত হইয়াছিলেন।—S. N. Das Gupta, *op. cit.*, Vol. V, pp. 59-64.

২ "It will be seen that the original entity becomes divided into God and individual soul by its innate power,

অঙ্গস্থল (ইহা পরম শিবেরই আর এক রূপ) বা জীবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ভক্তি। জীবকে আশ্রয়কারী ভক্তির তিন পর্যায় বা ক্রমের নাম যোগাঙ্গ, ভোগাঙ্গ ও ত্যাগাঙ্গ। প্রথম পর্যায়ে জীব শিবের সহিত মিলিত হইয়া পরম সুখের অধিকারী হয়, দ্বিতীয়টিতে সে শিবসাযুজ্য ভোগ করে, এবং তৃতীয় পর্যায়ে জীব অনিত্য ও মায়াময় বোধে জগৎকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়। যোগাঙ্গ জীবের ভক্তির দুই বিভাগ,—ঐক্য ও শরণ। জগৎ অনিত্য ভাবিয়া জীব যখন শিবের সহিত একাত্মীভূত হইয়া পরমানন্দরসে নিমগ্ন হয়, তখনই সে ঐক্যভক্তির অধিকারী হয়। ঐক্যভক্তি সমরসা ভক্তি নামেও অভিহিত। শরণভক্তি-বশে জীব শিবকে নিজের মধ্যে এবং সর্বত্র অবস্থিত বলিয়া উপলব্ধি করে; এই উপলব্ধির ফলও গভীর আনন্দবোধ। শরণভক্তিসম্পন্ন জীব প্রাণলিঙ্গিন এবং প্রসাদিন নামক দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের জীব অহংজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া তাহার সমস্ত চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পণ করে। দ্বিতীয় প্রকার জীব উহার সমস্ত ভোগ্য বস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া প্রসাদ শান্তি লাভ করে। শেষোক্ত জীবের আবার মাহেশ্বর এবং ভক্ত নামে দুই বিভাগ বর্তমান। ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ়বিশ্বাসী মাহেশ্বর নিজের জীবনকে ব্রত, নিয়ম সংযমাদির দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত করে, এবং জীবনে সত্য, নীতি ও শৌচাদির পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় না। ভক্ত জীব সর্ব পার্থিব বিষয়ে অনাসক্তচিত্ত হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক ধর্মানুষ্ঠান পালন করিয়া বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্যপূর্ণ

---

and the six forms of the first, that are mentioned, are the various ways of looking at God."—R. G. Bhandarkar, *op. cit.*, p. 136. বীরশৈবদিগের ধর্মতত্ত্ব ভাণ্ডারকর মায়িদেবের অনুভবসূত্র হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। আমিও এ বিষয়ে প্রধানতঃ তাঁহাকেই অনুসরণ করিয়াছি।

জীবন যাপন করে। এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে যোগাঙ্গ ভক্তির অধিকারী জীবের শিবের সহিত সামরস্যই উহার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য রূপ, এবং তাঁহার সহিত ইহার আনন্দবোধ বিষয়ে একত্ব স্বীকৃত হইলেও উভয়ের নিত্য অভিন্নত্ব এবং অদ্বৈতত্ব স্বীকৃত হয় না। এ বিচারে ইহা শঙ্করাচার্য সমর্থিত অদ্বৈতবাদ হইতে পৃথক্। বীরশৈব মতবাদের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য হইল জীব বা অঙ্গস্থল শিব বা লিঙ্গস্থলের আর এক নিত্য রূপ; ইহার কথা বিবেচনা করিলে বলা যায় যে এই মতে শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় সমর্থিত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রভাব বর্তমান। আর এক বিষয়েও এই দুই মতবাদের মধ্যে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় মতেই ঈশ্বরভক্তির উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক নিয়মনিষ্ঠার সাহায্যে ঈশ্বরের সহিত সামরস্য লাভ উভয়েরই কাম্য। তবে উভয়ের মধ্যে কিছু পার্থক্যও আছে। শ্রীবৈষ্ণব গৃহীত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে জীব ও জগতের সূক্ষ্ম উপাদান ঈশ্বরের বিশেষ গুণ রূপে সৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তাঁহাতেই বিদ্যমান, এবং পরে সৃষ্টির প্রারম্ভে তাঁহা হইতেই বিকাশমান; কিন্তু বীরশৈব মতে ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তি ও তাহার বিভিন্ন ক্রম হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব হয়।

এই অধ্যায়ে আগমান্ত শৈব, শুদ্ধশৈব ও বীরশৈব সম্প্রদায়গুলির খুব সংক্ষেপে যে পরিচয় প্রদত্ত হইল, উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই সৌম্য পর্যায়ের শৈব ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণ দার্শনিক তত্ত্ববিচারে বিশেষরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। প্রথম ও তৃতীয় সম্প্রদায়ের আচার্যেরা বৈদিক পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ না করিলেও তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্মানুষ্ঠানে ও মতবাদে এমন সব প্রক্রিয়ার ও চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছিলেন, নিয়মনিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার দিক দিয়া যেগুলির শুদ্ধ বেদাচার ও বৈদিক তত্ত্বাদির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বেদান্তে প্রতিপাদিত দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টা-

দ্বৈতবাদ যথাক্রমে আগমান্ত শৈবদিগের ও বীরশৈবদিগের ধর্মদর্শনে গৃহীত হইয়াছিল। উহাদের বিভিন্ন দীক্ষাবিধি নিজ নিজ প্রণালী অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলেও বৈদিক আচার ও সংস্কার যে ইহাদিগকে আদৌ প্রভাবিত করে নাই এ কথা বলা চলে না। আগমান্ত শৈবগণ আদিতে বেদবাহ্য বলিয়া অভিহিত হইলেও, কালক্রমে ইঁহারা কিছু কিছু বৈদিক অনুষ্ঠান স্বীকার করিয়া লন। বীরশৈবগণ বেদাচারী ব্রাহ্মণদিগের প্রাধান্য স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের অনুকরণে নিজ সম্প্রদায় মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির স্তরবিভাগ মানিয়া লইয়াছিলেন। শুদ্ধশৈবগণ অপরদিকে আপনাদিগের বৈদান্তিক শৈব পরিচয়ে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। তাঁহাদেরও ধর্মদর্শনে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থিত হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণ প্রণীত তত্ত্ববহুল গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই বিরচিত হইয়াছিল, কিন্তু অন্য দুই সম্প্রদায়ের আচার্যেরা তাঁহাদের তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থসমূহে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সঙ্গে তামিল, কানাড়ী প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষাও ব্যবহার করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

শক্তি—শাক্ত

শক্তি বা দেবীপূজার ঐতিহ্য—দেবীর রূপবৈচিত্র্য—দেবীমূর্তি-পরিচয়

এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে খৃষ্টপূর্ব ২য় বা ৩য় শতকে রচিত নিদ্দেস নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে পঞ্চোপাসনার অন্ততঃ তিনটির (বৈষ্ণব, শৈব ও সৌর) স্পষ্ট উল্লেখ এবং একটির (গাণপত্য) আদি রূপের ইঙ্গিত থাকিলেও শক্তি বা দেবীপূজার কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই (পৃঃ ১২)। কিন্তু এই নেতিবাচক তথ্য হইতে শক্তিপূজা যে অর্বাচীন এ কথা স্বীকার করা যায় না। বরং প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্যগত এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যাহা হইতে ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মাতৃ রূপে কল্পিত শক্তি বা দেবীর উপাসনার প্রবর্তন যে পিতৃদেবতা পূজার প্রারম্ভকালের সমসাময়িক এ অনুমান অযৌক্তিক নহে। এ বিষয়ে প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণই আমাদিগকে কিছু তথ্য প্রদান করে। প্রাচীন সিন্ধুঘাটী সভ্যতার বিশেষ কতকগুলি নিদর্শন এই প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। হরপ্পা, মহেঞ্জো-ডারো প্রভৃতি স্থানে এমন কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃন্ময় স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে যেগুলিকে পণ্ডিতেরা পূজার্থে ব্যবহৃত মাতৃকামূর্তি বলিয়া মনে করেন। এগুলি প্রায় নগ্ন, ইহাদের কটিদেশ মাত্র হ্রস্বাকৃতি পরিধেয় বস্ত্রে আবৃত। ম্যাকে তাঁহার *Early Indus Civilisation* নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৫৪ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে এই অজ্ঞাতনামা মৃন্ময় মাতৃকা-মূর্তিগুলিকে সেখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা গৃহদেবতা রূপে পূজা করিতেন। অমূর্ত প্রতীকের মাধ্যমেও তাঁহারা যে মাতৃদেবতার অর্চনা করিতেন উহা আমরা এইসব স্থানে আবিষ্কৃত কতকগুলি নিদর্শন হইতে অনুমান করিতে পারি। মার্শাল মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার ক্ষুদ্র ও

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডগুলিকে যোনিপ্রতীক বলিয়া মনে করিতেন। সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত শিশ্নপ্রতীকগুলিকে যেমন তিনি পিতৃদেবতার পূজার্থে ব্যবহৃত দ্রব্য বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই যোনিপ্রতীকগুলিকেও মাতৃকাপূজার নিদর্শন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এ ব্যাখ্যা সকলে গ্রহণ করেন নাই। এই জাতীয় বৃহত্তর প্রস্তরখণ্ডসকল কাহারও কাহারও মতে পাষাণে তৈয়ারী গৃহাদির স্তম্ভাংশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু এ মত এই প্রকার বড় বড় নিদর্শন সম্বন্ধে আংশিক প্রযোজ্য হইলেও, এইরূপ ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড সম্বন্ধে আদৌ প্রযোজ্য হইতে পারে না। উপরন্তু উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক যুগের কতকগুলি অলঙ্করণসমৃদ্ধ, বৃত্তাকার, মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট, নাতিক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের সহিত ইহাদের তুলনা করিলে মার্শালের ব্যাখ্যা আদৌ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তক্ষশিলা, কোসাম (এলাহাবাদের নাতিদূরে অবস্থিত প্রাচীন কৌসাম্বী), রাজঘাট (বর্তমান কাশী রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকট) ও পাটনা প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক খননকালে মৌর্য-শুঙ্গ যুগের এই নিদর্শনগুলি পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও কয়েকটি একজাতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। ইহাদের প্রত্যেকটি নরম প্রস্তরে (steatite) বা বালুকা-প্রস্তরে (sandstone) নির্মিত, বৃত্তাকার, মধ্যে ছিদ্র বা নাতিগভীর গোলাকার গর্তবিশিষ্ট, এবং ইহাদিগের উপরিভাগে বা কোনও কোনওটির মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্রে নগ্ন মাতৃকামূর্তি ও বৃক্ষাদির চিত্র খোদিত দেখা যায়। তক্ষশিলার সন্নিকট হাথিয়াল গ্রামে প্রাপ্ত বালুকা-প্রস্তরে নির্মিত এরূপ একটি নিদর্শন মার্শাল এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—"বালুকা-প্রস্তরে নির্মিত বৃত্তাকার প্রস্তরখণ্ডটির ব্যাস সওয়া তিন ইঞ্চি; ইহার উপরিভাগ এককেন্দ্রিক 'ক্রস' ও 'কেব্‌ল' চিত্র দ্বারা অলঙ্কৃত এবং ইহার মধ্যস্থ ছিদ্রগাত্র একৈকভাবে চারিটি ক্ষুদ্র নগ্ন স্ত্রীমূর্তি ও হনিসাক্‌ল্ শাখার

ঊর্ধ্ব চিত্র দ্বারা শোভিত”।[১] নগ্ন স্ত্রীমূর্তিটির দেবী বা মাতৃকামূর্তি হওয়াই সম্ভব, কারণ লউড়িয়া নন্দনগড় নামক স্থানে (নেপাল তরাই প্রদেশে) খননকালে থিওডোর ব্লক কর্তৃক প্রাপ্ত সোনার পাতে খোদিত একটি অনুরূপ ক্ষুদ্র স্ত্রীমূর্তির সহিত ইহার প্রভূত সাদৃশ্য বর্তমান। ব্লক লউড়িয়া নন্দনগড়ের মূর্তিটিকে পৃথিবীদেবীর মূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আনন্দ কুমারস্বামী কর্তৃক প্রদত্ত ইহার মাতৃকাদেবী (mother goddess) রূপ পরিচয় অধিকতর গ্রহণযোগ্য। সিন্ধুঘাটীর পূর্বল্লিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃন্ময় মাতৃকামূর্তিগুলির সহিতও ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত এ জাতীয় নিদর্শনগুলি মনে হয় সেখানকার অধিবাসিগণের দ্বারা পূজার্থে ব্যবহৃত হইত, এবং এ পূজা ছিল শক্তি বা দেবী পূজা। গুপ্তোত্তর যুগের শক্তিউপাসকগণ যেমন তাঁহাদের পূজার জন্য ‘চক্র’ বা ‘যন্ত্র’ ব্যবহার করিতেন, এগুলিও খৃষ্টপূর্ব যুগের একজাতীয় দেবী-পূজকগণ কর্তৃক তাঁহাদের পূজাকার্যে ব্যবহৃত হইত। অতএব হরপ্পা ও মহেঞ্জো-ডারোর আলোচ্যমান ring stoneগুলিও যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এ জাতীয় নিদর্শন এই অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না।

উপরিলিখিত মূর্ত বা অমূর্ত দেবী-প্রতীকগুলির সহিত হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলমোহরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর তুলনা করা যাইতে পারে। উহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ

১ “It is of polished sandstone, 3¼″ in diameter, adorned on the upper surface with concentric bands of cross and cable patterns and with four nude female figures alternating with honeysuckle designs engraved in relief round the central hole.”—*Annual Report of the Archaeological Survey of India*, 1927-28, p. 66.

একটি চিত্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি অসম চতুষ্কোণ পোড়ামাটির শিলের উপরিভাগে প্রসারিত পদদ্বয় এক নগ্ন স্ত্রীমূর্তি উল্টাভাবে (মাথা নিচু ও পা উপরে) দেখানো আছে ; উহার যোনিদেশ হইতে শস্যপল্লব নির্গমনশীল ; মহেঞ্জো-ডারোর আদি-শিবের বহুবলয়ভূষিত হস্তদ্বয়ের ন্যায় ইহারও ভুজদ্বয় সুদূরপ্রসারিত। মার্শাল স্ত্রীমূর্তিটিকে দেবীমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদের নিকট ভিটা গ্রামে খননকালে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের একটি পোড়ামাটির শিলমোহরে খোদিত এক স্ত্রীমূর্তির সহিত ইহার তুলনা করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। এই মূর্তির সহিত হরপ্পা শিলের স্ত্রীমূর্তির আংশিক সাদৃশ্য বর্তমান ; ইহার হস্ত ও পদদ্বয় ঐরূপ ভাবে প্রসারিত, তবে শস্যপল্লব ইহার অধোদেশ হইতে বহির্গমনশীল দেখানো না হইয়া, একটি সনাল পদ্ম ইহার স্কন্ধদেশ হইতে বাহির হইতেছে এইরূপ দেখানো হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্তর্নিহিত ভাব একরূপ ; উহা এই যে দেবী খাদ্যশস্যের ধারিকা বা বাহিকা। খাদ্যশস্য ও উদ্ভিজ্জের জনয়িত্রী রূপে দেবীর রূপকল্পনা বাংলাদেশে প্রচলিত শারদীয়া দুর্গোৎসবে কি ভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে উহার পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হইবে। এ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের একনবতিতম অধ্যায়ের ৪৮-৯ সংখ্যক শ্লোকদ্বয়ে দেবীর যে শাকম্ভরী রূপের বর্ণনা দেওয়া আছে উহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেবী বলিতেছেন—

ততোঽহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি।

ইহার ভাবার্থ এই—'হে দেবগণ! অতঃপর অতিবৃষ্টির সময়ে আমি আমার নিজ দেহ হইতে বিনির্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্যসমূহের দ্বারা সমস্ত

জগতবাসীর ভরণপোষণ করিব; এ কারণে আমি বিশ্ববাসিগণের নিকট শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হইব।' এই যুক্তি অনুসরণ করিলে হরপ্পা শিলমোহরস্থ চিত্রটির অন্য ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাতে প্রদর্শিত স্ত্রীমূর্তির অধোদেশ হইতে একটি সর্প নির্গমনশীল, ও সর্পটি শিশ্নপ্রতীক। মহেঞ্জো-ডারো, হরাপ্পা প্রভৃতি স্থানের আরও কতিপয় শিলমোহরে চিত্রিত দৃশ্যাবলীতে বোধ হয় মাতৃকা বা দেবীর মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্যভয়ে উহার বিশদ বিবরণ এখানে দেওয়া হইল না।

প্রাক্-বৈদিক বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শনসমূহ হইতে কি ভাবে শক্তি-উপাসনার প্রাচীনত্ব বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যায় উহা এই মাত্র আলোচিত হইল। এখন প্রাচীন বৈদিক ও পরবর্তী কালের সাহিত্য আমাদিগকে শক্তিপূজার ক্রমবিকাশমান রূপ সম্বন্ধে যে পরিচয় দেয় উহার আলোচনা করা হইবে। পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে ইন্দ্র, সূর্য, রুদ্র, বায়ু বরুণাদি পুরুষ দেবতাগণেরই প্রাধান্য ছিল, এবং অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক স্ত্রীদেবতাই সূক্তসমূহে স্তুয়মান ছিলেন। ইঁহাদের উদ্দেশে সোমযাগ অনুষ্ঠিত হইবারও কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ম্যাকডোনেল তাঁহার *Vedic Mythology* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন, "স্ত্রীদেবতাগণ বৈদিক (ঋষিগণের) ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনায় অত্যন্ত গৌণ স্থান অধিকার করিতেন, এবং ব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্ত্রী হিসাবে তাঁহারা প্রায় কোনও অংশ গ্রহণ করেন নাই" (পৃঃ ১২৪)। কিন্তু ইহা অস্বীকার করা যায় না যে ইঁহারা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও চরিত্রবৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। বৈদিক ঋষিদের চিত্তে বিশেষ বিশেষ স্ত্রীদেবতার যে রূপকল্পনা উদিত হইয়াছিল, উহা অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর। অদিতি, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী, রাত্রি, পুরন্ধি, ইড়া, ধীষণা প্রভৃতি দেবীর এবং সর্বোপরি বাগ্দেবীর বৈদিক রূপ মনোযোগ সহকারে

বিশ্লেষণ করিলে, ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ঋষিগণ ইঁহাদের উপর ন্যূনাধিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন, যদিও সোমযাগে তাঁহাদের কোনও বিশিষ্ট অংশ ছিল না। অদিতি যেমন একদিকে দেবতাদিগের মাতা, তেমন অন্যদিকে তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননী। উষাদেবী প্রত্যূষ কালের মূর্ত প্রতীক, ইঁহার অপরূপ রূপবর্ণনায় ঋগ্বেদের ঋষিরা তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত কবিত্বশক্তি উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন। সরস্বতী মুখ্যতঃ ঐ নামের নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইলেও পরোক্ষভাবে জ্ঞান ও বিদ্যার দেবতা, কারণ উহারই তটবর্তী ভূখণ্ড আশ্রয় করিয়া একদল ঋষি বিশিষ্ট বৈদিক সংস্কৃতির একাংশের রূপদান করিয়াছিলেন। পৃথিবী ধরিত্রী মাতা, তিনি অনেক সূক্তে আকাশপিতার (দ্যৌস্পিতা) সহিত ঋষিদিগের দ্বারা স্তুত হইয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে যাহাতে জনগণকে শস্য, আহার্য দ্রব্যাদি ও ধনসম্পত্তি প্রদান করেন ইহাই ছিল ঋষিদিগের প্রার্থনা। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪তম সূক্তের ৩৩ সংখ্যক অনুবাকে ঋষি দীর্ঘতমা ঔচথ্য আকাশকে পিতা এবং মৃত্তিকাময় পৃথিবীকে মাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (দ্যৌর্মে পিতা জনিতা··· মাতা পৃথিবী মহীয়ং)। চন্দ্র ও তারকা কিরণরাশির দ্বারা উদ্দীপ্ত রজনী বৈদিক চিত্তে রাত্রিদেবীকে রূপায়িত করিয়াছিল ; কুশিক ঋষি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্তের মাত্র ৮টি অনুবাকে অতি নিপুণভাবে দেবীর রূপ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করিয়াছেন। পুরন্ধি প্রাচুর্যের দেবতা ; ইনি আবেস্তায় বর্ণিত ধনৈশ্বর্যের দেবী পারেন্দির বৈদিক প্রতিরূপ। ভগ, পূষা, সবিতা ইত্যাদি বৈদিক আদিত্য দেবতাগুলির সহিত তিনি কয়েকটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন। জার্মান পণ্ডিত Hillebrandtএর মতে তিনি ক্রিয়াশক্তির দেবতা। ধীষণাও প্রাচুর্যের দেবতা রূপে কল্পিত। ইড়া পুষ্টির দেবতা, এবং যেহেতু গব্য দুগ্ধ ও ঘৃতাদি পুষ্টিকর পেয় বৈদিক যজ্ঞাগ্নিতে দেবতাদিগের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করা হইত, সেহেতু ইড়া উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে গাভীর অন্যতম

প্রতিশব্দ বলিয়া ব্যবহৃত হইত। আপ্রী সূক্তসমূহে সরস্বতী ও মহী বা ভারতী দেবীর সহিত তিনি একত্রে প্রশংসিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি দেবী যথা রাকা, সিনীবালী, কুহূ, মরুদ্গণের মাতা পৃশ্নি, ত্বষ্টাদুহিতা ও বিবস্বৎপত্নী সরণ্যু প্রভৃতি দেবীর কথা সংহিতা ও উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে অল্পবিস্তর বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রাণী, বরুণানী, অগ্নায়ী প্রভৃতি দেবপত্নীগণের নামও কখনও কখনও মিলে, এবং রুদ্রাণীর নাম বৈদিক সূক্তসাহিত্যের পূর্বে কোথাও পাওয়া না যাইলেও, তিনি যে বেদোত্তর সাহিত্যে নানাবিধ নামে শক্তিপূজা সম্পর্কে এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বাক্‌দেবী ঋগ্বেদের মাত্র একটি সূক্তের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। দশম মণ্ডলস্থ ১২৫তম সূক্তের ঋষি তিনিই ; মাত্র আটটি অনুবাক সম্বলিত এই সূক্তটিতে 'শক্তি'র এমন এক সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে যাহা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক না করিয়া পারে না। গ্রীক দর্শনোক্ত Logosএর ন্যায় দেবী বাক্য বা শব্দের প্রতীক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হইলেও আমার মনে হয় অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্‌ দেবতা কর্তৃক দৃষ্ট ত্রিষ্টুপ ও জগতী ছন্দে গ্রথিত এই অষ্টসংখ্যক অনুবাক সংযুক্ত মন্ত্রে বিশ্বনিয়ন্ত্রিকা শক্তির যে প্রকৃত রূপ বর্ণিত হইয়াছে, এত অল্প পরিসরে উহা অপেক্ষা উন্নততর উপায়ে উহার বর্ণনা দেওয়া যাইতে পারে না। আমি সম্পূর্ণ সূক্তটি ও তাহার বঙ্গানুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা পাঠে আমার উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত হইবে—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে ॥২॥

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্ ।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥
ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ।
অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥৪॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আ বিবেশ ॥৬॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে ।
ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥৭॥
অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা ।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব ॥৮॥

বঙ্গানুবাদ—"আমি রুদ্রগণ ও বসুগণের সঙ্গে বিচরণ করি, আমি আদিত্যদিগের সঙ্গে এবং তাবৎ দেবতাদিগের সঙ্গে থাকি, আমি মিত্র ও বরুণ এই উভয়কে ধারণ করি, আমিই ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলম্বন করি ॥১। যে সোম আঘাত অর্থাৎ প্রস্তর নিষ্পীড়ন দ্বারা উৎপন্ন হয়েন, আমিই তাঁহাকে ধারণ করি, আমি ত্বষ্টা ও পূষা ও ভগকে ধারণ করি, যে যজমান যজ্ঞসামগ্রী আয়োজনপূর্বক এবং সোমরস প্রস্তুত করিয়া দেবতাদিগকে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট করে, আমি তাহাকে ধন দান করি ॥২। আমি রাজ্যের অধীশ্বরী, ধন উপস্থিত করিয়াছি, জ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞোপযোগী বস্তু-সকলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এতাদৃশ আমাকে দেবতারা নানা স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, আমার আশ্রয়স্থান বিস্তর, আমি বিস্তর প্রাণীর মধ্যে আবিষ্ট আছি ॥৩। যিনি দর্শন করেন, প্রাণধারণ করেন, অথবা অন্ন ভোজন করেন, তিনি আমারই সহায়তায় সেই সকল কার্য করেন। আমাকে যাহারা মানে না তাহারা ক্ষয় হইয়া যায়।

হে বিদ্বান! শ্রবণ কর, আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য ॥৪। দেবতারা এবং মনুষ্যেরা যাঁহার শরণাগত হয়, তাঁহার বিষয় আমিই উপদেশ দিই। যাহাকে ইচ্ছা আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান করিতে পারি ॥৫। রুদ্র যখন স্তোত্রদ্বেষী শত্রুকে বধ করিতে উদ্যত হয়েন, তখন আমিই তাঁহার ধনু বিস্তার করিয়া দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি। আমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে আবিষ্ট হইয়া আছি ॥৬। আমি পিতা আকাশকে প্রসব করিয়াছি। সেই আকাশ এই জগতের মস্তকস্বরূপ। সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার স্থান। সেই স্থান হইতে আমি সকল ভুবনে বিস্তৃত হই, আপনার উন্নত দেহ দ্বারা এই দ্যুলোককে আমি স্পর্শ করি ॥৭। আমিই তাবৎ ভুবন নির্মাণ করিতে করিতে বায়ুর ন্যায় বহমান হই। আমার মহিমা এতাদৃশ বৃহৎ হইয়াছে যে (ইহা) দ্যুলোককেও অতিক্রম করিয়াছে, পৃথিবীকেও অতিক্রম করিয়াছে ॥”৮।

(স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত ঋগ্বেদসংহিতা হইতে সূক্তটি ও উহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে।)

এই সূক্তটি বেদোত্তর সাহিত্যে দেবী-সূক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সূক্তান্তর্গত অনুবাক কয়টির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বৈদিক ঋষি সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছে উহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শক্তিই পরে নানা নামে শক্তিপূজার প্রধান উপাস্য দেবতা রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, এবং এ কারণ শাক্ত ধর্মকার্যে দেবীসূক্তের অংশ গুরুত্বপূর্ণ। স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে শান্তি ও স্বস্ত্যয়ন কামনায় চণ্ডীপাঠকালে রাত্রিসূক্ত পাঠের ন্যায় দেবী-সূক্ত পাঠ অবশ্য কর্তব্য। শক্তির নানাবিধ নামের কথা এখনই বলা হইল। ইহাদের যে গুলিকে আশ্রয় করিয়া শাক্ত উপাসনা প্রধানতঃ রূপ পাইয়াছিল, উহাদের নাম কিন্তু প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া

যায় না। ঋগ্বেদে বর্ণিত উল্লিখিত স্ত্রীদেবতাগুলির কোনওটিকেও কেন্দ্র করিয়া শক্তি উপাসনা অগ্রগতি লাভ করে নাই। অম্বিকা, উমা, দুর্গা, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীকে আশ্রয় বা কেন্দ্র করিয়া শাক্ত ধর্মাচার প্রতিষ্ঠিত হয় ইঁহাদের নামোল্লেখ উত্তর-বৈদিক সাহিত্য হইতেই আরম্ভ হয়। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতাতে আমরা প্রথম অম্বিকা দেবীর নাম পাই ; ইনি এখানে রুদ্রের ভগিনী বলিয়া বর্ণিত (এষ তে রুদ্র ভাগঃ সহ স্বস্রা অম্বিকয়া ; ৩. ৫৭)। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও তাঁহার এই পরিচয়, কারণ এখানে এই উদ্ধৃতিটিই পুনরুক্ত হইয়াছে (১. ৬. ১০, ৪-৫) ; কিন্তু অনুবাকটির দ্বিতীয় পংক্তি ভিন্নরূপ। ইহাতে শরৎ-কালের সহিত দেবীর তুলনা করা হইয়াছে, এবং বলা হইয়াছে যে রুদ্র তাঁহার ভগ্নীর এই রূপের সাহায্যেই যেন লোকদিগের প্রাণ সংহার করেন (ইত্যাহ। শরদ্ বৈ অস্য অম্বিকা স্বসা। তয়া বৈ এষ হিনস্তি)।[১] তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের অষ্টাদশ অনুবাকে কিন্তু রুদ্রকে অম্বিকাপতি বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে (অম্বিকাপতয়ে), এবং অম্বিকার এই পরিচয়ই পরবর্তী কালে স্থায়ী হইয়াছে। সায়ন ইহার ভাষ্যকালে অম্বিকাকে রুদ্রপত্নী জগন্মাতা পার্বতী আখ্যায় অভিহিত

১ বাজসনেয়ী সংহিতা হইতে উদ্ধৃত অনুবাকটির উপর ভাষ্য করিবার সময়, সায়ণ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের এই উক্তি অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে অম্বিকাই যেন শরৎকালের রূপ গ্রহণ করিয়া জ্বরাদি ব্যাধির সাহায্যে প্রাণী-দিগের হিংসা করেন (শরদ্রূপং প্রাপ্য জ (জ্ব) রাদিকমুৎপাদ্য তঞ্চ্ নিরোধিনঞ্চ্ হন্তি)। উক্ত সংহিতায় রুদ্রকে এই প্রসঙ্গে ত্র্যম্বক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ত্র্যম্বকের অপর রূপ স্ত্র্যম্বক ইহা অনুমান করিয়া অন্যত্র অম্বিকাকে রুদ্রের ভগিনী রূপে বলা হইয়াছে ; অম্বিকা হ বৈ নাম অস্য স্বসা। তয়া'স্য এষ সহ ভাগঃ। তদ্ যদ্ অস্য এষ স্ত্রিয়া সহ ভাগস্তস্মাৎ স্ত্র্যম্বকো নাম (S. B. ii. 6. 2. 9)।

করিয়াছেন (অম্বিকা জগন্মাতা পার্বতী তস্যা ভর্ত্রে)। দেবীর পাহাড় পর্বতের সহিত সংযোগ তাঁহার উমা রূপের একটি বিশেষণ হইতে বহুপূর্বকালে স্পষ্টতর হইয়াছিল। উমার প্রথম উল্লেখ আমরা কেন উপনিষদে পাই, এবং সেখানে (৩. ২৫) তিনি হৈমবতী (হিমবতের কন্যা) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার এ পরিচয় খুবই স্বাভাবিক, কারণ শতরুদ্রীয়ে রুদ্র গিরীশ ও গিরিত্র নামাদির দ্বারা অভিহিত। বলা বাহুল্য যে কেন উপনিষদে প্রাপ্ত উমার এই বিশেষণ পৌরাণিক যুগে তাঁহার গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যারূপ পরিচয় এবং তদাশ্রয়ী কিংবদন্তীসমূহের উৎস। এই উপনিষদে নির্দিষ্ট উমার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি রুদ্রপত্নী বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে বর্ণিত হন নাই; তিনি অগ্নি, বায়ু, ইন্দ্রাদি বৈদিক দেবতাদিগের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালিনী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী দেবী রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছেন।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত দুর্গা গায়ত্রী এখানে উল্লেখযোগ্য, কারণ ইহাতে দেবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাম দুর্গা বা দুর্গি এবং তাঁহার আরও কতকগুলি নামবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ত্রীটি এইরূপ—কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং (পাঠান্তর—কন্যাকুমারী) ধীমহি। তন নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ। ইহাতে দেবীর তিনটি নামই নূতন, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি পৌরাণিক শক্তি-পূজায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। কন্যাকুমারী দক্ষিণ ভারতের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থের নাম, এবং ইহার সমধিক প্রাচীনত্ব খৃষ্টীয় প্রথম শতকের এক অজ্ঞাতনামা যবন লেখকের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হয়। ইনি বলিয়াছেন যে, 'কোমরি নামক স্থানে কোমরি অন্তরীপ ও বন্দর অবস্থিত; এখানে সেই সকল ব্যক্তি (স্ত্রী ও পুরুষ) আসেন যাঁহারা তাঁহাদের উৎসর্গীকৃত (দেবীর উদ্দেশে ?) ও অকৃতদার জীবন যাপন করিতে ও (নিয়মিত সমুদ্র) স্নান করিতে ইচ্ছা করেন; কারণ ইহা কথিত আছে যে একটি

দেবী এক সময়ে এখানে বসবাস করিতেন এবং সমুদ্রে স্নান করিতেন'।[১] এই দেবীই যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকে উক্ত ও কুমারী কন্যা রূপে বর্ণিত কন্যাকুমারী দেবী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কাত্যায়নী নামের তাৎপর্য সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর জার্মান পণ্ডিত ওয়েবারের মত অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন যে কাত্য বংশীয় ব্রাহ্মণদিগের ইষ্টদেবী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার এই নামকরণ হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে দেবীর কৌশিকী নামেরও অনুরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত; রাত্রিসূক্তের ঋষি কুশিক, এবং যেহেতু কুশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের তিনি ইষ্টদেবী, সেহেতু দেবীর অন্য নাম কৌশিকী। কৃষ্ণযজুর্বেদ শাখাভুক্ত মৈত্রায়নীয় সংহিতায় শতরুদ্রীয় সূক্তগুলির উপক্রমণিকা হিসাবে তৎপুরুষ-মহাদেব, কুমার কার্তিকেয়, হস্তিমুখ (গণেশ), চতুর্মুখ ব্রহ্মা, কেশব-নারায়ণ, ভাস্কর-প্রভাকর প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতার গায়ত্রীর সহিত গিরিসুতা গৌরীর গায়ত্রীও পাওয়া যায়। এখানে দেবী-গায়ত্রী এইরূপ—তদ্-গাঙ্গৌচ্যায় বিদ্মহে গিরিসুতায় ধীমহি। তন্নো গৌরী প্রচোদয়াৎ। ইহাতে তাঁহার গিরিসুতা গাঙ্গ ও গৌরী রূপ প্রস্ফুটিত হইয়াছে; গৌরী ও গিরিসুতা নাম কেন উপনিষদের উমা হৈমবতীর সহিত তুলনীয়, এবং ইহারা যে সমপর্যায়ের সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে মৈত্রায়নীয় সংহিতার এই অংশ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের ন্যায় অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্য, কারণ দুইটিতেই লৌকিক ও পৌরাণিক দেবদেবীর স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে।

১ "...There is another place called Comari and a harbor; heither come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives, and bathe and dwell in celibacy; and women also do the same; for it is told that a goddess once dwelt here and bathed."—*Periplus of the Erythrean Sea* (W. H. Schoff's Edition, section 58, p. 46).

শক্তিপূজায় দেবীর যে দুইটি নাম, দুর্গা ও কালী, প্রধান স্থান অধিকার করে, উহাদের মধ্যে দুর্গা বা দুর্গি নামের প্রথম উল্লেখের কথা এইমাত্র বলা হইল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে দুর্গার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে উহা নানা কারণে গুরুত্ব-পূর্ণ। ইহা এইরূপ—

তাং অগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥

ইহার অর্থ—'অগ্নিবর্ণা তপপ্রদীপ্তা সূর্য (বা অগ্নির) কন্যা, যিনি কর্মফলের (পুরস্কার প্রদানের জন্য লোকদিগের দ্বারা) প্রার্থিত হন, এমন দুর্গা দেবীর আমি শরণাপন্ন হই; হে সুন্দর রূপে ত্রাণকারিণী, তোমাকে নমস্কার।' মহাকাব্য ও পুরাণাদি যুগের যে সকল দুর্গাস্তবে তাঁহার ত্রাণকারিণী ও সিদ্ধিদায়িকা রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে, উক্ত রূপ-বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রথম প্রকাশ আমরা এই অর্বাচীন বৈদিক সাহিত্যে পাই। উপরন্তু তাঁহার তপস্যা ও অগ্নি বা তেজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও এই অনুবাকে সুনির্দিষ্ট হইয়াছে। জার্মান পণ্ডিত ওয়েবার (Weber) দুর্গাকে যজ্ঞাগ্নির সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। দেবীর আর এক নাম কালী ও উহার অন্য রূপ করালী মুণ্ডক উপনিষদে প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ইহারা সপ্তজিহ্ব অগ্নির দুইটি জিহ্বার নাম রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঋষি বলিতেছেন—

কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানাঃ ইতি সপ্তজিহ্বাঃ॥
(মুণ্ডক উপনিষদ ১. ২, ৪)

কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী এবং বিশ্বরুচী এই সপ্ত নাম লেলায়মান অগ্নির এক বৈশিষ্ট্যসূচক বর্ণনা। নামগুলির নির্দিষ্ট সংখ্যা পরবর্তী কালের মাতৃকাগণের নামসংখ্যার

সহিত তুলনীয়; মাতৃকাগণও সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক। শিবপত্নী দুর্গার উগ্ররূপ হিসাবে কালী ও করালী পৌরাণিক যুগে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং এই ঘোররূপা দেবীর মন্দিরে নরবলি প্রদানের প্রথা ছিল। ভবভূতির মালতীমাধবে করালা চামুণ্ডার মন্দিরে তান্ত্রিক উপাসক কাপালিক অঘোরঘণ্টা কর্তৃক মালতীকে বলিদান করিবার প্রচেষ্টার কথা এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৬১)। ওয়েবার (Weber) এই তালিকার তৃতীয় নাম মনোজবার সহিত শুক্ল যজুর্বেদ শাখার বাজসনেয়ী সংহিতায় উক্ত (৫. ১১) মৃত্যুর দেবতা যমের অন্যতম অভিধা মনোজবসের তুলনা করিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন যে ইহা কি পরবর্তী যুগে দেবীকে যমের স্ত্রী রূপে পরিচিত করিয়াছিল? তাঁহার এ প্রশ্ন নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। কারণ পুরাণাদিতে উক্ত সপ্ত মাতৃকার শেষসংখ্যক মাতৃকা চামুণ্ডা যামী বা যমপত্নী বলিয়া কোথাও কোথাও বর্ণিত হইয়াছেন।

উপরিলিখিত নামগুলি ব্যতীত দেবীর অপর কয়টি নাম যথা ভদ্রকালী, শ্রী, ভবানী ইত্যাদি সাংখ্যায়ন ও হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্র প্রভৃতি শেষের স্তরের বৈদিক সাহিত্যনিচয়ে পাওয়া যায়। শ্রীদেবী যদিও এই নামে তান্ত্রিক শক্তি উপাসনায় কোনও প্রধান স্থান অধিকার করেন নাই, তথাপি ঐশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা রূপে তাঁহার ক্রমবিকাশ এ প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা আবশ্যক। কারণ শক্তিপূজায় তাঁহার অন্য নাম লক্ষ্মীর আর এক রূপ মহালক্ষ্মীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ঋগ্বেদে উক্ত সমৃদ্ধি, প্রাচুর্য ইত্যাদির দেবীদিগের কথা বলা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে শ্রীদেবীর নাম নাই। শতপথ ব্রাহ্মণেই বোধ হয় দেবী হিসাবে তাঁহার প্রথম প্রকাশ। ইহাতে লিখিত আছে যে বিশ্বসৃষ্টি ক্রিয়াহেতু বিশেষ ক্লান্ত প্রজাপতির দেহ হইতে শ্রীদেবীর উদ্ভব হয়। দেবীর অপরূপ সৌন্দর্যের দীপ্তিতে দেবতারা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে, প্রজাপতি

স্ত্রী অবধ্যা বলিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন, এবং তাঁহার নির্দেশানুযায়ী দেবীর রূপ, ঐশ্বর্য এবং বিবিধ গুণাবলী দেবতারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লন। পরে শ্রীদেবী প্রজাপতির উপদেশে দেবতাদিগকে বলি-প্রদানের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিজের যাবতীয় রূপ, গুণ, ঐশ্বর্যাদি তাঁহা-দিগের নিকট হইতে ফিরিয়া পান (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১. ৪. ১···)।[১] এই কাহিনী এবং তৈত্তিরীয় উপনিষদ ইত্যাদি গ্রন্থে শ্রীসম্বন্ধীয় উক্তি-সমূহ ইহাই প্রমাণিত করে যে সাধারণ মানবের কাম্য শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু মাত্রেরই প্রতীক রূপে দেবী কল্পিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদ পরিশিষ্টান্তর্গত শ্রীসূক্তের পঞ্চদশসংখ্যক অনুবাকগুলিতে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য মূর্ত হইয়াছে ; তাঁহার লক্ষ্মীনামও বোধ হয় সর্বপ্রথম ইহাতেই পাওয়া যায়। তিনি এখানে সুবর্ণরজত মালাভূষিতা হিরণ্যবর্ণা হরিণী রূপে বর্ণিত হইয়াছেন—

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্।
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদো মমাবহ॥

বৈদিক ও উত্তর-বৈদিক সাহিত্যে উক্ত দেবীর বিভিন্ন নামরূপাদির সম্বন্ধে উপরে আলোচিত তথ্যাদি হইতে বুঝা যায় যে তখন সুগঠিত পদ্ধতি হিসাবে শক্তিপূজা রূপ গ্রহণ করিয়া না থাকিলেও ইহার উপাদানগুলি সে সময়ে ধীরে ধীরে সংগৃহীত হইতেছিল। মহাকাব্যদ্বয়ে দেবী সম্বন্ধে যে সকল স্বল্পপ্রমাণ তথ্য পাওয়া যায় উহা আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে দেবীর সমষ্টিগত রূপকল্পনায় পূর্বকথিত উপাদান

১ শতপথ ব্রাহ্মণের এই কাহিনী আমাদিগকে জ্ঞান ও বীর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে কল্পিত গ্রীক দেবী Pallas Athenecর উৎপত্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গ্রীক কিংবদন্তী এই যে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত Zeus দেবতার মস্তক হইতে তেজোময়ী শস্ত্রবর্মে সজ্জিত Pallas Athenecর আবির্ভাব ঘটে।

ব্যতীত আরও বিভিন্নজাতীয় উপাদান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। মূল রামায়ণে শক্তিপূজা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও উল্লেখ নাই। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক রাবণবধার্থে অকালে দুর্গাপূজার যে কাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত আছে এবং যাহা এদেশে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত শারদীয়া দুর্গোৎসবের ভিত্তিস্বরূপ, উহার কথা কবি কৃত্তিবাস কর্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত রামায়ণ গ্রন্থেই পাওয়া যায়। কৃত্তিবাস কোথা হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। মূল সংস্কৃত রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডের ১০৬ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে রণক্লান্ত রাম রাবণবধের জন্য চিন্তাকুল হইলে অগস্ত্য ঋষি তাঁহাকে নিষ্ঠার সহিত আদিত্যহৃদয় স্তব পাঠ করিয়া সূর্যদেবের উপাসনা করিতে উপদেশ দেন, এবং রামচন্দ্র সেই উপদেশানুযায়ী কার্য করিলে রাবণবধে সমর্থ হন। রামায়ণ ও মহাভারতের বিভিন্ন অংশে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের উল্লেখ থাকিলেও, সেগুলি প্রায়ই কিংবদন্তীমূলক; উহা হইতে দেবীপূজার প্রসার বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কিন্তু মহাভারতের দুইটি দুর্গাস্তোত্রে এবং উহার পরিশিষ্ট হরিবংশের অন্তর্ভুক্ত আর্যাস্তবে শক্তিপূজকের ইষ্টদেবীর যে পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় উহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিরাট পর্বান্তর্গত যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তব (মহাভারত, ৪. ৬) মহাকাব্যটির সব সংস্করণে পাওয়া যায় না বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এই স্তবটির সহিত ভীষ্মপর্বস্থ অর্জুন কৃত দুর্গাস্তোত্র (মহাভারত, ৬. ২৩) এবং হরিবংশে উদ্ধৃত আর্যাস্তব একত্রে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে পরিশিষ্ট সহিত মহাভারতের বর্তমান রূপ পরিগ্রহের বেশ কিছু পূর্বে শাক্ত সাধকের ইষ্টদেবতার পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিত E. Washburn Hopkinsএর মতে পূর্ণাঙ্গ মহাভারত গুপ্তযুগ আরম্ভ হইবার কিছু পূর্বে রূপ পাইয়াছিল। এ অনুমান যুক্তিপূর্ণ, এবং ইহা হইতে দেবীর পূর্ণ রূপ বিকাশের কাল খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের সমকালীন

বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দেবীর এই বিকশিত চরিত্রায়নে তাঁহার পূর্বোক্ত মাতা, কন্যা, ভগিনী রূপ এবং কুশিক কাত্যাদি ঋষিগোত্রীয় ইষ্টদেবী প্রভৃতি বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণ ত দেখানো হইয়াছেই, পরন্তু বহু অনার্য জাতি পূজিত তাঁহার দেবী রূপটির কথাও স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে; তিনি যে তাঁহার ভক্তগণকে নানা বিপদ হইতে রক্ষা করেন উহাও বলা হইয়াছে।[১]

মহাভারত পরিশিষ্ট হরিবংশের বিষ্ণুপর্বস্থ তৃতীয় অধ্যায়ে উদ্ধৃত আর্যাস্তব দেবীপরিচিতি সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর অনুমান করিয়াছিলেন যে বিরাটপর্বস্থ যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তব ইহারই সংক্ষিপ্তসার। আর্যাস্তবে চিত্রিত দেবীচরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এরূপ ব্যাপক অথচ সুবিন্যস্ত আকারের যে আমি ইহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ইহার সংস্কৃত

১ যুধিষ্ঠিরকৃত দুর্গাস্তবে তাঁহাকে নারায়ণবরপ্রিয়া, নন্দগোপকুলে জাতা, কুলবর্দ্ধিনী, কংসবিদ্রাবণকরী, অসুরনাশিনী প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি কুমারী, ব্রহ্মচারিণী এবং কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়া ত্রিদিব পালন করিয়াছিলেন (কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পালিতং ত্বয়া)। বিন্ধ্যপর্বতে তাঁহার বাস, তিনি কালী ও মহাকালী, রক্ত-মাংস ও পশুবলি তাঁহার প্রিয়, যেহেতু তিনি নানাবিধ দুর্গতি হইতে তাঁহার ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন সেহেতু তাঁহার অন্য নাম দুর্গা। অর্জুনকৃত দুর্গাস্তবে তিনি আর্যা, মন্দরবাসিনী, কুমারী, কালী, কাপালী, ভদ্রকালী, মহাকালী, চণ্ডী, কাত্যায়নী, করালী, শিখিপিচ্ছধ্বজধারিণী, মহিষাসৃক্‌প্রিয়া, কৌশিকী, গোপেন্দ্রের (বাসুদেব-কৃষ্ণের) অনুজা, নন্দগোপকুলোদ্ভবা, কোকমুখা, শাকম্ভরী, ব্রহ্মবিদ্যা, বেদশ্রুতি, সাবিত্রী, বেদমাতা, স্কন্দমাতা প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এই নামগুলি মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করিলে পূর্ণাঙ্গ দেবীচরিত্রের বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্যগুলির বিষয় সম্যক্‌রূপে জানা যায়।

ভাষা এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে আমি উহার বঙ্গানুবাদ প্রদান আবশ্যক মনে করিলাম না।—

আর্যাস্তবং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা।
নারায়ণীং নমস্যামি দেবীং ত্রিভুবনেশ্বরীম্॥
ত্বং হি সিদ্ধির্ধৃতিঃ কীর্তিঃ শ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা কালরাত্রিস্তথৈব চ॥
আর্যা কাত্যায়নী দেবী কৌশিকী ব্রহ্মচারিণী।
জননী সিদ্ধসেনস্য উগ্রচারী মহাবলা॥
জয়া চ বিজয়া চৈব পুষ্টিস্তুষ্টিঃ ক্ষমা দয়া।
জ্যেষ্ঠা যমস্য ভগিনী নীলকৌশেয়বাসিনী॥
বহুরূপা বিরূপা চ অনেকবিধিচারিণী।
বিরূপাক্ষী বিশালাক্ষী ভক্তানাং পরিরক্ষিণী॥
পর্বতাগ্রেষু ঘোরেষু নদীষু চ গুহাষু চ।
বাসস্তব মহাদেবি বনেষূপবনেষু চ॥
শবরৈর্ববরৈশ্চৈব পুলিন্দৈশ্চ সুপূজিতা।
ময়ূরপিচ্ছধ্বজিনী লোকান্ ক্রমসি সর্বশঃ॥
কুক্কুটৈশ্ছাগলৈর্মেষৈঃ সিংহৈর্ব্যাঘ্রৈঃ সমাকুলা।
ঘণ্টানিনাদবহুলা বিন্ধ্যবাসিন্যভিশ্রুতা॥
ত্রিশূলী পট্টিশধরা সূর্যচন্দ্র পতাকিনী।
নবমী কৃষ্ণপক্ষস্য শুক্লস্যৈকাদশী তথা॥
ভগিনী বলদেবস্য রজনী কলহপ্রিয়া।
আবাসঃ সর্বভূতানাং নিষ্ঠা চ পরমা গতিঃ॥
নন্দগোপসুতা চৈব দেবানাং বিজয়াবহা।
চীরবাসা সুবাসাশ্চ রৌদ্রী সন্ধ্যাচরী নিশা॥
প্রকীর্ণকেশী মৃত্যুশ্চ সুরামাংসবলিপ্রিয়া।
লক্ষ্মীরলক্ষ্মীরূপেণ দানবানাং বধায় চ॥
সাবিত্রী চাপি দেবানাং মাতা মন্ত্রগণস্য চ।
কন্যানাং ব্রহ্মচর্য ত্বং সৌভাগ্যং প্রমদাসু চ॥

অন্তর্বেদী চ যজ্ঞানাং ঋত্বিজাং চৈব দক্ষিণা।
কর্ষকাণাং চ সীতেতি ভূতানাং ধরণীতি চ॥
সিদ্ধি সাংযাত্রিকাণাং তু বেলা ত্বং সাগরস্য চ।
যক্ষাণাং প্রথমা যক্ষী নাগানাং সুরসেতি চ॥
ব্রহ্মবাদিন্যথো দীক্ষা শোভা চ পরমা তথা।
জ্যোতিষাং ত্বং প্রভা দেবি নক্ষত্রাণাং চ রোহিণী॥
রাজদ্বারেষু তীর্থেষু নদীনাং সঙ্গমেষু চ।
পূর্ণা চ পূর্ণিমা চন্দ্রে কৃত্তিবাসা ইতি স্মৃতা॥
সরস্বতী চ বাল্মীকে স্মৃতির্দ্বৈপায়নে তথা।
ঋষিণাং ধর্মবুদ্ধিস্তু দেবানাং মানসী তথা।
সুরা দেবী তু ভূতেষু স্তূয়সে ত্বং স্বকর্মভিঃ॥
ইন্দ্রস্য চারুদৃষ্টিস্ত্বং সহস্রনয়নেতি চ।
তাপসানাং চ দেবী ত্বমরণী চাগ্নিহোত্রিণাম্॥
ক্ষুধা চ সর্বভূতানাং তৃপ্তিস্ত্বং দৈবতেষু চ।
স্বাহা তৃপ্তির্ধৃতির্মেধা বসুনাং ত্বং বসুমতী॥
আশা ত্বং মানুষাণাঞ্চ পুষ্টিশ্চ কৃতকর্মণাম্।
দিশশ্চ বিদিশশ্চৈব তথা হ্যগ্নিশিখা প্রভা
শকুনী পুতনা ত্বঞ্চ রেবতী চ সুদারুণা।
নিদ্রাপি সর্বভূতানাং মোহিনী ক্ষত্রিয়া তথা॥
বিদ্যানাং ব্রহ্মবিদ্যা ত্বমোঙ্কারোথ বষট্ তথা।
নারীণাং পার্বতীঞ্চ ত্বাং পৌরাণীমৃষয়ো বিদুঃ।
অরুন্ধতী চ সাধ্বীনাং প্রজাপতি বচো যথা।
যথার্থনামভির্দিব্যৈরিন্দ্রাণী চেতি বিশ্রুতা।
ত্বয়া ব্যাপ্তমিদং সর্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমম্॥
সংগ্রামেষু চ সর্বেষু অগ্নিপ্রজ্বলিতেষু চ।
নদীতীরেষু চৌরেষু কান্তারেষু ভয়েষু চ॥
প্রবাসে রাজবন্ধে চ শত্রূণাঞ্চ চ প্রমর্দনে।
প্রাণাত্যয়েষু সর্বে ত্বং হি রক্ষা ন সংশয়ঃ॥

ত্বয়ি মে হৃদয়ং দেবি ত্বয়ি চিত্তং মনস্তয়ি।
রক্ষ মাং সর্বপাপেভ্যঃ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥

উপরে উদ্ধৃত স্তবের সপ্তবিংশতিসংখ্যক শ্লোকে দেবীর যে বিচিত্র চরিত্র্যবৈশিষ্ট্য রূপায়িত হইয়াছে উহা আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদগীতার দশম অধ্যায়স্থ ভগবান বাসুদেব-কৃষ্ণের বিভূতিযোগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই স্তবের রচয়িতা যে একজন নিষ্ঠাবান শক্তিসাধক ছিলেন ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে। ভক্তকবি তাঁহার ইষ্টদেবীর রূপবৈচিত্র্যের যে বিভিন্ন প্রকাশ এই শ্লোক কয়টিতে দেখাইয়াছেন এখানে উহার প্রত্যেকটির আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না; মনে হয় এ ক্ষেত্রে উহার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। আমি মাত্র দুএকটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। স্তবকর্তা দেবীর জননী, ভগিনী ও কুমারী রূপগুলির এবং তাঁহার বৈদিক প্রতিরূপের বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্যতম বিশিষ্ট প্রকাশ যে বহু অনার্য জাতি পূজিত দেবী রূপের মধ্যে বর্তমান ইহা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন। পর্বতগুহায়, নদীতীরে ও বনমধ্যে তিনি শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিগণের দ্বারা পূজিত; তিনি বিন্ধ্যবাসিনী, তাঁহার বাসস্থান কুক্কুট, ছাগল, মেষ, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি পশুগণের দ্বারা পূর্ণ; ময়ুরপিচ্ছ তাঁহার অন্যতম লাঞ্ছন। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে অন্যত্র তিনি অপর্ণা নামে বিখ্যাত; অপর্ণার অর্থ যিনি এমন কি পত্র-বল্কলাদি পর্যন্ত পরিধেয়বিহীন, অর্থাৎ যিনি বিবসনা। তাঁহার অন্যত্র প্রদত্ত নাম ত্রয়, শবরী, পর্ণশবরী ও নগ্নশবরী তাঁহাকে অনার্য শবর জাতির ইষ্টদেবী রূপে চিহ্নিত করে। পর্ণশবরী অর্থে শবরদের দ্বারা পূজিত দেবী, যাঁহার পরিধেয় মাত্র পত্র। মহাযান বৌদ্ধমতে পর্ণশবরী অক্ষোভ্য এবং অমোঘসিদ্ধি নামক ধ্যানী বুদ্ধদ্বয় হইতে উদ্ভুত। এই দেবীকে যে মহাযানী বৌদ্ধগণ তাঁহাদের বৈচিত্র্য-

পূর্ণ সাধনার জন্য অনার্য শবরদিগের নিকট হইতে লইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার নাম ও ধ্যানবৈশিষ্ট্য (পর্ণপিচ্ছিকাবসনাং, পর্ণপিচ্ছিকা ধনুর্ধারিণীং, সপত্রমালাব্যাঘ্রচর্মনিবসনাং) ইহা প্রমাণিত করে। নগ্নশবরী অর্থে দিগ্বসনা শবরী দেবীকেই বুঝায়। বরাহ পুরাণের এক অংশে (২৮. ৩৪) তিনি কিরাতিনী নামে আখ্যাত হইয়াছেন; কিরাতগণ ভারতবর্ষের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তের অধিবাসী আর্যেতর জাতি। দেবীচরিত্রের অপর এক বৈশিষ্ট্য ত্রাণকর্ত্রী রূপে তাঁহার কল্পনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত যে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে পাওয়া যায় ইহা একটু আগে বলিয়াছি। আর্যাস্তব ও উহার সংক্ষিপ্তসার বিরাটপর্বস্থ দুর্গাস্তবে ইহার বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। প্রথমটি হইতে আমরা জানিতে পারি যে দেবী তাঁহার ভক্তগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে, অগ্নিদাহে, নদীতীরে, কান্তারে, প্রবাসে, রাজরোষে, তস্কর ও শত্রুসঞ্জাত ভয়ে রক্ষা করেন। দ্বিতীয়টিও প্রায় অনুরূপ ভয়সমূহ হইতে দেবী কর্তৃক তাঁহার ভক্তগণকে ত্রাণ করার কথা বলে।[১] দেবীর আর এক নাম তারা। মহাযানী বৌদ্ধমতে ইনি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের পত্নী; ইহার আর এক নাম অষ্ট মহাভয়তারা, কারণ তিনি ভক্ত সাধককে অষ্ট মহাভয় হইতে ত্রাণ করেন। অগ্নিভয়, দস্যুভয়, বন্ধনভয়, মজ্জনভয়, সর্পভয়, ইত্যাদি অষ্টবিধ মহাভয়ের তালিকা অনেকাংশে মহাভারতের উপরোক্ত স্তব দুইটির ভয়ের তালিকার অনুরূপ।[২]

---

১ কান্তারেষ্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে। দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমা নৃণাম্॥ জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেষ্বটবীষু চ। যে স্মরন্তি মহাদেবি ন চ সীদন্তি তে নরাঃ॥ মহাভারত, বিরাটপর্ব, ষষ্ঠ অধ্যায়, ২০-২।

২ শ্রীমতী দেবলা মিত্র তাঁহার অষ্টমহাভয় তারা নামক প্রবন্ধে তারা দেবীর এই বিশিষ্ট রূপের বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সদ্ধর্মপুণ্ডরীক

মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের অন্তর্গত কয়েকটি দেবীস্তুতি, যথা ব্রহ্মা স্তুতি, শক্রাদি স্তুতি, বিষ্ণুমায়া স্তব ও নারায়ণী স্তুতিতে, তাঁহার রূপের কতকগুলি বৈশিষ্টের উপর সমধিক গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছে। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ বারে বারে মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি দৈত্য ও অসুরগণের দ্বারা বিমর্দিত হইলে এই সকল স্তব করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিয়াছিলেন, এবং দেবী সুরারিগণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন। মধু ও কৈটভকে বিনাশ করিয়াছিলেন বিষ্ণু, কিন্তু যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া যখন ভয়াকুল ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া নিদ্রাবশ বিষ্ণুকে ত্যাগ করেন, তখনই তিনি মধু ও কৈটভকে নিধন করিতে সমর্থ হন। ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে বিশ্বাত্মিকা শক্তির অনবদ্য রূপ কল্পনাব কথা আগে বলা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের এই অংশে (৮২তম অধ্যায়ের প্রথম ভাগে) উক্ত হইয়াছে যে মহিষাসুরের অত্যাচারে উৎপীড়িত দেবতারা মধুসূদন (বিষ্ণু) ও মহাদেবের নিকট তাঁহাদের দুঃখ দুর্দশার কথা নিবেদন ও ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। কোপপূর্ণ বিষ্ণুর ও শিবের এবং এমনকি ব্রহ্মারও বদন হইতে যে তেজোরাশি বিনির্গত হয়, এবং অন্যান্য দেবগণের শরীর হইতেও যে সুমহৎ তেজ বিচ্ছুরিত হয় উহা একত্র পুঞ্জীভূত হয়। এই পুঞ্জীভূত অতুল ত্রিলোক-ব্যাপী তেজোরাশি এক নারীরূপ ধারণ করে (অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেব শরীরজম্। একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা)। দেবশক্তিজাত এই নারীই দেবী, এবং তাঁহার সর্বাবয়ব শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, যম, সূর্য প্রভৃতি দেবতাদিগের তেজ হইতেই উৎপন্ন হয়। দেবতাগণ

—

নামক মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব সম্বন্ধেও অনুরূপ মহাভয় সকল হইতে তাঁহার উপাসকগণকে রক্ষা করার কথা লিখিত আছে; J. A. S, 1957, pp. 20-2.

তখন তাঁহাকে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ প্রহরণসমূহ ও বসনভূষণাদি দান করেন। এই একত্রীভূত দেবশক্তিই ঘোরতর সংগ্রামের পরে মহিষাসুর এবং অন্যান্য অসুর বধ করেন। পুরাণকার বলিতেছেন—

ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাম্।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষাদিতাঃ॥

সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী দেবী মহামায়ার উৎপত্তি, স্বভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু সুরথ রাজার প্রশ্নের উত্তরে ঋষি মেধস যথার্থই বলিয়াছিলেন যে যদিও দেবী নিত্যা ও সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত তথাপি তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত, আপনি আমার নিকট উহা শ্রবণ করুন (নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্। তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধা শ্রূয়তাং মম)। ঋষি তাঁহার মহিষাসুরনাশিনী, চণ্ডমুণ্ডবিঘাতিনী, শুম্ভনিশুম্ভহন্ত্রী প্রভৃতি বিবিধ রূপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া দুইটি দুর্গাস্তোত্র ও আর্যাস্তব অনুশীলন করিলে দেবীর বিচিত্র চরিত্রের যে নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করা যায় উহার কথা বলা হইয়াছে। তবে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণান্তর্গত দেবীস্তুতিগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে পুরাণকার দেবীর অনার্যগণ পূজিত রূপ সম্বন্ধে মহাকাব্য-রচয়িতৃগণের পন্থা সাধারণতঃ অনুসরণ করেন নাই। তিনি ইহার স্পষ্ট উল্লেখ কোথাও করেন নাই। তবে উঁহাদের ন্যায় তিনি দেবীর বৈদিক রূপ, তাঁহার সৌম্য ও উগ্র রূপ, জননী, ভগিনী ও দুহিতা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ইত্যাদির কথা বিশদভাবে বলিয়াছেন। পৌরাণিক স্তুতিগুলির মধ্যে নারায়ণী স্তুতিই (৯১তম অধ্যায়) সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক আকারের ; ইহাতে দেবীর বিশ্বাধার বিশ্ববীজ বৈষ্ণবী শক্তি, মাতৃকা (এখানে ইহাদের সংখ্যা ৯, ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐন্দ্রী বা

ইন্দ্রাণী ও চামুণ্ডা রূপের সহিত নারসিংহী ও শিবদূতী রূপ দুইটি সংযুক্ত হইয়াছে), লক্ষ্মী, নারায়ণী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, দুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের স্তব করা হইয়াছে। নারায়ণী স্তুতির শেষ ১৪টি শ্লোক দেবীর উক্তি; এগুলিতে তিনি যে বিভিন্ন যুগে বিন্ধ্যবাসিনী, রক্তদন্তিকা, শতাক্ষী, শাকম্ভরী, দুর্গা, ভীমা, ভ্রামরী প্রভৃতি নানাবিধ নামে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বকল্যাণ ও দানবনিধন করিয়াছিলেন ইহার কথা সংক্ষেপে বলিয়াছেন। সর্বশেষ শ্লোকটি এইরূপ—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌॥

ইহা আমাদিগকে স্বতঃই শ্রীমদ্ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়স্থ শ্রীভগবানের অবতারবিষয়ক বাসুদেব-কৃষ্ণের উক্তির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রুদ্র-শিবপত্নী অম্বিকা বা উমা-দুর্গা-পার্বতী রূপে দেবীর পূজা যে উত্তর-বৈদিক কাল হইতে ন্যূনাধিক প্রচলিত ছিল উহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। মহাভারত ও পুরাণাদিতে বর্ণিত দক্ষযজ্ঞ কাহিনীর প্রধান বিষয়বস্তু হইল পতিনিন্দাশ্রবণে শিবপত্নী সতীর দেহত্যাগ। জায়ার মৃত্যুতে শোকবিহ্বল দেবতা সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে বিষ্ণু শিবকে নিজ কর্তব্য পালনে অবহিত করাইবার নিমিত্ত সুদর্শনচক্র দ্বারা সতীর মৃতদেহ খণ্ডীকৃত করেন, এবং দেবীর দেহের খণ্ড খণ্ড অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি বিভিন্ন স্থানে পতিত হয়। কিন্তু শিবের পত্নীপ্রেম এত তীব্র ও গভীর ছিল যে যেখানে যেখানে তাঁহার প্রিয়তমার দেহাংশগুলি পড়ে, সেই সেই স্থানে তিনি ভৈরব রূপে অবস্থান করিয়া ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রিয়া-সাহচর্য উপভোগ করিতে থাকেন। ইহাই মহাকাব্য ও পুরাণোক্ত শক্তিপীঠ পূজার উৎপত্তি-বিষয়ক কাল্পনিক কাহিনী। কিন্তু ইহা যে আদি মধ্যযুগ হইতে দীক্ষিত

শক্তিসাধকের ইষ্টদেবীর পূজায় এক বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া ইহার উত্তর ও পূর্বভাগে, এই সকল পীঠস্থান অদ্যাবধি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এবং প্রতি পীঠে দেবীর মন্দির বা অনুরূপ পূজাস্থান ও ভৈরবের আলয় অবস্থিত। যদিও বঙ্গদেশীয় শক্তিপূজকদিগের মধ্যে শাক্ত পীঠের সংখ্যা ৫১ বলিয়া সাধারণতঃ নির্দিষ্ট আছে, তথাপি শক্তিপূজা সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থে ও কয়েকটি পুরাণে ইহার ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যার কথা বলা আছে।[১] এই সকল মন্দিরে বা পূজাস্থানে প্রায়ই দেবীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিভূ হিসাবে অমূর্ত প্রতীক ও শিবলিঙ্গ (ভৈরবের প্রতীক) প্রতিষ্ঠিত থাকে। পীঠপূজার কল্পনা যে কত প্রাচীন উহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে মহাভারতের বনপর্বস্থ তীর্থযাত্রাপর্বাধ্যায়ে দেবীর দুই প্রত্যঙ্গ, যোনি ও স্তনের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটি শাক্ত পীঠের পরোক্ষ উল্লেখ পাওয়া যায়। পীঠগুলির সহিত পবিত্র কুণ্ড বা বৃহৎ জলাশয় সংযুক্ত থাকে; মহাকাব্যের এই অংশে দুইটি যোনিকুণ্ড ও একটি স্তনকুণ্ডের কথা বলা হইয়াছে।

যোনিকুণ্ডদ্বয়ের একটি পঞ্চনদের বাহিরে ভীমাস্থানে এবং অপরটি উদ্যত্পর্বত নামক গিরিশিখরে অবস্থিত। ভীমাস্থানস্থ যোনিকুণ্ড সম্বন্ধে মহাকাব্যের বর্ণনা এইরূপ—ততো (পঞ্চনদের অপর পারে) গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্। তত্র স্নাত্বা তু যোন্যাং বৈ নরো ভরত সত্তম। দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্রাজন্ রত্নকুণ্ডল-বিগ্রহঃ (মহাভারত,

১ Dr. D. C. Sircar তাঁহার সুলিখিত 'Śāktapīthas' নামক প্রবন্ধে (*J. R. A. S. B.* Letters, XIV) এই বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা করিয়াছেন। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিসংগ্রহভুক্ত পীঠনির্ণয় বা মহাপীঠনির্ণয় নামক ক্ষুদ্র একটি শাক্ত গ্রন্থ সম্পাদনা প্রসঙ্গে ইহা করিয়াছেন। শাক্ত গ্রন্থটি তন্ত্রচূড়ামণি নামক বৃহত্তর তান্ত্রিক গ্রন্থের অংশবিশেষ বলিয়া গৃহীত।

বনপর্ব, ৮২, ৮৪-৫)। স্তনকুণ্ড গৌরীশিখর নামক পর্বতশৃঙ্গের উপরে অবস্থিত ছিল। শ্রীযুক্ত দিনেশচন্দ্র সরকারের মতে ইহা আসাম প্রদেশস্থ গৌহাটির নিকটস্থিত কোনও পর্বতশৃঙ্গ। উদ্যত্পর্বতের অবস্থান বিষয়ে সঠিক কিছু জানা নাই, তবে ইহা বিহার প্রদেশের গয়ার সন্নিকট কোনও পর্বত হইতে পারে।

ভীমাস্থান সম্বন্ধে আরও প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগে ভারত পরিভ্রমণকারী চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁহার সি-ইউ-কি গ্রন্থে গন্ধার পরিক্রমার বিবরণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে 'প্রাচীন গন্ধার প্রদেশের (ভারত সম্বন্ধীয় বৈদেশিক লেখকগণের মতানুযায়ী ইহা বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ার জিলার প্রাচীনকালে প্রচলিত নাম) মধ্যস্থলে ভীমাদেবী পর্বত নামে একটি বৃহৎ পর্বতশৃঙ্গ ছিল। ইহার উপরে মহেশ্বরের পত্নী ভীমাদেবীর গাঢ় নীলবর্ণের প্রস্তরের এক প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্থানীয় জনগণের মতে দেবীর প্রতিকৃতিটি অকৃত্রিম (natural image), এবং ইহার মন্দির ভারতের সকল অংশের দেবীপূজকগণের পবিত্র গন্তব্য বা দ্রষ্টব্য স্থান ছিল। পর্বতের সানুদেশে মহেশ্বরদেবের এক মন্দির ছিল ; এখানে ভস্মলিপ্ত তীর্থিকগণ (ইহারা যে পাশুপত তাহা সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছি) বিশেষ পূজা করিতেন।'[১] ফরাসী

---

১ 'There was a great mountain-peak in the heart of ancient Gandhāra (modern Peshwar district), which possessed a likeness or image of Maheśvara's spouse Bhīmādevī of dark blue stone. According to local accounts, this was a natural image of the goddess; it was a great resort of devotees from all parts of India. At the foot of the mountain was a temple to Maheśvara-deva in which the ash-smearing Tīrthikas performed much worship.'—Watters, *On Yuan Chwang*, Vol. I, pp. 221—22.

পণ্ডিত Alfred Foucher প্রমাণ করিয়াছেন যে বর্তমান পেশোয়ার জিলার কারামার পর্বতই সেকালের ভীমাদেবী পর্বত বা ভীমাস্থান, এবং পর্বত-সানুদেশস্থ শিব বা ভৈরবস্থান এখনকার শেবা নামক ক্ষুদ্র গ্রাম। এ প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে চীন পরিব্রাজক তাঁহার নিজস্ব ভঙ্গীতে আমাদিগকে ভৈরব স্থান সম্বলিত একটি প্রাচীন শাক্ত পীঠ সম্বন্ধে অতি মূল্যবান তথ্য প্রদান করিয়াছেন। ভীমাদেবীর অকৃত্রিম প্রতিকৃতি আমার মনে হয় তাঁহার প্রস্তরময় অমূর্ত প্রতীক ব্যতীত আর কিছুই নহে। এখানে বলা আবশ্যক যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে গন্ধার প্রদেশস্থ একটি শাক্ত পীঠ ভারতবিখ্যাত থাকিলে, পীঠপূজার প্রবর্তন যে ইহার বহু পূর্বে হইয়াছিল, এই অনুমান অসঙ্গত হয় না। এ অনুমানের পরোক্ষ সমর্থন আমার মনে হয় খৃষ্টাব্দ প্রবর্তনের কিছু পরে রচিত মহামায়ূরী নামক মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ইহার কথা শিবপূজার ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আমি কিছু বলিয়াছি। বৌদ্ধ গ্রন্থকার ভীষণ বা ভীষণা ও ইহার যক্ষ বা অন্যতম বাস্তুদেবতা শিবভদ্রের কথা বলিয়াছেন (শিবঃ শিবপুরাহারে শিবভদ্রশ্চ ভীষণে ; মহামায়ূরী, শ্লোক-সংখ্যা ২৮)। ভীষণ বা ভীষণা যে ভীম বা ভীমার প্রতিশব্দ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফরাসী পণ্ডিত Sylvain Levi উক্ত গ্রন্থস্থ শিবপুরের সহিত পতঞ্জলি লিখিত উদীচ্য গ্রাম শিবপুর বা শৈবপুরের ঐক্যের কথা বলিয়াছেন (*Journal Asiatique*, 1915, p. 37)। এ মত গ্রহণযোগ্য, এবং এই মতানুযায়ী ভীষণ বা ভীষণাও ভারতের উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই যুক্তি অনুসারে মহামায়ূরী গ্রন্থেও ভীমাস্থানস্থ শাক্ত পীঠ সম্বন্ধে পরোক্ষ ইঙ্গিতের অস্তিত্ব বিষয়ক অনুমান অসঙ্গত না হইতে পারে। মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের নারায়ণীস্তুতিতেও দেবী নিজের বিভিন্ন অবতারের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ভীমারূপের কথা এইভাবে বলিয়াছেন—

পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ।
তদা মাং মুনয়ঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥

অধ্যায় শেষে দেবীর মূর্তিসমূহের মধ্যে কয়েকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইবে। শক্তি-উপাসক তাঁহার উপাস্য দেবতাকে যে কত বিভিন্ন প্রকারে ভাবনা করিতেন উহা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার ধ্যানধারণাদির সৌকর্যার্থে ইষ্টদেবীর নানাবিধ মূর্তি নির্মাণ করাইয়া পূজাকার্যে ব্যবহার করিতেন। গোপীনাথ রাও আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র, কয়েকটি পুরাণ ও উপপুরাণ, শিল্পরত্ন, রূপমণ্ডন, বিশ্বকর্মশাস্ত্র ইত্যাদি মূর্তিতত্ত্বসম্বলিত শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার গ্রন্থ হইতে এই জাতীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে বর্ণিত সর্বপ্রকার মূর্তি যে পাওয়া যায় এমন নহে, তবে এই বিশদ সঙ্কলন পাঠ করিলে মনে হয় দেবীমূর্তিসমূহ কত বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল। দেবীর যেসব অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায়, উহাদিগের মধ্যে মহিষাসুরমর্দিনী, মাতৃকা (সাধারণতঃ সপ্তসংখ্যক), সিংহবাহিনী, উমা-পার্বতী, একানংশা, মহামায়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। দেবী-মাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবীর মহিষাসুরবধ কাহিনী সুপ্রাচীনকাল হইতে ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পে রূপায়িত হইয়া আসিতেছে। মধ্যযুগীয় মূর্তিতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থাদিতে দুর্গার এই রূপের বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; বর্ণনার পার্থক্য স্থূলতঃ দেবীর হস্তসংখ্যার উপর নির্ভর করে। দুর্গার আর এক নাম অষ্ট- বা দশভুজা; তাঁহার দশভুজা মূর্তিই সাধারণতঃ প্রচলিত। কিন্তু এই জাতীয় মূর্তিবিশেষে তাঁহার ভুজসংখ্যা কোথাও ৮, ১২, আবার কোথাও কোথাও ইহার ১৬, ১৮, ২০ এবং এমন কি ৩২ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। ভিলসার সন্নিকট উদয়গিরির অন্যতম গুহা-গাত্রে খোদিত মহিষমর্দিনী মূর্তিটি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের, এবং অধুনা

সংরক্ষিত এ প্রকার মূর্তির মধ্যে প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইহার ভুজসংখ্যা দ্বাদশ, এবং ইহাতে মহিষাকৃতি অসুরকে বধনিরত করিয়া দেবীকে দেখানো হইয়াছে; বিচ্ছিন্নশির পশুস্কন্ধ হইতে নির্গমনশীল মনুষ্যরূপী অসুর বা দেবীর বাহন সিংহকে দেখানো হয় নাই। এখানে দেবীর অসুরকে আক্রমণভঙ্গী দেবীমাহাত্ম্য বা শ্রীশ্রীচণ্ডীতে বর্ণিত আক্রমণভঙ্গীর সহিত আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের বর্ণনা এইরূপ—

এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্।
পাদেনাক্রাম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়ৎ॥
(৩, ৩৭)

এ মূর্তিটিতে দেবীর প্রসারিত দুই হস্তে ধৃত গোধা উল্লেখযোগ্য। কালক্রমে এ জাতীয় মূর্তিতে দেবীর বাহন সিংহ, মহিষরূপী অসুরের দেহ হইতে নির্গমনশীল মনুষ্যরূপী অসুর, এবং বঙ্গদেশীয় শারদীয় দুর্গোৎসবে পূজিত মৃন্ময়ী দুর্গা প্রতিমায় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক গণেশাদির অবস্থান দেখা যায়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিচ্ছিন্নশির পশু হইতে নির্গত নররূপী অসুরের সহিত যুদ্ধনিরত সিংহবাহিনী দেবীর মধ্যযুগীয় বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেকালের চতুর্ভুজা, সিংহারূঢ়া দেবীমূর্তিও পূর্ব ভারতে বিরল নহে। কোথাও কোথাও আবার এইরূপ মূর্তির ক্রোড়ে একটি শিশু আসীন দেখা যায়; ইহা দ্বারা শিল্পী দেবীর মাতৃত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। গোধাসনা দেবীর আর এক নাম গৌরী। ব্রোঞ্জে নির্মিত চতুর্ভুজা এ জাতীয় আদি মধ্যযুগের ক্ষুদ্র একটি মূর্তি নালন্দা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে; ইহার পদতলে গোধা রহিয়াছে। বাংলাদেশে মধ্যযুগের গোধাসনা এইরূপ বহু দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে। বাংলায় প্রচলিত কালকেতু উপাখ্যানে দেবীর স্বর্ণগোধিকা রূপ ধারণের কথা বলা হইয়াছে। সেকালের ষোড়শ, অষ্টাদশ, বিংশতি ও

দ্বাত্রিংশ ভুজযুক্ত সিংহবাহিনী মহিষাসুরবধ নিরত দেবীমূর্তি এবং আরও বিভিন্ন প্রকারের শক্তিমূর্তি এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ দেশ শক্তিসাধকের দেশ, সুতরাং এখানে নানাপ্রকার দেবীমূর্তির প্রাচুর্য খুবই স্বাভাবিক।

শিবের স্ত্রী পার্বতী রূপে দেবীর যেরূপ প্রসিদ্ধি, ঠিক ততটা না হইলেও অন্ততঃ কিছু পরিমাণে কৃষ্ণ-বলরামের ভগিনী বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি। দুর্গাস্তোত্র দুইটি, আর্যাস্তব এবং মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণোক্ত নারায়ণীস্তুতিতে দেবী বাসুদেব-কৃষ্ণের ভগিনী, নন্দগোপকুলে জাতা, যশোদাগর্ভসম্ভূতা প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার এই ভগিনী রূপের বিশেষ নাম যে একানংশা ছিল, উহা আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি। দেবীর এইপ্রকার মূর্তি বর্ণনপ্রসঙ্গে বরাহমিহির বলিয়াছেন যে একানংশা দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা বা অষ্টভুজাও হইতে পারেন; তবে তাঁহাকে তাঁহার দুই ভ্রাতা কৃষ্ণ ও বলরামের মধ্যে স্থাপিত করা আবশ্যক (কৃষ্ণবলদেবয়োর্মধ্যে একানংশা কার্যা—বৃহৎসংহিতা, ৫৭ অধ্যায়)। পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া উড়িষ্যায়, দেবীর এইপ্রকার মূর্তিপূজার সমধিক প্রচলন ছিল। ভুবনেশ্বরের অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে কৃষ্ণ বলরামের মধ্যস্থিত দেবীমূর্তি আজিও ভক্তগণের পূজা পাইয়া আসিতেছে। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান বিগ্রহত্রয়ও দেবীর এই রূপের কথা জানাইয়া দেয়; এ স্থলে দেবীর নাম সুভদ্রা। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের বলদেব-একানংশা-কৃষ্ণের একটি ব্রোঞ্জনির্মিত সুন্দর মূর্তি বিহার প্রদেশের ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হয়। ইহা এখন লণ্ডনের South Kensington Museumএ রক্ষিত আছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মৌর্য-শুঙ্গ বা তৎপরবর্তী কালের যেসব ছোট ছোট পোড়ামাটির স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির মধ্যে অনেকগুলিই যে মাতৃকামূর্তি এ কথা পূর্বে বলিয়াছি।

আদি-মধ্য ও তৎপরবর্তী যুগের যে সকল মাতৃকামূর্তি পাওয়া যায় সেগুলি একটি বিশিষ্ট ধরণের। ইহারা সাধারণতঃ প্রস্তরনির্মিত অর্ধচিত্র বা bas-relief (পৃথক্ পৃথক্ মূর্তিও বিরল নহে) এবং সপ্তসংখ্যক। এগুলি নামে মাতৃকা হইলেও (এই পরিচয় নির্দিষ্ট করিবার জন্য কোথাও কোথাও ইহাদের ক্রোড়ে শিশু দেখানো হইয়াছে), সপ্তমাতৃকাগণ কার্যতঃ ব্রহ্মা, মহেশ্বর, বিষ্ণু, কুমার-কার্তিকেয়, বরাহ (বিষ্ণুর অবতার), ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতার শক্তি রূপেই কল্পিত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, বারাহী, ইন্দ্রাণী এবং চামুণ্ডী; শেষোক্ত মাতৃকা কোনও কোনও গ্রন্থে যমের শক্তি বলিয়া বর্ণিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে শিবের ঘোররূপ ভৈরবের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। বরাহমিহির বলিয়াছেন যে মাতৃকাগণ নিজ নিজ দেবতার নামানুযায়ী লাঞ্ছনযুক্ত হইয়া চিত্রিত হইবেন (মাতৃগণঃ কর্তব্যঃ স্বনামদেবানুরূপকৃতচিহ্নঃ—বৃহৎসংহিতা, অধ্যায় ৫৭, শ্লোকসংখ্যা ৫৬)। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনুরূপ উক্তিও (যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথা ভূষণ বাহনম্। তত্তদেব তচ্ছক্তিঃ……—৮৮, ১৩) আবিষ্কৃত মূর্তিরাজির দ্বারা সমর্থিত হয়। সপ্তমাতৃকা মূর্তি প্রস্তর-নির্মিত মধ্যযুগীয় অর্ধচিত্রগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বীণাধর বীরভদ্র (শিবের আর এক প্রকাশ) ও গণপতির মধ্যবর্তী করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। চামুণ্ডা প্রেতাসনা, কৃশোদরী ও নির্মাংসা, এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার উদরগহ্বরে একটি বৃশ্চিক খোদিত দেখা যায়। এ মূর্তি অতি ভীষণাকৃতি, এবং ইহার দন্তুরা নামক আর এক বিভেদও অত্যন্ত ভীষণ। তান্ত্রিক সাধক যোগসিদ্ধির জন্য যে কত উগ্র আচার অনুষ্ঠান করিতেন, উহা তাঁহার এ জাতীয় মূর্তিপূজা হইতে বোধগম্য হয়। কিন্তু দেবীর শান্ত রূপও যে তাঁহার সাধনায় ব্যবহৃত হইত উহা তাঁহার বহু সৌম্য প্রকৃতির মূর্তি হইতে প্রমাণিত হয়। এইরূপ একটির নাম ত্রিপুরসুন্দরী; ইহার তত্ত্বব্যাখ্যান পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

সেন রাজধানী বিক্রমপুরের কাগজীপাড়া নামক অংশে আবিষ্কৃত শিবলিঙ্গ সহ অপরূপ একটি সৌম্য দেবীমূর্তির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করিয়া আমি এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। ইহা উচ্চতায় ৪' ফিট, ইহার অধোভাগে একটি শিবলিঙ্গ; উহার উপবিভাগ হইতে চতুর্ভুজা দেবীর উপরার্ধ নির্গমনশীল। দেবীর সম্মুখস্থ হাত দুইটি ধ্যানমুদ্রাগত, অপর দুটি হাতে অক্ষমালা ও পুস্তক; দেবীর দেহে সুবিন্যস্ত অলঙ্কার-রাজি। শিল্পী তাঁহার ত্রিনয়নবিশিষ্ট মুখের ধ্যানমগ্ন ভাব অতি নিপুণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই মূর্তির সঠিক পরিচয় সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। কিন্তু স্বর্গীয় নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাধানিক রহস্য এবং কালিকাপুবাণেব একটি উদ্ধৃতি (অধ্যায় ৭৬, শ্লোকসংখ্যা ৮৩-৯০) অনুসারে ইহার মহামায়া বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমার মতে উহাই যথার্থ। মার্কণ্ডেয় ও কালিকাপুবাণের উদ্ধৃতি দুইটির দেবীমূর্তির সহিত সর্বাংশে মিল না থাকিলেও, কালিকা-পুরাণের একটি উক্তিব সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। পুরাণকার বলিতেছেন যে বেতাল ও ভৈরব নামক মহাদেবের পুত্রদ্বয় ভৈরব নামক শিবলিঙ্গের নিকট অবস্থান করতঃ জগতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী জগন্ময়ী মহামায়াকে বৈষ্ণবীতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রজপ পুরশ্চরণাদি করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। 'তাঁহাবা যখন ধ্যানস্থ হইয়া দেবীপূজানিরত ছিলেন, তখন জগন্ময়ী মহামায়া শিবলিঙ্গ ভেদ কবিয়া তাঁহাদের প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছিলেন' (ধ্যানস্থয়োস্তু জপতোর্যজতোশ্চ জগন্ময়ী। শিবলিঙ্গং বিনির্ভিদ্য তদা প্রত্যক্ষতাং গতা)। এই বিবরণ মূর্তিটির বর্ণনার সহিত বেশ মিলে। কালিকাপুরাণে উক্ত আছে যে দেবী মহামায়ার আর এক নাম ত্রিপুর-ভৈরবী, এবং তিনি হস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও পুস্তক ধাবণ করেন; এই বর্ণনাও মূর্তিটির সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আদি পুরুষ হইতে যে পুরাতনী প্রবৃত্তি বা শক্তির প্রসূত হইবার কথা আছে উহার ভাবধারা আদ্যাশক্তি

মহামায়ার শিবদেহ হইতে উদ্ভূত হইবার কল্পনার সহিত সম্পূর্ণভাবে মিলে ;—'তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী'। বঙ্গদেশীয় শক্তিসাধকের গভীর আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত এই অপরূপ পূজামূর্তি আবার এক বিশেষ উপায়ে শিব-শক্তি সমন্বয় রূপায়িত করে। এই সমন্বয়ের আর এক রূপ আমরা এলিফ্যাণ্টার তথাকথিত ত্রিমূর্তিটিতে দেখিতে পাই (পৃঃ ১৪২)।

দ্বাদশ অধ্যায়

শক্তি—শাক্ত

শক্তি পূজকগোষ্ঠী, তন্ত্র ও তান্ত্রিক, পূর্বভারতে শক্তিপূজা, শক্তিতত্ত্ব

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে যে গাণপত্য, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান ইষ্টদেবতার বিবর্তনে যেমন নানাবিধ দেবতার রূপসংমিশ্রণ কার্যকরী হইয়াছিল, শক্তি-উপাসকের আরাধ্যা দেবীও তেমনি নানাপ্রকার এক বা ভিন্ন জাতীয় দেবী-কল্পনার সংমিশ্রণের ফলে পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার এক বা একাধিক আদিরূপের সহিত ভারতের বাহিরের অনেক প্রাচীন জাতির দ্বারা পূজিত দেবীর মূল কল্পনার কিছু কিছু ঐক্য ছিল। মাতৃকা রূপে দেবীর পূজা শুধু যে ভারতেই সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত ছিল এমন নহে, পরন্তু ইহা পশ্চিম এসিয়ায়, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এবং অন্যান্য স্থানে বহু পূর্বকাল হইতে তত্তৎ দেশবাসীর মধ্যে চলিত ছিল। ইহার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ঐতিহাসিক যুগে ভারতীয় জনগণ দ্বারা পূজিত সিংহবাহিনী দেবীমূর্তির সহিত সিরিয়া প্রভৃতি পশ্চিম এসিয়ার অন্তর্গত স্থানের প্রাচীন অধিবাসিগণের আরাধ্যা সিংহারূঢ়া বা এমনি দণ্ডায়মান নানা দেবীর মূর্তি তুলনা করা যাইতে পারে। উভয়ের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত উত্তর ভারতের অন্ততঃ একজন বৈদেশিক নৃপতির সময়ে একই দেবী নানা ও উমা নামে বর্ণিত হইয়াছিলেন। কুষাণরাজ হুবিষ্কের মুদ্রার কতকগুলিতে একটি দেবতা ও একটি দেবী পাশাপাশি দণ্ডায়মান দেখা যায়; গ্রীক অক্ষরে দেবতা এই মুদ্রাগুলির সর্বত্র ভবেশ (শিব) বলিয়া এবং দেবী কোথাও নানা এবং কোথাও উমা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সিংহারূঢ়া নানা দেবীর মূর্তি আমরা হুবিষ্কের কোনও কোনও মুদ্রায় দেখিতে পাই; সিংহাসীনা অম্বিকা গুপ্তরাজগণের স্বর্ণমুদ্রাগুলির অন্যতম বিশেষ

লাঞ্ছন। মনোযোগ সহকারে অনুসন্ধান করিলে এ প্রকার আরও কিছু কিছু সাদৃশ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে যেরূপ দেবী-কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া এক বিশিষ্ট শক্তিপূজক সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, ঠিক এরূপভাবে ভারতের বাহিরে আর কোথাও দেবীর একভক্ত পূজকগোষ্ঠী সংগঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই।

উপাস্য পর্যায়ে দেবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপকল্পনা সুপ্রাচীন হইলেও, বৈষ্ণব শৈবাদি উপাসক সম্প্রদায়গুলির উল্লেখ যেরূপ খৃষ্টপূর্ব যুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় সেরূপ শক্তির একভক্ত পূজকগোষ্ঠীর উল্লেখ যে তৎকালীন সাহিত্যে দুর্লভ ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতকের দ্বিতীয়ভাগে ভারতে আগমনকারী এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক বণিকের লিখিত গ্রন্থে মনে হয় এ বিষয়ক একটি পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে। কুমারী দেবী (virgin goddess) সম্বন্ধে *Periplus*এর উক্তির কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, এবং উহা সেখানে উদ্ধৃতও হইয়াছে। আমি এ প্রসঙ্গে ইহার একটি বিশেষ অংশের প্রতি পাঠকবর্গের পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কোমরি অন্তরীপ ও বন্দর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া গ্রন্থকার যেমন কুমারী দেবীর কথা বলিয়াছেন, তেমনি তিনি এমন একদল লোকের কথাও বলিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহাদের অবশিষ্ট জীবন উৎসর্গীকৃত করিতে এবং সমুদ্রস্নান ও কৌমার্য-ব্রত অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিতেন, এবং সেখানে আসিয়া বাস করিতেন ('hither come those men who wish to consecrate themselves for the rest of their lives, and bathe and dwell in celibacy')। বৈদেশিক গ্রন্থকার এখানে যে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টভাবে একদল দেবী-উপাসকের কথাই বলিতেছেন, এ অনুমান সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে। এ সম্বন্ধে এইরূপ বা ইহাপেক্ষা স্পষ্টতর ইঙ্গিত ঠিক তৎপরবর্তী কালের সাহিত্য হইতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমার

জানা নাই। তবে শাক্ত সম্প্রদায় সম্পর্কিত এই নেতিবাচক তথ্য ইহার অর্বাচীনত্ব প্রমাণিত করে না। ইহা হইতে এই মাত্র অনুমিত হইতে পারে যে বৈষ্ণব শৈবাদি সম্প্রদায়গুলির ন্যায় ইহা সুপ্রাচীনকালে এত ব্যাপক ও সুগঠিত ছিল না। আরও একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক। দেবীপূজার এক পর্যায় প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ যে বিষ্ণু শিবাদি দেবতাকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুর্গাস্তোত্রগুলিতে দেবীর শিবজায়া, বাসুদেব-কৃষ্ণের ভগিনী (গোপেন্দ্রস্যানুজ্যা), স্কন্দমাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণনার কথা আগের অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। এখন তৎকালীন এ বিষয়ক প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের আলাচনা করা প্রয়োজন।

গুপ্তযুগ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কালের কয়েকটি শিলালিপি আমাদিগকে ঐ কথাই জানাইয়া দেয়। মালব-বিক্রমাব্দ গত ৪৮১ (খৃষ্টীয় ৪২৩-২৪) বৎসরের একটি শিলালেখ মধ্য-ভারতের ঝালরাপাটন সহরের ৫২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গাঙ্গধার নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে প্রথম কুমার-গুপ্তের সামন্তরাজ বন্ধুবর্মনপুত্র বিশ্ববর্মনের ময়ূরাক্ষক নামক জনৈক মন্ত্রী একই সময়ে একটি বিষ্ণুমন্দির এবং মাতৃকাদিগের একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার ধর্মাচরণ সম্পর্কিত যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই সুপ্রাচীন লেখ হইতে সংগ্রহ করা যায় সে সম্বন্ধে একটু পরে আলোচনা করা হইবে। কিন্তু এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ময়ূরাক্ষক যদিও ভাগবত ছিলেন এবং বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন (বিষ্ণোঃ স্থানমকারয়ৎ ভাগবতস্-শ্রীমান-ময়ূরাক্ষকঃ) তথাপি তিনি পুণ্যার্জনের জন্য তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকগণের দ্বারা পূজিত মাতৃকাদিগের মন্দির নির্মাণ করাইতেও পরাঙ্মুখ হন নাই। একই সঙ্গে বিষ্ণু ও মাতৃকা মন্দির জনৈক বিষ্ণুভক্তের (ভাগবতের) দ্বারা নির্মাণ করানো এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়। মাতৃকাদিগের মধ্যে বৈষ্ণবী ও

বারাহী বিষ্ণুর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বিহার প্রদেশস্থ বিহার নামক সহরে প্রাপ্ত একটি প্রস্তরস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ প্রথম কুমার-গুপ্ত ও তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্তের সমকালীন এক অর্ধভগ্ন লেখ হইতে জানা যায় যে যূপ বলিয়া বর্ণিত স্তম্ভটি কতকগুলি মন্দিরের সম্মুখে উচ্ছ্রিত হইয়াছিল; মন্দিরগুলির মধ্যে দেবী ভদ্রার্যা, মাতৃকাগণ এবং স্কন্দ কার্তিকেয়ের মন্দির ছিল। দেবীর ভদ্রার্যা নামটি লক্ষণীয়; ভদ্র-কালীর বা সুভদ্রার ভদ্রা এবং আর্যাস্তবের আর্যা একত্রিত হইয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। গয়া জিলার বরাবর গুহাগুলির সন্নিকট নাগার্জুনি পর্বতগুহাস্থ একটি শিলালেখ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে মৌখরিরাজ অনন্তবর্মন এই গুহামন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লেখে দেবীর যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে ইহা ছিল মহিষমর্দিনীর মূর্তি; দেবীকে ভবানী বা ভবের (শিবের) পত্নীও বলা হইয়াছে।

শক্তি বা মাতৃকা পূজকগোষ্ঠীর সুস্পষ্ট উল্লেখ মনে হয় বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া যায়। ইহার প্রতিমাপ্রতিষ্ঠাপনম্ নামক অধ্যায়ে (৫৯তম অধ্যায়, সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ) ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ইষ্টদেবতার বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিবার প্রকৃত অধিকারীর কথাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে মাতৃকাদিগের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মণ্ডলক্রমবিদ্গণই উপযুক্ত (মাতৃণামপি মণ্ডলক্রমবিদো)। ইহার উপর ভাষ্যকালে উৎপল বলিতেছেন যে 'মাতৃণাং ব্রাহ্ম্যাদীনাং (সপ্তমাতৃকাঃ) মণ্ডলক্রমবিদো যে মণ্ডলক্রমং পূজাক্রমং বিদন্তি জানন্তি', অর্থাৎ ব্রাহ্মী ইত্যাদি সপ্তমাতৃকাদিগের (বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁহারাই করিবেন), যাঁহারা পূজাক্রম সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। ভাষ্যকার মণ্ডলক্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, ইহার অর্থ মাত্র পূজাক্রম বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু মণ্ডলক্রম যে তান্ত্রিক পূজাবিধি, এবং ইহার প্রয়োগে যে শাক্তগণই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য একটু পরে আলোচিত হইবে। তবে উৎপল এ প্রসঙ্গে বৃহৎসংহিতার এই শ্লোকের (৫৯, ১৯) শেষ চরণের 'স্ববিধিনা' কথাটির ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন যে মাতৃকা-পূজকদিগের পক্ষে 'স্ববিধিনা' বলিতে স্বকল্পবিহিত বিধানই বুঝায় (মাতৃণাং স্বকল্পবিহিত বিধানেন)। এখানে কল্প কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিলেই জানা যাইবে যে উৎপল তান্ত্রিক পূজাবিধানের কথাই বলিয়াছেন। শব্দকল্পদ্রুম কোষগ্রন্থে বারাহীতন্ত্র হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে জানা যায় যে কল্প চতুর্বিধ, যথা আগম, ডামর, যামল ও তন্ত্র—

কল্পশ্চতুর্বিধঃ প্রোক্ত আগমো ডামরস্তথা।
যামলশ্চ তথা তন্ত্রং তেষাং ভেদাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥

তাহা হইলে উৎকলকথিত স্বকল্পবিধানের অর্থ ইহাই বুঝিতে হইবে যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কল্পভুক্ত শক্তি-পূজকগণকেই মাতৃকাদিগের মূর্তি নিজ নিজ কল্পোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠা করিবার অধিকারী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

বৃহৎসংহিতার রচনাকালের (আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) ন্যূনাধিক এক শতাব্দী পরে চীন পরিব্রাজক হিউয়েন সাংও যে শক্তি-পূজকদিগের কথা বলিয়াছেন উহার ইঙ্গিত পূর্ববর্তী অধ্যায়ে করা হইয়াছে। গন্ধার প্রদেশস্থ ভীমাদেবী পর্বতের এবং ভীমাদেবীর ও তাঁহার স্বামী মহেশ্বরদেবের (দেবী ও তাঁহার প্রহরারত ভৈরবরূপী শিবের) স্থান সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন যে ইহা ছিল অত্যন্ত পবিত্র ক্ষেত্র, এবং এখানে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে ভক্তগণ পূজার্থে সমবেত হইতেন। ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত হইবে না যে ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই শক্তি-উপাসক ছিলেন। মৌখরিরাজ অনন্তবর্মন কর্তৃক নাগার্জুনি পর্বতে শক্তিমন্দিরে কাত্যায়নী দেবীর (মহিষাসুরমর্দিনী) বিগ্রহ স্থাপনের কথা একটু আগে বলা হইয়াছে।

অনন্তবর্মন হয়ত নিজে শক্তি-পূজক ছিলেন, এবং তাঁহার ইষ্টদেবীর প্রতিমা তাঁহার সাধনসৌকর্যার্থে গুহামন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহা জোর করিয়া বলা যায় না, কারণ লেখটিতে তাঁহার নামের পূর্বে এমন কোনও বিশেষণ নাই যাহা তাঁহাকে শাক্ত সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। তবে খৃষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দুইটি বিখ্যাত রাজবংশ যে শক্তি-উপাসনার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, ইহা তত্তদ্বংশীয় রাজগণের লেখমালা হইতে বুঝা যায়। এ রাজকুল দুটি দক্ষিণ ভারতের, একটি প্রাচীন কদম্বকুল ও অন্যটি প্রাচীন চালুক্য-বংশ। কদম্বদিগের বহু লেখে নৃপতিগণ হারিতীপুত্র এবং স্বামি-মহাসেন ও মাতৃকাদিগের পূজক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন (স্বামি-মহাসেন-মাতৃগণানুধ্যাতানাং…হারিতীপুত্রাণাং)। প্রাচীন চালুক্যবংশীয় রাজগণ 'হারিতীপুত্র সপ্তলোকের মাতা সপ্তমাতৃকাদিগের দ্বারা অভিবর্ধিত ও কার্তিকেয় দেবতার অনুগ্রহে সংরক্ষিত ও প্রাপ্তকল্যাণ' বলিয়া তাঁহাদের লেখগুলিতে অভিহিত হইয়াছেন (হারিতীপুত্রানাং সপ্তলোকমাতৃভিঃ সপ্তমাতৃভিরভিবর্ধিতানাং কার্তিকেয়ানুগ্রহ পরিরক্ষণ প্রাপ্তকল্যাণ পরম্পরাণাং)। এজন্য Fleet যথার্থই বলিয়াছেন যে স্বামী মহাসেন (স্কন্দ কার্তিকেয়) ও সপ্তমাতৃকাগণ প্রাচীন কদম্ব ও প্রাচীন চালুক্য কুলের বাস্তুদেবতা বা ইষ্টদেবী স্বরূপ ছিলেন ('Svāmi-Mahāsena, or Kārtikeya and the divine Mothers, "the seven mothers of mankind", appear as special objects of worship, and tutelary deities, of the Early Kadambas and of the Early Chālukyas' (C. *I. I.*, Vol. III, p. 48, f.n. 1.)। খৃষ্টীয় দশম শতকে উত্তর ভারতের কয়েকটি রাজা যে দীক্ষিত দেবী-উপাসক ছিলেন উহার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ বর্তমান। কান্যকুব্জের গুর্জরপ্রতীহাররাজ বিনায়ক-পালের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে যদিও তিনি নিজে সৌর ছিলেন

(পরমাদিত্যভক্ত), তাঁহার অন্ততঃ তিনজন পূর্বপুরুষ শাক্ত ছিলেন। লেখটিতে তাঁহার পিতা মহারাজা শ্রীমহেন্দ্রপালদেব, পিতামহ মহারাজা শ্রীভোজদেব ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ মহারাজা শ্রীনাগভট পরম ভগবতীভক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ইহা একই রাজবংশে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত রাজগণের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করে। মহারাজা বিনায়কপাল ছিলেন পরমাদিত্যভক্ত বা সৌর এবং তাঁহার পিতা, পিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন পরমভগবতীভক্ত বা শাক্ত এ কথা এখনই বলা হইল, তাঁহার ভ্রাতা ও পূর্ববর্তী রাজা দ্বিতীয় ভোজদেব ও বংশের প্রথম রাজা দেবশক্তিদেব ছিলেন পরমবৈষ্ণব, এবং বংশের দ্বিতীয় নৃপতি বৎসরাজদেব ছিলেন পরমমাহেশ্বর (পাশুপত বা শৈব)। কিন্তু লেখে উক্ত আটজন মহারাজার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক (তিনজন) শক্তি-উপাসক ছিলেন।

পরবর্তী কালে পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি স্থানে শক্তিপূজার প্রবল আধিক্য একটু পরে আলোচিত হইবে, এবং ঐ প্রসঙ্গে বঙ্গদেশীয়া শারদীয়া দুর্গা পূজা-তত্ত্বের আলোচনা করা হইবে। এখন শক্তিপূজার অন্যতম প্রধান অঙ্গ তন্ত্র ও তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। তন্ত্র কথাটির কোষগত অর্থ বহু হইলেও শক্তিপূজা সম্পর্কিত ইহার যে দুএকটি অর্থ আছে উহাই এ প্রসঙ্গে আলোচনার বিষয়। V. S. Apte তাঁহার *Sanskrit-English Dictionary*তে তন্ত্রের অন্যতম অর্থ এইরূপ করিয়াছেন—'The regular order of ceremonies and rites, system, framework, ritual', অর্থাৎ ধর্মগত ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিয়মানুগ ব্যবস্থা, বিধিবদ্ধ ধর্মাচারানুষ্ঠান-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র, কাঠামো ইত্যাদি। ইহার বিশেষ অর্থানুযায়ী ইহাকে বেদবিহিত ক্রিয়াদি হইতে পৃথক্ বুঝিতে হইবে, এবং যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান দেববিগ্রহ পূজাদি তান্ত্রিক ধর্মাচরণ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভিন্ন ভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর

উপাসনার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল দেবতাকে আশ্রয় করিয়া যে সকল ধর্মাচারক্রম উদ্ভূত হয়, সেগুলিকে ন্যায্যতঃ অবৈদিক পর্যায়ে ফেলা হইয়া থাকে। এদিক দিয়া বিচার করিলে গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, সৌরাদি পূজাক্রম শাক্ত পূজাক্রমের মত তান্ত্রিক পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। তন্ত্রের অন্যতম ভেদ যে আগম ইহা একটু আগেই বলা হইয়াছে, এবং বর্তমান গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে শৈবাগম সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। Schrader সংগৃহীত পাঞ্চরাত্র গ্রন্থসমূহের তালিকামধ্যে তন্ত্রসাগর, পাদ্মসংহিতা-তন্ত্র, পাদ্মতন্ত্র, লক্ষ্মীতন্ত্র প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। সেইরূপ সৌর ও গাণপত্য ধর্মমত সংক্রান্ত কোনও কোনও গ্রন্থ তন্ত্র নামে অভিহিত হইতে পারে। Farquhar এইরূপ যুক্তির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই তাঁহার *An Outline of the Religious Literature of India* নামক প্রামাণ্য গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ণব, শৈব, সৌরাদি সাম্প্রদায়িক সাহিত্যকে শাক্ত পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন (তবে ষড়দর্শনকেও তাহার শাক্ত পর্যায়ে ফেলা, আমার মনে হয় যুক্তিযুক্ত হয় নাই)। শক্তিপূজা প্রসঙ্গে দেবীপূজা সম্পর্কিত তান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থা, উহার প্রয়োগ ও তৎসম্পর্কিত সাহিত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করাই সমীচীন।

প্রথমে তান্ত্রিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। ইহার বিরাট্ ও বৈচিত্র্যময় রূপ কোনও কোনও তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে; আবার ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্রে বিভিন্ন তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। বারাহী-তন্ত্রোক্ত চতুর্বিধ কল্পের কথা একটু আগে বলিয়াছি। তন্ত্রকার আগম-সংখ্যা দ্বাদশ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহাদিগের নাম দিয়াছেন,—মুক্তক, প্রপঞ্চ, সারদা, নারদ, মহার্ণব, কপিল, যোগ, কল্প, কপিঞ্জল, অমৃতশুদ্ধি, বীর ও সিদ্ধসম্বরণ; প্রত্যেকটি আগমের শ্লোকসংখ্যা বহু সহস্র। এখানে বলা প্রয়োজন যে এই আগমগুলি শৈবাগম হইতে

পৃথক্। ডামর ষট্সংখ্যক (ডামরঃ ষড়বিধো জ্ঞেয়ঃ), এবং উহাদিগের নাম এইরূপ—যোগ, শিব, দুর্গা, সারস্বত, ব্রহ্ম ও গন্ধর্ব। যামলের সংখ্যাও ছয় (যামলাঃ ষট্ চ সংখ্যাতাঃ), যথা আদিযামল, ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, গণেশযামল ও আদিত্যযামল। তন্ত্রের দুই উপবিভাগ, তন্ত্র ও উপতন্ত্র ; তন্ত্রের সংখ্যা বিংশতি এবং উপতন্ত্রের সংখ্যা একাদশ। বিংশতি তন্ত্র এইগুলি—নীলপতাকা, বামকেশ্বর, মৃত্যুঞ্জয়, যোগার্ণব, মায়া (মহাতন্ত্র নামে আখ্যাত), দক্ষিণামূর্তি, কালিকা, কামেশ্বরী, হরগৌরী, কুব্জিকা (এটিও মহাতন্ত্র), কাত্যায়নী, প্রত্যঙ্গিরা, মহালক্ষ্মী, ত্রিপুরার্ণব (মহাতন্ত্র), সরস্বতী, যোগিনী (ইহাকে তন্ত্ররাজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে), বারাহী, গবাক্ষী (ক্ষ), নারায়ণীয় ও মৃড়ানী (তন্ত্ররাজ)। একাদশটি উপতন্ত্র এইরূপ—বশিষ্ঠ, কপিল, নারদ, গর্গ, পুলস্ত্য, ভার্গব, সিদ্ধ, যাজ্ঞবল্ক্য, ভৃগু, শুক্র ও বৃহস্পতি। উপরে বারাহীতন্ত্র হইতে তান্ত্রিক সাহিত্যের যে তালিকা দেওয়া হইল, উহা সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার *Catalogue of Palmleaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Durbar Library, Nepal* নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডে উপরোক্ত তালিকার বাহিরে বহু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে প্রাচীন তন্ত্রগুলি উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এই চতুর্বিধ শাসনগত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারাহীতন্ত্রোক্ত কুব্জিকা মহাতন্ত্র (এখানে কুব্জিকামত বলিয়া বর্ণিত) পশ্চিমশাসনান্তর্গত ছিল। কুব্জিকামতে লিখিত আছে যে বৈদিক ধর্ম হইতে শৈবধর্ম শ্রেষ্ঠ, দক্ষিণাচার শৈবধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পশ্চিমাম্নায় সকল ধর্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। শাস্ত্রী মহাশয় এ জাতীয় অনেকগুলি পুঁথি অনুশীলন করিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন যে পশ্চিমশাসনের কুব্জিকামত, কুলালিকাম্নায়, শ্রীমত, কাডিমত বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি বিবিধ নামবিশিষ্ট একটি তান্ত্রিক

শাখা ছিল। ইহার কয়েকটি পরিশিষ্ট (উত্তর) ছিল, যথা শ্রীমতোত্তর বা মন্থানভৈরব এবং কুব্জিকামতোত্তর। মূল শাখা ষট্‌ক নামক চারি অংশে বিভক্ত এবং প্রতি অংশে ৬০০০ সংখ্যক শ্লোক থাকিলে, মূলে সর্বসাকুল্যে ২৪০০০ শ্লোক ছিল। ইহা হইতে এই তান্ত্রিক শাখা সাহিত্যের বিরাটত্ব নির্ণীত হইবে। ইহার ন্যূনাধিক প্রাচীনত্বও এসিয়াটিক সোসাইটীর পুঁথি-সংগ্রহভুক্ত গুপ্তোত্তর ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি কুব্জিকামত পুঁথি হইতে প্রমাণিত হয়। কাশ্মীর শৈবাচার্য অভিনবগুপ্ত তাঁহার ত্রিংশিকা নামক গ্রন্থে কুব্জিকা তন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কুব্জিকামত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার পর কুব্জিকামত শাখার সাহিত্যসৃষ্টি কার্য বন্ধ হইয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলিয়াছেন যে ইহা অপেক্ষা অধিক প্রাচীন তান্ত্রিক শাখাও যে ছিল উহা কুব্জিকা-মত লিখিত দেবযান, পিতৃযান, প্রভৃতি প্রাচীনতর নাম হইতে বুঝা যায়। তিনি ইহার একটি শ্লোক হইতে অনুমান করিয়াছিলেন যে এই তান্ত্রিক শাখাটি ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছিল; শ্লোকটি এই—

গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষেঽধিকারায় সর্বতঃ।
পীঠোপপীঠক্ষী(ক্ষে)ত্রেষু কুরু সৃষ্টিরনেকধা॥

(*op. cit.*, Vol I, pp. lxiv, lxxviii—lxxix)। বাংলাদেশে যে পঞ্চমকার যুক্ত তান্ত্রিক সাধনা মধ্যযুগ হইতে প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে অনেকের ধারণা এই যে ইহা চীন বা মহাচীন দেশ (কাহারও কাহারও মতে ইহা বর্তমান তিব্বত) হইতে এখানে আসে। বৌদ্ধ মহাযান তারা দেবীর পূজা প্রচলন সম্বন্ধে যে কাহিনী চলিত আছে তাহা হইতে ইহা অনুমিত হয়। কোনও কোনও হিন্দুতন্ত্রেও প্রায় ঐ প্রকার গল্প পাওয়া যায়, এবং ইহা হইতে মনে হয় যে কুব্জিকামতের ন্যায় কয়েকটি তান্ত্রিক শাখা বাহির হইতে পূর্ব ভারতে প্রবেশ

করিয়াছিল। অবশ্য এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কুব্জিকাদেবীর তান্ত্রিক পূজার কথা অগ্নিপুরাণের ১৪৩ ও ১৪৪ অধ্যায় দুইটিতে কুব্জিকাক্রম পূজা এবং কুব্জিকা পূজা নামে বর্ণিত আছে।

বারাহী তন্ত্রোক্ত যামল, ডামর তন্ত্রাদির তালিকা বহির্ভূত এই জাতীয় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের নাম জানা যায়, এবং তত্তৎ নাম বিশিষ্ট বহু তান্ত্রিক পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। ভূতডামর, জয়দ্রথযামল, গ্রহ-যামল, দেবীযামল প্রভৃতি ডামর যামলাখ্য তন্ত্র, নিত্যা, নিরুত্তর, গুপ্ত-সাধন, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, মালিনীবিজয়, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্রমহোদধি (মহীধর বিবচিত), ত্রিপুরাসার, ত্রিপুরারহস্য, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয়, প্রাণতোষিণী, মহানির্বাণ, প্রপঞ্চসার, শারদা তিলক (লক্ষ্মণদেশিক কর্তৃক একাদশ শতকে রচিত), মৎস্যসূক্ত ইত্যাদি এই জাতীয় অনেক হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে কয়েকটি মুদ্রিতও হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান বিষয়ক সৌন্দর্যলহরী, ললিতা সহস্রনাম, ললিতোপাখ্যান, ষট্‌চক্রক্রম, তন্ত্রসার জাতীয় কয়েকটি গ্রন্থও প্রকাশিত হইয়াছে। উপরিলিখিত বিশাল তান্ত্রিক ও শাক্ত সাহিত্যের অধিকাংশ রচয়িতৃগণের নাম জানা যায় না। মাত্র অল্প কয়েকটির বিভিন্ন রচয়িতার পরিচয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। যাঁহাদের পরিচয় জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী শক্তি-পূজকগণের নামই উল্লেখযোগ্য, যথা—কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার ইত্যাদি। কিংবদন্তী এই যে স্বয়ং শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী হইলেও তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন, এবং সৌন্দর্যলহরী, ললিতাসহস্রনাম প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিনা বলা যায় না। ষট্‌চক্র-ক্রমের গ্রন্থকার ছিলেন ব্রহ্মানন্দগিরি। পূর্ণানন্দ নামক একজন তান্ত্রিক সাধক যোগচিন্তামণি নামক উহার একটি টীকা রচনা করেন। তন্ত্রসার

রচনা করিয়াছিলেন স্বনামধন্য কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ; ইনি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রায় এক শতাব্দী পরে জীবিত ছিলেন। ইঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার প্রাণতোষিণী তন্ত্রের রচয়িতা। মন্ত্রমহোদধির রচয়িতা যে মহীধর ইহা উক্ত গ্রন্থের মধ্যেই স্পষ্টভাষায় লিখিত আছে। মন্ত্রমহোদধি ন্যূনাধিক দ্বাবিংশ তরঙ্গে বিভক্ত, এবং ইহাতে তান্ত্রিক ধর্মাচরণ সংক্রান্ত বহু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। ইহার প্রথম তরঙ্গের একটি শ্লোকে পঞ্চোপাসনার কথা এইরূপ ভাবে লিখিত দেখা যায়—বিষ্ণুশিবোগণেশার্কৌ দুর্গা পঞ্চৈব দেবতাঃ। আরাধ্যাঃ সিদ্ধিকামেন তন্ত্রমন্ত্রৈর্যথোদিতম্॥ অন্যান্য পটলে গণেশ মন্ত্র, কালীসুমুখী মন্ত্র, তারা মন্ত্র, ছিন্নমস্তাদিকথন, শ্যামা মন্ত্র, মহাপূর্ণা মন্ত্র, ষট্‌কর্মাদি নিরূপণ, হনুমন্মন্ত্র, বিষ্ণু, শিব, কার্তবীর্যাদি মন্ত্র নিরূপণ, এবং স্নান, পূজা, পবিত্রার্চন, মন্ত্রশোধন, সুন্দরী (ষোড়শী) পূজন ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। মহাতন্ত্র নামে অভিহিত মৎস্যসূক্ত মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের রচনা। ইহা চতুঃষষ্টি পটলে বিভক্ত একটি প্রামাণিক তান্ত্রিক গ্রন্থ। ইহাতেও নানাবিধ তান্ত্রিক ধর্মাচরণের কথা আছে, এবং মহীধর প্রণীত মন্ত্রমহোদধিতে যেমন দশমহাবিদ্যার কালী, তারা, ষোড়শী ও ছিন্নমস্তার নাম পাওয়া যায়, তেমন মৎস্যসূক্তের ষষ্টিতম পটলে আর একটি মহাবিদ্যা মাতঙ্গিনীর (মাতঙ্গী) নামের উল্লেখ আছে। এই পটলে মাতঙ্গিনীবিদ্যার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের একষষ্টিতম পটলের বিষয়বস্তু হইতেছে সর্বগ্রহনিবারিণী মহাবিদ্যা সংক্রান্ত; কিন্তু ইহাতে দশমহাবিদ্যার অন্য নামগুলি পাওয়া যায় না। পরবর্তী পটলে অপরাজিতার নাম আছে, এবং গ্রন্থের অন্যত্র ছয়টি মাতৃকা ও তাঁহাদের স্থানের কথা আছে, যথা—ব্রহ্মাণী (শিরে), মাহেশ্বরী (নেত্রে), কৌমারী (কর্ণে), বারাহী (উদরে), ইন্দ্রাণী (নাভিতে) এবং চামুণ্ডা (গুহ্যে);

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণবীর নাম করা হয় নাই।[১]

তন্ত্রসাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন আমার এ গ্রন্থে সম্ভবপর হইবে না। অল্প যাহা কিছু উপরে বলা হইয়াছে উহা হইতে ইহার বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকিতে পারে না। এই বিশাল সাহিত্যের কোনও কোনও অংশের সহিত ভারতীয় অনার্য ও তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, কারণ এগুলি অত্যন্ত অশুদ্ধ সংস্কৃতে রচিত, এবং ইহাদের বিষয়বস্তু নিম্নস্তরের যাদুবিদ্যা সংক্রান্ত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় পশ্চিমাম্নায়ের অন্তর্গত কুব্জিকামত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ভেলক (ভেল্কী) বা নিম্নস্তরের যাদুবিদ্যায় অশেষ পারদর্শিতা অর্জনই এইসব তান্ত্রিক উপাসকের পরম লক্ষ্য ছিল, এবং যাঁহারা এ বিষয়ে কৃতকার্য হইতেন তাঁহাদিগকে নাথ বলা হইত; নাথপন্থীরা সমাজের নিম্নস্তরের লোক ছিলেন, ও এ কারণেই ইহাদিগের দ্বারা রচিত তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহের সংস্কৃত ভাষা অশুদ্ধ, ব্যাকরণবহির্ভূত ও দুর্বোধ্য ছিল। ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে লিখিত জয়দ্রথ-যামল সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে ইহার বিষয়বস্তু সাধারণতঃ কুলার্ণব তন্ত্র হইতে গৃহীত; ইহাতে লিখিত আছে যে পর্ণশবরী দেবীর পূজা হয় কুম্ভকারের নয় কলুর গৃহে অনুষ্ঠিত হইবে, এবং ইহারা হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত (*op. cit.*, Vol. I, pp. lxi & lxiv)। শাস্ত্রী

১ এসিয়াটিক সোসাইটীর (কলিকাতা) পুঁথি-সংগ্রহে একত্রে বাঁধানো পুঁথি কয়টির ক্রমিক নাম—(১) ব্রহ্মানন্দগিরি বিরচিত ষট্‌চক্রক্রম, (২) পূর্ণানন্দীয়া যোগচিন্তামণি নাম ষট্‌চক্রদীপিকা টীকা, (৩) মহীধর বিরচিত মন্ত্রমহোদধি, (৪) গোবিন্দাচার্য বিরচিত ত্রিপুরাসারসমুচ্চয় টীকা পদার্থাদর্শ, এবং (৫) হলায়ুধকৃত মৎস্যসূক্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক ডক্টর পুলিনবিহারী চক্রবর্তী মহাশয় মৎস্যসূক্তের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

মহাশয়ের উক্তরূপ মন্তব্য আংশিক সত্য হইলেও এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে মধ্যযুগে তান্ত্রিক সাধনা পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে ও মিথিলায়, বহু উচ্চবর্ণের ও উচ্চবংশের জনগণের মধ্যে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে হলায়ুধের ন্যায় এক বিশিষ্ট, পদস্থ ও শিক্ষিত ব্যক্তি তান্ত্রিক পূজা সমর্থন করিতেন। দুর্বোধ্য এবং অশুদ্ধ সংস্কৃতে বহু তান্ত্রিক গ্রন্থ লিখিত হইলেও মহানির্বাণতন্ত্রের ন্যায় অন্য অনেক এরূপ গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, যেগুলির ভাষা ও ভাব সমৃদ্ধি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে। অবশ্য ইহা সত্য যে কেহ কেহ মনে করেন এই তন্ত্র আধুনিক কালের, ও রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের গুরু স্বামী হরিহরানন্দ ভারতীর রচনা। কিন্তু এ মত সর্বজনগ্রাহ্য নহে; Arthur Avalon (Sir John Woodroffe) তাঁহার *Shakti and Shākta* গ্রন্থে ইহার আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ দিয়াছেন (পৃঃ ১২৪-২৫)। Avalon কয়েকটি এই জাতীয় তন্ত্রের সম্পাদনা করিয়া তান্ত্রিক তত্ত্বের সারত্ব ও মহত্ত্ব প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তান্ত্রিক গ্রন্থের অনেকগুলি শিব ও পার্বতীর মধ্যে সংলাপের আকারে লিখিত। দক্ষিণাম্নায়ভুক্ত বারাহীতন্ত্র গুহ্য কালিকা দেবী ও চণ্ডভৈরব দেবতার কথোপকথন বলিয়া বর্ণিত। ইহাতে বারাহী, মহাকাল প্রভৃতি দেবতার পূজাবিধি সবিস্তারে লিখিত আছে। তন্ত্রকার বলিয়াছেন যে সত্যযুগে বিড়াল রাক্ষসকে বধ করিবার জন্য দেবী বারাহী রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এ উক্তির প্রকৃত অর্থ বুঝা যায় না। বারাহীতন্ত্র যে বিশাল তন্ত্রসাহিত্যের আংশিক পরিচয় আমাদিগকে দেয়, এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে হিন্দুতন্ত্রে আলোচিত তত্ত্বসমূহ মৎস্যেন্দ্রনাথ, আদিনাথ, কণ্ঠনাথ প্রভৃতি নয় জন অবতারিতের দ্বারা মর্ত্যে আনীত হইয়াছিল। গোরক্ষনাথ প্রণীত হঠযোগপ্রদীপিকায় ইঁহাদের নাম পাওয়া যায়।

নাথপন্থিগণ পূর্বভারতীয় তান্ত্রিক পর্যায়ের এক বৃহৎ শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন; Wassiliev ইঁহাদের আরম্ভকাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমে স্থাপিত করেন। ইহা কথিত আছে যে মহাকৌলজ্ঞানবিনির্ণয় নামক অন্যতম মূলতন্ত্র মৎস্যেন্দ্রনাথের দ্বারা আনীত হইয়াছিল। ইহা বেশ প্রাচীন, কারণ ইহার পুঁথি গুপ্তোত্তর ব্রাহ্মীলিপিতে লিখিত। পুঁথিশেষে ইহা চন্দ্রদ্বীপ বিনির্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনার প্রকৃত অর্থ কি বলা যায় না; তবে ইহার অর্থ 'চন্দ্রদ্বীপ (পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জিলার অন্য নাম) হইতে আগত বা উদ্ভূত' বলিয়া ধরা যাইতে পারে। বঙ্গদেশের এই অঞ্চল তান্ত্রিক উপাসনার অন্যতম প্রধান ও প্রাচীন কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত আছে। কামাখ্যা গুহ্যতন্ত্র নামে একটি তন্ত্রের নামও মৎস্যেন্দ্রনাথেব সহিত জড়িত।

তান্ত্রিক ধর্মচর্যা ও উহার প্রাচীনত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে এখন যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের একটি শিলালেখই মনে হয় এ বিষয়ে আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম ইঙ্গিত প্রদান কবে। ইহা গাঙ্গধাব শিলালিপি; এবং ইহার কথা এই অধ্যায়ের গোড়াব দিকে কিছু বলা হইয়াছে। তান্ত্রিক ধর্মাচবণ যে প্রথমে খুব উগ্র প্রকৃতির ছিল উহাব উল্লেখ ইহাতে পাওয়া যায়। সামন্তরাজ বিশ্ববর্মনের সচিব ময়ূবাক্ষক মাতৃকাদিগের জন্য যে মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, লেখটিতে উহাকে 'অত্যুগ্র বেশ্ম' বলিয়া বর্ণনা কবা হইয়াছে। 'ইহা ডাকিনী পরিপূর্ণ ছিল; ইহাবা আনন্দে উচ্চ ও ভয়ঙ্কর কলরব করিত, এবং তাহাদেব ধর্মসংক্রান্ত তান্ত্রিক আচারাদি হইতে উত্থিত প্রবল বায়ু যেন সমুদ্রগণকে আলোড়িত করিত' (মাতৃণাঞ্চ প্রমুদিতঘনাত্যর্থ-নির্হ্রাদিনীনাং তন্ত্রোদ্ভূত প্রবল-পবনোদ্বর্তিতাম্ভোনিধীনাং ··গন্তমিদং ডাকিনী-সম্প্রকীর্ণাংবেশ্মত্যুগ্রং নৃপতিসচিবোঽকারয়ৎ পুণ্যহেতোঃ)। পববর্তী কালের বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে ডাকিনী, লাকিনী শাকিনী, যোগিনী প্রভৃতির কথা আছে। ইহারা তান্ত্রিক দেবী-

দিগের অনুচর বলিয়া কীর্তিত। কোষগ্রন্থে ডাকিনী কালীগণ-বিশেষঃ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গাঙ্গধার লেখের লিপিকার ডাকিনীদিগের কথা বলিয়া এবং উগ্র তান্ত্রিক আচারের উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবেই ইহার অতিমার্গিকতা সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে এই লেখটিতেই মনে হয় আমরা তন্ত্র কথাটি এইরূপ অর্থে সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হইতে দেখি। বৃহৎসংহিতাকার বরাহ-মিহিরও যে অতি অল্প কথায় মাতৃকাদিগের মণ্ডলক্রমানুযায়ী ধর্মানুষ্ঠানের বিষয় বলিয়াছেন ইহার পরিচয় একটু আগে দেওয়া হইয়াছে। আদি-মধ্যযুগে মধ্য ভারতে ও উড়িষ্যায় মণ্ডলাকারে চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের মন্দির তান্ত্রিক পূজার জন্য নির্মিত হইত; ইহা জব্বলপুরের নিকট নর্মদাতীরবর্তী ভেড়াঘাট চৌষট্টি যোগিনীর মন্দির-গুলির ধ্বংসাবশেষ, খাজুরাহোর উক্ত নামের মন্দির এবং উড়িষ্যাস্থিত হীরাপুর ও রাণীপুর ঝরিয়ালের চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরসমূহ হইতে জানা যায়। আদি-মধ্যযুগীয় তান্ত্রিক পূজার ভীষণতার কিঞ্চিৎ পরিচয় ভুবনেশ্বরস্থ বৈতাল দেউল মন্দিরের গর্ভগৃহে যে সব মূর্তি উৎকীর্ণ আছে উহা হইতেও পাওয়া যায়। ইহার গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ শবাসনা নির্মাংসা কৃশোদরী চামুণ্ডাদেবী দর্শকের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মূর্তিটি সত্যই ভীতিপ্রদ, এবং ইহা যে তান্ত্রিক সাধকের একাত্মিকা ভক্তির আধার ছিল ইহাতে বিস্মিত হইতে হয়। মূল বিগ্রহের দুই পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রে মাতৃকাগণের ও বীরভদ্র গণেশাদির মূর্তির সহিত আরও কয়েকটি মূর্তি খোদিত আছে। ইহাদের প্রত্যেকটির পরিচয় জানা নাই, তবে ইহাদের মধ্যে একটি ভয়ঙ্কর পুরুষ মূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্মশ্রুমণ্ডিত জটিল অস্থিসার ঊর্ধ্বলিঙ্গ দ্বিভুজ পুরুষ মৃতদেহের উপর যোগাসনে উপবিষ্ট; ইহার এক পার্শ্বে ছিন্নশির মনুষ্যদেহ এবং অন্য পার্শ্বে একটি শিবা নরমুণ্ডচর্বণে রত। ইহা কোনও দেবতার মূর্তি বা অত্যুগ্র প্রকৃতির যোগসাধনায় রত সিদ্ধবিদ্যা-

প্রয়াসী ঘোর তান্ত্রিক সাধকের মূর্তি, ইহা সঠিক বলা যায় না। বৈতাল দেউলের গর্ভগৃহ এত অন্ধকারপূর্ণ যে সাধারণ দর্শকের চক্ষে এইসব ভীষণ দৃশ্য পড়ে না। ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে (৩।৪ মাইল) অবস্থিত হীরাপুর চৌষট্টি যোগিনীর ক্ষুদ্র মন্দিরের প্রবেশপথের প্রাচীরগাত্রে দুইটি ধাবনশীল, শ্মশ্রু ও জটামণ্ডিত, কোটরগত অক্ষি, নির্মাংস, ঊর্ধ্ব-লিঙ্গ, খড়্গহস্ত নরমূর্তি খোদিত আছে ; ইহার পশ্চাতে অস্থিচর্বণশীল কুকুর বা শিবা ধাবমান। আমার মনে হয় এই মূর্তি দুইটি উগ্র তান্ত্রিক সাধকের, এবং বৈতাল দেউলের পূর্বোক্ত ঘোর মূর্তিটিও এই পর্যায়ের। হীরাপুরের যোগিনী মন্দির ছাদবিহীন দুইটি এককেন্দ্রিক ক্ষুদ্র ও নাতিবৃহৎ বৃত্তাকার মন্দির, এবং বৃত্ত দুটির ভিতরগাত্রে বিভিন্ন যোগিনীর ও মাতৃকাদিগের মূর্তি খোদিত। বৃহত্তর বৃত্তের বাহিরের প্রাচীরগাত্রে নয়টি দেবীমূর্তি দেখা যায় ; প্রত্যেক মূর্তি সুরূপা যুবতী কন্যার কর্তিত শিরের উপর দণ্ডায়মান। দেবীদিগের সঠিক পরিচয় কি জানা নাই, তবে স্থানীয় লোকেরা ইঁহাদিগকে নব কাত্যায়নী বলিয়া থাকেন। ইঁহাদের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক না কেন, এই আদি-মধ্যযুগীয় শক্তিমন্দির বৈতাল দেউলের ন্যায় তৎকালীন তান্ত্রিক শক্তি-উপাসক-গণের উগ্র ধর্মচর্যা সম্বন্ধে বিশিষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে। গাঙ্গধার শিলা-লিপিতে মাতৃকাদিগের মন্দির যে কি কারণে 'অত্যুগ্র বেশ্ম' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে উহা উড়িষ্যার উপরিলিখিত দুইটি মন্দিরসংস্থা হইতে বুঝা যায়।

প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ আমাদিগকে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসকের ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে যে তথ্য প্রদান করে উহার কথা এইমাত্র আলোচিত হইল। এখন ইহার অন্যান্য অঙ্গ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় তাঁহার সুলিখিত ও তথ্যপূর্ণ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া এ বিষয়ে বিশেষ

আলোকপাত করিয়াছেন। তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় গুরুবাদ অত্যন্ত প্রবল; কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন ইষ্টদেবীর বীজমন্ত্র গুরুর শ্রীমুখ হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রবণ করিয়া উপাসক বিধি-সঙ্গতভাবে দীক্ষিত হইতেন। পিচ্ছিলাতন্ত্রে ইহা উক্ত আছে যে, 'যাঁহার মুখে মহামন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায় ও শুনিয়া অভ্যাস করা হয়, তিনি পরম গুরু জানিবে। তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহাই সিদ্ধিদায়ক।'. গুরু-নির্বাচন সহজ ছিল না, এবং গুরুর আদর্শ অতি উচ্চ পর্যায়ের ছিল। গুরু আদর্শচ্যুত হইলে কিন্তু শিষ্যের পূর্বগুরু ত্যাগ করিয়া নানা সদ্‌গুণবিশিষ্ট নূতন গুরু বরণের অধিকার ছিল। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তাঁহার তন্ত্রসার নামক গ্রন্থে জ্ঞানার্ণব, শ্রীক্রম, ক্রিয়াসার, সারসংগ্রহ প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ হইতে মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই জাতীয় গ্রন্থাদিতে শিষ্য-লক্ষণ বিষয়েও অনেক কথা বলা আছে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে তান্ত্রিক উপাসনায় উপাসকের সদ্‌গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্তব্য। আগমবাগীশ এ বিষয়ে শাস্ত্রবচন উদ্ধৃত করিতেছেন—

দীক্ষামূলং জপং সর্বং দীক্ষামূলং পরং তপঃ।

*　　*　　*

অদীক্ষিতা যে কুর্বন্তি জপপূজাদিকা ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥

সকলরকম জপতপের মূলে দীক্ষা বর্তমান; যে উপাসক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া জপপূজাদি ক্রিয়া করেন, তাঁহাদের ঐ সকল ক্রিয়া পাষাণে বীজ বপনের ন্যায় (নিষ্ফল হয়)। তন্ত্রসারে সংক্ষেপ দীক্ষা, পঞ্চায়তনী দীক্ষা প্রভৃতি কয়েক প্রকার দীক্ষাবিধির কথা বলা আছে। পঞ্চায়তনী দীক্ষার পূজাক্রমের যে বর্ণনা যামল শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রসারকার দিয়াছেন উহা পাঠে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার কথা মনে হয়। এ বিষয় চতুর্দশ অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। দীক্ষা

গ্রহণকালে শিষ্য গুরুর নিকট হইতে তাঁহার ইষ্টদেবতার পরিচায়ক বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্র গুহ্যাতিগুহ্য, এবং ইহার প্রকৃত অর্থ দুর্বোধ্য। দত্ত মহাশয় কতকগুলি বীজমন্ত্র তাঁহার গ্রন্থে (পৃঃ ১৫৮-৫৯) উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমি ঐগুলি হইতে কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি। তারা বীজ—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্; দুর্গা বীজ—ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ; মহালক্ষ্মী বীজ—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হ্সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ; বাগীশ্বরী বীজ—বদ বদ বাগ্বাদিনী স্বাহা, ইত্যাদি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে অধিকাংশ বীজমন্ত্র ত্রিলিঙ্গাত্মক; যেগুলির শেষে হুঁ ফট্ আছে উহারা পুংলিঙ্গ, স্বাহা শব্দান্ত মন্ত্র স্ত্রীলিঙ্গ এবং নমঃ শব্দান্ত মন্ত্র ক্লীবলিঙ্গ (পুং মন্ত্রা হুঁ ফড়ন্তা স্যু দ্বিঠান্তাস্তু স্ত্রিয়ো মতাঃ। নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যু মন্ত্রবস্ত্রিবিধা স্মৃতাঃ)। এই উক্তি অনুযায়ী তারা বীজ পুংলিঙ্গ, বাগীশ্বরী বীজ স্ত্রীলিঙ্গ এবং দুর্গা ও মহালক্ষ্মীর বীজমন্ত্র ক্লীবলিঙ্গ। কোনও কোনও তান্ত্রিক গ্রন্থে বীজমন্ত্রগুলি একাক্ষরসমুল্লাপ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

দীক্ষিত শক্তি-উপাসকেরা সাধারণতঃ পশ্বাচারী এবং বীরাচারী নামক দুইটি প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিলেন। কুলার্ণব তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে শাক্ত সম্প্রদায়ের সাতটি আচার বা বিভাগের কথা বলা হইয়াছে,—যথা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। একৈক ক্রমে প্রতিটি আচার উহার পূর্বস্থ আচার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কৌলাচার সর্বোত্তম, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কোনও আচার নাই (কৌলাৎ পরতরং ন হি)। বেদাচার বলিতে বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বুঝায় না। নিত্যাতন্ত্রের বর্ণনানুযায়ী বেদাচারপরায়ণ তান্ত্রিক সাধক ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করিয়া গুরুর নাম স্মরণপূর্বক আনন্দনাথের নাম উচ্চারণ ও তাঁহাকে প্রণাম করিবেন এবং সহস্রারপদ্মে তাঁহার ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে তাঁহার পূজা করিবেন; পরে বাগ্ভব বীজমন্ত্র জপ করিয়া পরমা

শক্তির ধ্যান করিবেন। বৈষ্ণবাচারও অনেকাংশে বেদাচারের ন্যায়, ইহাতে মৈথুন বা তৎসম্বন্ধীয় জল্পনা নিষিদ্ধ, এবং নিন্দা, কপটাচরণ, হিংসা, মাংসভোজন ইত্যাদি বর্জনীয়। শৈব তথা শক্ত্যাচারেও অনুরূপ বিধান, তবে ইহাতে পশুবলি নিষিদ্ধ নহে। দক্ষিণাচারে বেদাচারের নিয়ম পালনীয়, এবং ভগবতীর পূজা ও মন্ত্রজপ অবশ্য কর্তব্য। বামাচারপরায়ণ সাধক বিহিতবিধানে কুলস্ত্রীর পূজা করিবেন; কুলস্ত্রী বামাস্বরূপা পরমাশক্তির প্রতীক, এবং ইহার পূজায় পঞ্চতত্ত্ব ও খপুষ্পাদির ব্যবহার কর্তব্য।[১] সিদ্ধান্তাচার অনেকাংশে বামাচারের ন্যায়; ইহাতে সকল প্রকার দ্রব্যই (উহার মধ্যে মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ব্যতীত খপুষ্পাদির মত দ্রব্যও আছে) মন্ত্রের সাহায্যে শোধন করা যায়। সিদ্ধান্তাচারী নিত্য দেবপূজা-পরায়ণ হইবেন, দিবসে বিষ্ণুপূজা করিবেন ও রাত্রিতে ভক্তিপূর্বক বিধিসঙ্গতভাবে মদ্য ইত্যাদি দান ও গ্রহণ করিবেন। নিত্যাতন্ত্রের তৃতীয় পটলে সর্বোত্তম কৌলাচারের যে বিবরণ দেওয়া আছে, উহা পাঠ করিলে স্বতঃই উগ্রতান্ত্রিক পাশুপতাদি সম্প্রদায়ের আচরিত বিধির কথাই মনে হয়। তন্ত্রকার বলিতেছেন—

---

১ পঞ্চতত্ত্বের আর এক নাম পঞ্চ মকার—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুন। মুদ্রা বলিতে মদ্যের সহিত যে উপকরণ ভক্ষিত হয় তাহাকেই বুঝায়; বামাচারী তান্ত্রিকেরা মদ্য সহ মৎস্য, মাংস ব্যতীত 'চালভাজা' জাতীয় দ্রব্য ভক্ষণ করেন, ইহা মুদ্রা বলিয়া পরিচিত। শ্যামারহস্যের উক্তি অনুযায়ী বামাচারীদিগের এই পঞ্চ মকার মহাপাপ বিনাশ করে। খপুষ্পের অর্থ রজঃস্বলা স্ত্রীলোকের রজ; প্রথম রজ, সধবা স্ত্রীর রজ, বিধবা নারীর রজ এবং চণ্ডালীর রজ যথাক্রমে স্বয়ম্ভুপুষ্প, কুণ্ডপুষ্প, গোলকপুষ্প এবং বজ্রপুষ্প নামে অভিহিত। ঘোর বামাচারী তান্ত্রিক উপাসনায় ইহাদের আনুষ্ঠানিক ব্যবহার প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত হইত।

দিক্কালনিয়মো নাস্তি তিথ্যাদিনিয়মো ন চ।
নিয়মো নাস্তি দেবেশি মহামন্ত্রস্য সাধনে॥
ক্কচিৎ শিষ্টঃ ক্কচিৎ ভ্রষ্টঃ ক্কচিৎ ভূতপিশাচবৎ।
নানাবেশধরাঃ কৌলাঃ বিচরন্তি মহীতলে॥
কর্দমে চন্দনেঽভিন্নং পুত্রে শত্রৌ তথা প্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি স কৌলঃ পরিকীর্তিতঃ॥

'মহামন্ত্র সাধনে দিক ও কালের নিয়ম নাই; তিথি ও নক্ষত্রাদিরও নিয়ম নাই। কোনও স্থানে শিষ্ট, কুত্রাপি ভ্রষ্ট, কোথাও বা ভূতপিশাচ-তুল্য এইপ্রকার নানা বেশধারী কৌল সমুদয় পৃথিবীতে বিচরণ করেন। প্রিয়ে! কর্দম ও চন্দনে এবং পুত্র ও শত্রুতে যাঁহার ভেদ জ্ঞান নাই, আর দেবী! শ্মশান ও গৃহে এবং কাঞ্চন ও তৃণে যাঁহার প্রভেদ বোধ নাই, সেই ব্যক্তি কৌল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন' (অক্ষয়-কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৬৩)।

তন্ত্রসাহিত্যে তান্ত্রিক উপাসক-গোষ্ঠীর সাত প্রকার বিভাগ নির্দিষ্ট হইলেও ব্যবহারিকভাবে উহার দুইটি প্রধান বিভাগ, যথা দক্ষিণাচার ও বামাচার। সৌন্দর্যলহরীর সুবিখ্যাত ভাষ্যকার লক্ষ্মীধর আবার তান্ত্রিক উপাসকদিগকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; এই তিনভাগের নাম, সময়াচার, মিশ্রাচার ও কৌলাচার। সময়াচারী বা সময়িগণ এক হিসাবে দক্ষিণাচার পর্যায়ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তৃতীয় বিভাগের অন্তর্ভুক্ত কৌলগণ বামাচারী পর্যায়ের। পূর্বকথিত সপ্তবিভাগের প্রথম চারিটি (ইহার মধ্যে দক্ষিণাচারও আছে) প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণাচার পর্যায়ভুক্ত, ও শেষ তিনটি (বামাচার ইহাদের অন্যতম) বামাচার সম্পর্কিত। দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক সাধকের উপাসনা-পদ্ধতি মূলতঃ সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও প্রকাশ্যভাবে ভগবতীর ঐকান্তিক অর্চনায়

পর্যবসিত, ইহাতে মদ্যাদির ব্যবহার ও 'শক্তি-সাধনা' কর্তব্য নহে। কাশীনাথ কৃত দক্ষিণাচার তন্ত্ররাজে এই জাতীয় উপাসকের ধর্মগত অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ ও বেদসম্মত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বামাচারী কৌল তান্ত্রিকের পঞ্চ-মকারযুক্ত ধর্মাচরণ প্রসঙ্গে নিরুত্তর তন্ত্রের প্রথম পটলে বলা হইয়াছে যে কুলক্রিয়া সকল নিশিযোগে করাই উচিত (রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কুর্যাৎ)। দিনমানে কৌল বেদাচার পালন করিবেন (দিবা কুর্যাচ্চ বৈদিকীম্); শ্যামারহস্যে বলা হইয়াছে যে কৌল নিজ প্রকৃত রূপ প্রচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত অন্তরে শাক্ত বাহিরে শৈব ও সভামধ্যে বৈষ্ণবমতাশ্রয়ী হইয়া জগতে বিচরণ করেন (অন্তঃ শাক্তা বহিঃশৈবা সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ। নানারূপধরাঃ কৌলা বিচরন্তি মহীতলে)। এই প্রসঙ্গে শ্যামাসন্তোষণ গ্রন্থোক্ত ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ গৃহস্থ অবধূতের লক্ষণ বিচার্য। অব্যক্ত গৃহস্থ অবধূতের আচরণ শ্যামারহস্যোক্ত কৌল তান্ত্রিকের আচরণের অনুরূপ। ব্যক্ত অবধূত 'হর্ষযুক্ত, রক্তবস্ত্রে আবৃত, ললাটে সিন্দূরযুক্ত, তেজে শিব স্বরূপ, রক্তবর্ণ মালাবিশিষ্ট ও রক্তচন্দনাদি সংযুক্ত'। তান্ত্রিক সাধকের পূজাও আবার দুই প্রকার, যথা বাহ্য পূজা ও অন্তর্যাগ। 'গন্ধ, পুষ্প, ভক্ষ্য, পানীয় প্রদানাদি দ্বারা যে পূজা হয়, তাহাই বাহ্য পূজা, এবং চিৎরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি কল্পিত উপচারাদির দ্বারা যে আন্তরিক সাধন, তাহার নাম অন্তর্যাগ। ষট্চক্রভেদ এই অন্তর্যাগের প্রধান অঙ্গ' (অক্ষয়কুমার দত্ত, উপরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৬৬)। ষট্‌-চক্রভেদের কথা একটু পরে বলা হইবে। বীরাচারী কৌল তান্ত্রিক অন্তর্যাগ সাধনেও মদ্য মাংসাদির সাহায্যে দেবীর পূজা করিবেন, কারণ কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত আছে যে মদ্য ও মাংস যথাক্রমে শক্তি ও শিব স্বরূপ, এবং বীরাচারী ভক্ত সাধক স্বয়ং ভৈরব; এই তিন একত্র হইলে, আনন্দরূপ মোক্ষ উৎপন্ন হয়।

অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় বঙ্গদেশীয় বীরাচারীদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত

চক্র করিয়া দেব-দেবীর সাধনা সম্পর্কে বিভিন্ন তন্ত্র হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ সকল বিবরণ বর্তমান গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইল না। নিরুত্তর, প্রাণতোষিণী, গুপ্তসাধন, কুলার্ণব প্রভৃতি তন্ত্রগ্রন্থে এইসব প্রক্রিয়ার যে বর্ণনা দেওয়া আছে, উহা পাঠে উগ্র তান্ত্রিক ধর্মাচরণ যে কেন অনেকের নিন্দা ও তীব্র সমালোচনার কারণ হইয়াছিল উহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক স্থলে আবার এমন সব উক্তি আছে যাহা হইতে কোনও কোনও তান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্যরূপ নির্দোষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আমি এখানে মাত্র একটি উদাহরণ দিতেছি। কুলার্ণবের একটি উক্তি, যথা— 'সুরা শক্তিঃ শিবোমাংসং তদ্ভোক্তা ভৈরবঃ স্বয়ম্। তয়োরৈক্যে সমুৎপন্নে আনন্দো মোক্ষ উচ্যতে', ইহার কথা একটু আগে বলিয়াছি। কিন্তু অন্তর্যজনের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে ঐ তন্ত্রেই এমন সব উক্তি বর্তমান, যাহা হইতে আগের রূপকটি যে কিরূপ নির্দোষ উহা প্রমাণিত হয়। আনন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, উহা সাধকের নিজ দেহেই অবস্থিত। চিন্ময় পরশিব সহ কুণ্ডলিনী শক্তির সামরস্য সম্পাদনপূর্বক সহস্রদল কমল মধ্যগত চন্দ্রমণ্ডল হইতে সাধক যে পীযূষধারা পান করেন তাহাতেই তাঁহার মধুপান করা হয়। তবে উক্ত তন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডে সাধকের আনন্দোল্লাসের এমন বর্ণনা দেওয়া আছে যাহার অশ্লীলতার অন্য কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এই সকল কার্যের দ্বারা যোগসিদ্ধি লাভ বীরাচারী সাধকের কাম্য ছিল ত বটেই, পরন্তু নানারূপ অভিচারমূলক ক্রিয়ায় সাফল্যও তাঁহার বাঞ্ছনীয় ছিল। যোগিনীতন্ত্রের পূর্বখণ্ডে উক্ত আছে যে শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ছয় প্রকার কর্ম তান্ত্রিক সাধকের করণীয় ছিল। তালিকাটিতে শান্তি ব্যতীত আর পাঁচ প্রকার কর্মই অভিচার সম্বন্ধীয়: সাধক এইভাবে তাঁহার শত্রুদিগের অনিষ্টসাধন করিতে চেষ্টা করিতেন। বীরাচারী উপাসকগণ যেরূপ সিদ্ধিব্যপদেশে ও অপরের অনিষ্ট-

কামনায় চক্রাকারে মিলিত হইয়া সর্বতোভদ্রমণ্ডল, স্বল্পসর্বতোভদ্রমণ্ডল, লবণাভমণ্ডল ইত্যাদি মণ্ডলে নানারূপ ক্রিয়ারত থাকিতেন, সেরূপ কুলাকুলচক্র, নক্ষত্রচক্র, অকথহচক্র, অকডমচক্র, ঋণী ধনীচক্র, কূর্মচক্র, মাতৃকাযন্ত্র, বিশালাক্ষীযন্ত্র, দুর্গাযন্ত্র প্রভৃতি অঙ্কিত করিয়া ঐ সকলে মন্ত্রাদি সহকারে দেবীপূজা করিতেন। মন্ত্রাদির সর্বোত্তম বীজমন্ত্রের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এখন তন্ত্রসার হইতে কয়েকটি দেবী গায়ত্রী উদ্ধৃত করিতেছি। শক্তি গায়ত্রী—সর্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে বিশ্বজনন্যৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ; ত্বরিতা গায়ত্রী—ত্বরিতায়ৈ বিদ্মহে মহানিত্যা'য়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ; ত্রিপুরাসুন্দরী গায়ত্রী—ঐঁ ত্রিপুরাদেব্যৈ বিদ্মহে ক্লীঁ কামেশ্বর্যৈ ধীমহি সৌস্তনঃ ক্লিন্নে প্রচোদয়াৎ; দুর্গা গায়ত্রী—মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ; লক্ষ্মী গায়ত্রী—মহালক্ষ্মৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ, ইত্যাদি। এই সকল গায়ত্রীমন্ত্রের গঠনশৈলী ব্যাহৃতি-মুক্ত বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ সাধারণভাবে অথর্ববেদের, বিশেষ করিয়া ইহার পৈপ্পলাদ শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রহ্মযামলের অন্তর্গত যোগিনীবিজয়-স্তবরাজ (ইহার পুঁথি ৮১১ নেওয়ারী সম্বতে প্রথম লিখিত হয়) সম্বন্ধে কথিত আছে যে ইহা প্রথমে শিব তাঁহার পত্নী পার্বতীকে বলেন, এবং পরে পিপ্পলাদ মুনি ইহাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আনয়ন করেন। রুদ্রযামলে শক্তি বুদ্ধেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং তাঁহার আর এক নাম এখানে অথর্ববেদ শাখিনী। মনে হয় এই সব ও অনুরূপ উপায়ে বেদবাহ্য তান্ত্রিক আচার ও সাহিত্য ইত্যাদিকে বৈদিক আচার ও সাহিত্যের সমপর্যায়ে আনয়ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।

তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রচলন যে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

তবে ইহার প্রাচীনতম প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ মধ্যভারতে প্রাপ্ত প্রথম কুমারগুপ্তের সমকালীন গাঙ্গধার শিলালিপি ; ইহার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। গুপ্তোত্তর যুগের (আনুমানিক ৮ম—৯ম খৃষ্টীয় শতকের) জব্বলপুরের নিকটবর্তী নর্মদাতীরস্থ ভেড়াঘাটের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। পরবর্তী কালে শক্তিপূজা গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিল ও তেলেগু ভাষাভাষী প্রদেশ-সমূহেও ন্যূনাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ইহার কিছু সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগে ও পরে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনা যে পূর্ব ভারতে, বিশেষ করিয়া—উড়িষ্যা, বাংলা, মিথিলা ও কামরূপ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা প্রত্নতত্ত্ব ও সাহিত্যগত প্রমাণ আমাদিগকে যুগপৎ জানাইয়া দেয়। উড়িষ্যার হীরাপুর, রানীপুর ঝরিয়াল, বৈতাল দেউল প্রভৃতি শক্তিমন্দিরের কথা বলিয়াছি। তান্ত্রিক গ্রন্থমালার একটি বিশিষ্ট ও প্রামাণ্য অংশ অনেকের মতে বাংলায় ও তৎপার্শ্ববর্তী স্থানসমূহে রচিত হইয়াছিল। উড়িষ্যা যে তান্ত্রিক সাধনার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র ছিল, উহার সাহিত্যগত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে ওডিয়ান নামক স্থান, যাহা চারিটি তান্ত্রিক ক্ষেত্রের অন্যতম (আনুমানিক ৮ম শতকের হেবজ্র তন্ত্রে এইরূপ চারি ক্ষেত্রের উল্লেখ আছে—জালন্ধর, ওডিয়ান, পূর্ণগিরি ও কামরূপ), বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশকেই বুঝায়। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ওডিয়ান ভারতের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত প্রাচীন উড্ডান (বর্তমান সোয়াট নদীর উপত্যকা,—ইহা প্রাচীন গন্ধারের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে স্থিত) প্রদেশ। এই মতের কিছু সমর্থনসূচক ইঙ্গিত মনে হয় হিউয়েন সাংএর সি-ইউ-কিতে পাওয়া যায়। চীন পরিব্রাজক এখানকার অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহারা ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রাদি সাধনেই (আসলে তান্ত্রিক মন্ত্রাদি) প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকিতেন। ভারতের উত্তর প্রান্তস্থ পঞ্জাব

প্রদেশের জালন্ধরে যে তান্ত্রিক উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল উহা হেবজ্র তন্ত্রের উপরিলিখিত উক্তি সপ্রমাণ করে। ওডিয়ান ও প্রাচীন উড্ডানের একত্ব গৃহীত হইলেও উড়িষ্যা যে মধ্যযুগে তান্ত্রিক উপাসনার প্রধান ক্ষেত্র ছিল ইহা অপ্রমাণিত হয় না। পঞ্চোপাসনার পঞ্চক্ষেত্র এখানে এইরূপে অবস্থিত, যথা বৈষ্ণব-শ্রীক্ষেত্র (পুরী), শৈব-একাম্রক্ষেত্র (ভুবনেশ্বর), শক্তি-বিরজাক্ষেত্র (যাজপুর), সৌর-অর্কক্ষেত্র (কোনার্ক-কোনারক), গাণপত্য-গণপতিক্ষেত্র (কপিলাশ রোড স্টেশন সন্নিকট মহাবিনায়ক পর্বত)। উড়িষ্যার বৈষ্ণব ও শৈব ক্ষেত্রেও শাক্ত উপাসনার প্রভাব বিশেষ ভাবে বর্তমান ছিল এবং এখনও আছে; উহার প্রমাণ জগন্নাথের মন্দিরাভ্যন্তরে বিমলা ও অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা-মন্দির এবং জগন্নাথের পূজাক্রমে কিছু প্রচ্ছন্ন তান্ত্রিক বিধি, ও ভুবনেশ্বরে অনন্ত বাসুদেবের (প্রকৃতপক্ষে একানংশার,—জগন্নাথ মন্দিরের প্রধান বিগ্রহত্রয় যে একত্রে দেবী একানংশাকে রূপায়িত করে ইহা একাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছি) মন্দির এবং বৈতাল দেউল, মোহিনী, ভুবাসিনী প্রভৃতি দেবীর মন্দির হইতে পাওয়া যায়। পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরস্থ সপ্তমাতৃকার মূর্তিগুলি, যাজপুরে প্রাপ্ত অনুরূপ মূর্তি, এবং প্রদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুর্গা, মহিষাসুরমর্দিনী, দন্তুরা প্রভৃতি মধ্যযুগের শক্তিমূর্তিসমূহ এবিষয়ক অতিরিক্ত প্রমাণ। আসাম বা কামরূপেও যে তান্ত্রিক উপাসনার প্রাবল্য ছিল, এবং এখনও আছে উহার সম্বন্ধে কামাখ্যায় অবস্থিত যোনিপীঠ ও তত্রত্য কামাখ্যা দেবীর মন্দির সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখি যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে ও তাহার পরে এই যোনিপীঠ ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ গন্ধার প্রদেশে অবস্থিত ছিল। এ বিষয়ে মহাভারত, মহামায়ূরী ও সি-ইউ-কি (হিউয়েন সাংএর ভ্রমণ-বিবরণী) প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয়। ইহার কথা আগে বলিয়াছি। কামাখ্যাতন্ত্র নামে একটি তান্ত্রিক গ্রন্থের কথা কিছু আগে বলা হইয়াছে। ইহাও কামরূপ প্রদেশে শক্তি-উপাসনার

বিস্তৃতি প্রমাণিত করে। উত্তর বিহারে, তথা মিথিলায়ও তান্ত্রিক শক্তিপূজার সমাধিক প্রচলন ছিল; উহার সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ পাওয়া যায়। হেবজ্র তন্ত্রের এবং সাধনমালাস্থ বজ্রযোগিনী সাধনের পূর্ণগিরি যে কোথায় অবস্থিত ছিল উহা সঠিক বলা যায় না। তবে দক্ষিণ ভারতেব শ্রীশৈলম্ নামক স্থান শক্তি-উপাসনার সহিত জড়িত। পূর্ণগিরির সহিত উহার ঐক্য সমর্থন করা যাইতে পারে। সাধনমালাস্থ দুইটি সাধনে (সংখ্যা ২৩২ ও ২৩৪) চারিটি তান্ত্রিক ক্ষেত্রের (ওডিয়ান, পূর্ণগিরি, কামাখ্যা ও সিরিহট্ট) পূজার বিধান দেওয়া আছে।

মধ্যযুগে ও উহার পরেও বাংলাদেশই যে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনাব প্রধানতম ক্ষেত্র ছিল এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। তৎকালীন বিভিন্ন জাতীয় দেবীমূর্তি এ দেশে এত আবিষ্কৃত হইয়াছে, যে ঐগুলি হইতেই জানা যায় যে এ স্থানের অধিবাসীরা কি পরিমাণে দেবী-উপাসক ছিলেন।[১] এতদ্দেশে প্রচলিত বিষ্ণু ও শিবের উপাসনাতেও শক্তি-পূজার একটি বিশিষ্ট প্রভাব পবিলক্ষিত হয়। কৃষ্ণপূজায় তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি রাধার ও শিবের পূজায় তাঁহার ঘরণী দুর্গা-পার্বতীর অংশ প্রধান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উত্তর-মধ্যযুগের পরবর্তী কালের কালীমূর্তি বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকের নিজস্ব পরিকল্পনা। এই মূর্তির রূপায়ণে বজ্রযান বৌদ্ধ দেবতা নৈরাত্মাব কোনও প্রভাব ছিল কিনা বলা যায় না; তবে ইহা অনস্বীকার্য যে উভয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য আছে এবং কালীমূর্তির প্রাচীনত্ব অধিক নহে।[২] ন্যূনাধিক তিন

---

১ বর্তমান গ্রন্থকার *Dacca History of Bengal,* Vol. I এর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই মূর্তিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন।

২ ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্য তাঁহার *Buddhist Icnography* নামক গ্রন্থে নৈরাত্মার যথার্থ পরিচয় সম্বন্ধে সুযুক্তি দিয়াছেন (১ম সংস্করণ,

শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গীয় তান্ত্রিক সাধকের উপাস্য হিসাবে দেবীর এই উগ্ররূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ শক্তি-উপাসকগণ যে ভাব ও ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত সুললিত বাংলা ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন উহা আজিও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙ্গালী জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও আদরের বস্তু। এ দেশে যে দশ মহাবিদ্যার সাধারণ প্রচলিত তালিকা আছে কালিকা দেবী উহার সর্বপ্রথম। তালিকাটি এই—

কালী তারা মহাবিদ্যা-ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতে দশ মহাবিদ্যা সিদ্ধবিদ্যা প্রকীর্তিতাঃ॥

এই শ্লোক দুইটি চামুণ্ডা ও মুণ্ডমালা তন্ত্র হইতে গৃহীত।[১] তন্ত্রদ্বয় যে খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহা কৃষ্ণানন্দ

পৃঃ ৯০-১)। স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাকে কালী নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রান্তির মূলে বোধ হয় দুই দেবতামূর্তির আপাতদৃষ্টিতে কিছু আকৃতিগত সাদৃশ্যই বর্তমান ছিল। কিংবদন্তী এই যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নাকি কালীরূপ কল্পনার আদি স্রষ্টা। ইহা সত্য কিনা জোর করিয়া বলা যায় না।

১ মুণ্ডমালা তন্ত্র হইতে ৪।৫টি শ্লোক মহাবিদ্যাদিগের দশাবতার পরিচায়ক বলিয়া তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে (মহাবিদ্যানাং দশাবতারত্বং যথা)। বিষ্ণু প্রকৃতিরূপে ও শিব পুরুষরূপে কল্পিত হইয়াছেন, এবং বিষ্ণুরূপ প্রকৃতির দশটি ভেদ তাঁহার দশাবতার। কালিকা কৃষ্ণরূপা, তারিণী (তারা) রাম, বগলা কূর্ম, ধূমাবতী মীন, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভৈরবী বরাহ, সুন্দরী (ষোড়শী) পরশুরাম, ভুবনেশ্বরী বামন, কমলা বৌদ্ধ (বুদ্ধ) এবং দুর্গা কল্কী। তন্ত্রকার এই শ্লোক কয়টিতে নিজস্ব ধারায় বৈষ্ণব ও শাক্ত দেবতাখ্যানের (mythology) কিঞ্চিৎ সামঞ্জস্য করিয়াছেন।

আগমবাগীশের তন্ত্রসারে উহাদের উল্লেখ হইতে জানা যায়। আগম বাগীশ মহাশয় মালিনীবিজয় নামক তন্ত্র হইতে দ্বাদশটি (?) মহাবিদ্যার নাম সম্বলিত চারিটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইঁহাদের নাম এইরূপ— কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তিকা, বাগ্বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী। তবে কামাখ্যাবাসিনী ও শৈলবাসিনী যদি বালা ও মাতঙ্গীর বিশেষণ রূপে ধরা হয়, তাহা হইলে সংখ্যা ঠিক দশই হয়। চামুণ্ডা ও মুণ্ডমালা তন্ত্র হইতে আগমবাগীশ মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত দশমহাবিদ্যার এই তালিকা কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে মহীধব বিরচিত মন্ত্রমহোদধি গ্রন্থে কালী, তারা, ছিন্নমস্তা ও সুন্দরী (ষোড়শী) এই কয়টি নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা যে মহাবিদ্যা এ অনুমান সঙ্গত। মহাধর ঠিক কোন সময়ের লোক ছিলেন তাহা বলা যায় না; তবে তিনি বঙ্গদেশীয় ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। দেবীগোষ্ঠী হিসাবে সিদ্ধবিদ্যা-মহাবিদ্যার কল্পনা বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক সাধকদিগেরই দান। সেনবংশীয় মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রের মৎস্যসূক্তের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। হলায়ুধ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; তৎপ্রণীত মৎস্যসূক্তের ষষ্টি ও একষষ্টি পটলেব বিষয়বস্তু বিদ্য(দ্যো)দ্ধাব এবং মহাবিদ্যোদ্ধার। এ প্রসঙ্গে যদিও তিনি দশ মহাবিদ্যার কথা স্পষ্টতঃ বলেন নাই, তবে ইঁহাদিগের অন্যতম মাতঙ্গিনী বা মাতঙ্গীব কথা বলিয়াছেন। দশসংখ্যক মহাবিদ্যার কল্পনা হলায়ুধ মিশ্রের পরে বঙ্গদেশে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। ইঁহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি মহাবিদ্যার রূপ যে সুপ্রাচীন কালে কল্পিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইনি কমলা; খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের ভরহুতের স্তুপবেষ্টনীতে শ্রীদেবী বা গজলক্ষ্মীর মূর্তি খোদিত দেখা যায়। ইহার সহিত কমলার পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। ছিন্নমস্তা বা ছিন্নমস্তিকার তন্ত্রসারধৃত আর এক নাম

প্রচণ্ডচণ্ডিকা। বিশ্বসারযামল হইতে প্রচণ্ডচণ্ডিকার মন্ত্র উদ্ধার প্রসঙ্গে এ গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে ইনিই ছিন্নমস্তা (ছিন্নমস্তা স্মৃতা দেবী)। ভৈরবতন্ত্র হইতে ইঁহার যে ধ্যান তন্ত্রসারে উদ্ধৃত হইয়াছে উহার সহিত বজ্রযান সাধনার ভট্টারিকা বজ্রযোগিনীর অন্যতম ধ্যান (সংখ্যা ২৩১) আশ্চর্যরূপে মিলিয়া যায়। এইসব লক্ষণ হইতে অনেক বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার একাত্মতা নির্দিষ্ট হয়।

বঙ্গদেশে শক্তিপূজার অন্যতম বিশেষ প্রকাশ শারদীয় দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এখন, কিছু বলা আবশ্যক। যে প্রথায় প্রতি বৎসর আশ্বিন-কার্তিক মাসে বঙ্গদেশের সর্বত্র দশভুজা মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গাদেবীর মৃন্ময়ী মূর্তি কয়েকদিন ধরিয়া পূজাপূর্বক বিজয়া দশমীতে বিসর্জন দেওয়া হয়, উহার সমধিক প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে ঠিক করিয়া কিছু বলা যায় না। বঙ্গদেশে এবং অন্যত্র আদি-মধ্যযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তর-মধ্যযুগ পর্যন্ত যে সকল প্রস্তর বা ধাতু-নির্মিত মহিষমর্দিনী মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, উহাতে সচরাচর মহিষাসুরের সহিত যুদ্ধরত অবস্থায় দশপ্রহরণধারিণী দেবীকে এবং দেবীর বাহন সিংহ ও কর্তিতশির মহিষের দেহ হইতে নির্গমনশীল নররূপী অসুরকে দেখানো হইয়া থাকে। বাংলার শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমায় যেরূপ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশকে অতিরিক্ত পরিবার দেবতা রূপে দেখানো হয়, সেরূপ কোনও প্রাচীন ধাতু বা প্রস্তরনির্মিত মূর্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে শারদীয়া মৃন্ময়ী দুর্গাপ্রতিমা প্রতি বৎসর পূজার পর জলে বিসর্জিত করা, এবং পূর্ব পূর্ব বৎসরের 'কাঠামো'র উপর নূতন করিয়া নির্মাণ করাই বিধি। সুতরাং এরূপ মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ ও পূজাশৈলী যে কত প্রাচীন উহার প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ সংগ্রহ করা অসম্ভব। এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহিত্যগত সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। দেবীমাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য ঋষি

মেধসের নিকট হইতে মহামায়া-দুর্গাতত্ত্ব সবিশেষ জানিয়া নদীতীরে গমন করেন, এবং সেখানে অবস্থানপূর্বক জগন্মাতার দর্শনলাভ কামনায় শ্রেষ্ঠ জপ দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া ও সেই নদীতটে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদির দ্বারা পূজা করেন (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯২ অধ্যায়, শ্লোকসংখ্যা ৯-১১)। এখানে 'মহীময়ী মূর্তি' পূজার কথা আছে সত্য, কিন্তু মূর্তি ও মূর্তি-পরিবারাদির কোনও বর্ণনা নাই। রাজা ও বৈশ্য তিন বৎসর এইরূপ পূজা করিয়া তবে দেবীর দর্শন পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ হইতে জানা যায় যে পূজাশেষে তাঁহারা মৃন্ময়ী প্রতিমা নদীতে বিসর্জন দিয়াছিলেন। মৃন্ময়ী মূর্তি ক্ষণিক পর্যায়ের, এবং ইহা নদীজলে বিসর্জিত করাই স্বাভাবিক। সুরথ রাজার দেবীপূজার সময় শরৎকালে ছিল না, উহা বসন্তকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী। আজিও ইহার অনুকল্প রূপে বসন্তকালে বাসন্তী নামে দেবীর পূজা বাংলাদেশে অল্প প্রচলিত আছে। শরৎকালে দেবীর যে পূজা ব্যাপকভাবে এ দেশে প্রচলিত উহার অন্যতম প্রথম উল্লেখ আমরা কালিকাপুরাণে পাই। ইহার পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক এইরূপ—

শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ মানব॥

'যেহেতু পূর্বে শরৎকালে দেবগণ কর্তৃক মহাদেবী বোধিত হইয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত পীঠস্থানে এবং লোকমধ্যে তিনি শারদা নামে বিখ্যাত হন।' এখানে দেবগণ কর্তৃক তাঁহার শরৎকালে বোধনের কথা বলা হইয়াছে, কৃত্তিবাস কথিত শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা অকালে তাঁহার বোধনের কথা নাই। পূর্ব অধ্যায়ে আমি বলিয়াছি বঙ্গদেশীয় শারদীয়া পূজার অন্যতম ভিত্তি কৃত্তিবাসী রামায়ণ। কালিকাপুরাণ বাংলাদেশেই রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহার রচনাকাল কৃত্তিবাসের

পূর্বে ; ইহাতে শারদীয়া পূজার কথা আছে, কিন্তু দেবতাদিগকেই এই পূজার প্রথম প্রবর্তক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রঘুনন্দন প্রমুখ প্রসিদ্ধ বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকারদিগের গ্রন্থে আমরা শারদীয় দুর্গোৎসবের বিবরণ পাই। স্মার্ত রঘুনন্দন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁহার অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত শ্রীদুর্গোৎসবতত্ত্বে তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রন্থকার ও পূর্বপ্রচলিত প্রবচনাদির উপর নির্ভর করিয়া তিনি পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কালিকাপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে তিনি এতৎসম্পর্কিত অনেক উপাদান সংগ্রহ করেন। বাচস্পতি মিশ্র, শ্রীনাথ, শূলপাণি, জীমূতবাহন, রামকৃষ্ণ প্রভৃতি রঘুনন্দনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নিবন্ধকারগণ তাঁহাদের দুর্গাপূজা সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহে দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তিপূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি তাঁহার দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী নামক গ্রন্থেও দেবীর এইরূপ মূর্তির পূজার্চনার কথা লিখিয়াছেন। শূলপাণি ও জীমূতবাহন একই সময়ে বর্তমান ছিলেন। শূলপাণি তাঁহার দুর্গোৎসববিবেক, বাসন্তীবিবেক এবং দুর্গোৎসবপ্রয়োগ নামক তিনটি নিবন্ধে জীকন ও বালক নামক তাঁহার পূর্ববর্তী নিবন্ধকার দুইজনের এতৎসম্পর্কিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। জীকন ও বালক বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা না গেলেও, ইহা বলা যায় যে তাঁহারা বাংলার অন্যতম প্রাচীন স্মৃতিনিবন্ধকার ভবদেব ভট্টের পূর্ববর্তী ছিলেন। রাজা হরিবর্মদেবের (খৃষ্টীয় একাদশ শতক) প্রধান মন্ত্রী ভবদেব ভট্ট তাঁহার নিবন্ধাবলীতে জীকন, বালক এবং আর একজন প্রাচীন গ্রন্থকার শ্রীকরের অনেক উক্তির আলোচনা করিয়াছেন। এই সকল তথ্য আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে মৃন্ময়ী প্রতিমায় দেবীর পূজার্চনা বাংলাদেশে ন্যূনাধিক সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রচলিত আছে। তবে দেবীর ও

তাঁহার পরিবারাদির রূপায়ণে যে এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে কোনও পরিবর্তন আনীত হয় নাই ইহা বলা যায় না। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ যেভাবে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত দেবীর পরিবার-দেবতা রূপে প্রদর্শিত হইতেন, এবং এখনও কোনও কোনও প্রাচীনতন্ত্রী প্রতিমাতে প্রদর্শিত হন, উহা যে ঠিক কোন সময়ে প্রথম প্রচলিত হয় সে বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

এখন শারদীয়া দুর্গাপূজার দুইএকটি বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। এই বৈশিষ্ট্য কয়টির প্রতি প্রথমে আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়। নবপত্রিকা পূজা দুর্গাপূজা পদ্ধতির অন্যতম প্রধান ও প্রারম্ভিক অঙ্গ। বাঙ্গালী হিন্দু জানেন যে দুর্গোৎসবে একটি সপত্র কদলীবৃক্ষের চারা অন্য আটটি বৃক্ষের ফল, মূল, বা শাখার (কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম, অশোক, মান এবং ধান্য) সহিত নূতন লালপাড় শাড়ীতে আচ্ছাদিত ও সিন্দূরচর্চিত করিয়া প্রতিমা-পীঠের একপার্শ্বে স্থাপনপূর্বক পূজারম্ভে ইহার অর্চনা করা অন্যতম বিধি (সাধারণ লোকে ইহাকে 'কলাবৌ' আখ্যা দিয়া থাকে)। ইহার নাম নবপত্রিকা প্রবেশ, এবং ইহা দ্বারা যে এক বিচিত্র উপায়ে দেবীকে উদ্ভিজ্জসমূহের অধিষ্ঠাত্রী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ মহাশয় বলিয়াছেন—'An important aspect of Durgā-worship called *navapatrikā* or the worship of the nine plants (lit. 'leaves'), also clearly shows that the goddess was conceived as the personification of the vegetation spirit.' (*The Indo-Aryan Races*, 1916, p. 131)। তিনি পুরশ্চর্যার্ণবের তৃতীয় খণ্ড (পৃঃ ১০৩৪-৩৫) হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে দেবীর বিভিন্ন রূপ যথা ব্রহ্মাণী, কালিকা, দুর্গা, কার্তিকী (কৌমারী), শিবা, রক্তদন্তিকা, শোকরহিতা, চামুণ্ডা এবং

লক্ষ্মী যথাক্রমে কদলী, কচ্বী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক, মান এবং ধান্য বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দেবীমাহাত্ম্যে বর্ণিত দেবীর শাকম্ভরী রূপের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। শারদীয়া পূজায় নবপত্রিকার্চনা আর এক প্রকারে দেবীর অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের কথাই আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে বর্ণিত তাঁহার অন্নপূর্ণা রূপ এবং কুলচূড়ামণি, শাক্তানন্দ-তরঙ্গিনী, তন্ত্রসার প্রভৃতি গ্রন্থে তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনায় যে কুলবৃক্ষ পূজার উল্লেখ আছে, এ সকলও দেবীকে উদ্ভিজ্জ ও অন্নের দেবতা রূপে পরিচিত করে।

দেবীর শবর বর্বরাদি অনার্যজাতির দ্বারা পূজিত রূপের কথা আগে বলা হইয়াছে। শূলপাণি তাঁহার দুর্গোৎসববিবেকে কালিকাপুরাণ হইতে শারদীয় দুর্গোৎসবে অনুষ্ঠিতব্য শাবরোৎসব নামক এক বিধি সম্পর্কিত কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার কথাই বলিয়াছেন। কালিকাপুরাণের একষষ্টিতম অধ্যায়ে এই শ্লোক কয়টি পাওয়া যায়—

বিসর্জয়েদ্দশম্যান্তু শ্রবণে শাবরোৎসবৈঃ ॥১৭॥
... ...
তদা সম্প্রেষণং দেব্যা দশম্যাং কারয়েদ্‌বুধঃ ॥১৮॥
সুবাসিনীভিঃ কুমারীভির্বেশ্যাভির্নর্তকৈ স্তথা।
শঙ্খতূর্যনিনাদৈশ্চ মৃদঙ্গৈঃ পটহৈস্তথা ॥১৯॥
ধ্বজৈর্বস্ত্রৈর্বহুবিধৈর্লাজপুষ্পপ্রকীর্ণকৈঃ।
ধূলিকর্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ ॥২০॥
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গাদিশব্দৈশ্চ ক্রীড়ায়েযুরলং জনাঃ ॥২১॥[১]

---

১ রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় শূলপাণির গ্রন্থ হইতে যে পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন উহার শেষ চরণটি ভিন্নরূপ,—ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ ক্রীড়য়েযুর-লজ্জিতঃ ; *op. cit.*, p. 126।

"দশমীর দিবস শ্রবণা নক্ষত্রে শাবরোৎসবের সহিত দেবীর বিসর্জন করিবে।……সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিতা কুমারী ও বেশ্যা এবং নর্তকগণ সঙ্গে লইয়া শঙ্খ, তূরী, মৃদঙ্গ এবং পটহের শব্দ করিতে করিতে নানাবিধ বস্ত্রের ধ্বজা উড়াইয়া খই এবং ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে ধূলিকর্দম নিক্ষেপ করতঃ নানা ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাচরণপূর্বক ভগলিঙ্গাদি-বাচক গ্রাম্যশব্দ উচ্চারণ ও তাদৃশ শব্দবহুল গান এবং তাদৃশ অশ্লীল বাক্যালাপ করিয়া বিসর্জন সময়ে ক্রীড়া করিবে।" ইহার পরের দুইটি শ্লোকে পুরাণকার বলিয়াছেন যে 'সেই দিবস (অর্থাৎ বিজয়াদশমীর দিন) যদি কোনও মনুষ্য নিজের উপর অপর কর্তৃক অশ্লীল ব্যবহার করা না ভালবাসে এবং অপরের উপর অশ্লীল ব্যবহার করিতে না চাহে তবে ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিয়া গমন করেন'। রঘুনন্দনও বিজয়াদশমীতে প্রতিমা-বিসর্জন সম্পর্কে এই শাবরোৎসবের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'ততো ধূলিকর্দম-বিক্ষেপক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল ভগলিঙ্গাভিধানং ভগলিঙ্গপ্রগীত পরাক্ষিপ্ত পরাক্ষেপকরূপং শাবরোৎসবং কুর্যাৎ'। শারদীয়া দুর্গাপূজায় পুরাকালে অনুষ্ঠিত শাবরোৎসব এখন কোথাও পালিত হয় কিনা জানি না, তবে শাবরমার্গ নামে যে সেকালের তান্ত্রিক শক্তি-উপাসনার এক শাখা ছিল উহা মেরুতন্ত্রের একটি উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি। এই তন্ত্রে বামমার্গের পাঁচটি শাখাকে যথা কৌলিক, বাম, চীনক্রম, সিদ্ধান্তীয় ও শাবর, হাতের পাঁচ অঙ্গুলির সহিত তুলনা করা হইয়াছে; কৌলিক অঙ্গুষ্ঠ, বাম তর্জনী, চীনক্রম মধ্যম, সিদ্ধান্তীয় অনামিকা এবং শাবর কনিষ্ঠাঙ্গুলি। শ্লোকটি এইরূপ—

কৌলিকোঽঙ্গুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাত্তর্জনীসমঃ।
চীনক্রমো মধ্যমঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তীয়োঽবরো ভবেৎ।
কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গঃ ইতি বামস্ত পঞ্চধা॥

অধ্যায়শেষে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা-প্রয়োজন। এই তত্ত্বের আদিমতম সরল রূপ যে আমরা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলস্থ দেবী-সূক্তে পাই উহা পূর্বে বলা হইয়াছে। পৌরাণিক যুগে ইহার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যান আমরা মার্কণ্ডেয় পুরাণস্থ দেবীমাহাত্ম্য (শ্রীশ্রীচণ্ডী বা দুর্গা সপ্তশতী) ও ইহার রহস্যত্রয়, যথা প্রাধানিক রহস্য, বৈকৃতিক রহস্য এবং মূর্তি রহস্যে প্রাপ্ত হই। শ্রীশ্রীচণ্ডীর বিভিন্ন টীকাতে, বিশেষ করিয়া খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে প্রসিদ্ধ তান্ত্রিকাচার্য ভাস্কর রায় মখী কর্তৃক রচিত ইহার গুপ্তবতী নামক সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্ববহুল টীকাতে শাক্ত দর্শনের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা আছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণের পরবর্তী কালের কালিকাপুরাণাদি পুরাণে ও কোনও কোনও তন্ত্রগ্রন্থে এবং সৌন্দর্য-লহরী প্রমুখ শাক্ত গ্রন্থে আমরা শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হই। দেবীমাহাত্ম্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মাস্তুতি, শক্রাদিস্তুতি, বিষ্ণুমায়াস্তুতি এবং নারায়ণীস্তুতির কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই স্তুতিগুলি একটু মনোযোগসহকারে আলোচনা করিলে শক্তিতত্ত্বের কয়েকটি মূলসূত্রের বিষয় আমরা জানিতে পারি। দেবী যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, মাত্রাত্রয় রূপে স্থিত ওঁকার, তিনি সর্বজগতের সৃজন, পালন ও সংহার-কর্ত্রী, ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ ও তম) তারতম্যবিধায়িনী আদি প্রকৃতি, তিনি লক্ষ্মী, হ্রী, ঈশ্বরী ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তিনি বিশ্বরূপিণী—এবং সকল চেতন ও অচেতন বস্তুর অন্তর্নিহিত শক্তি। ব্রহ্মা কর্তৃক দেবীর স্তুতিতে দেবী-চরিত্রের এই এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হইয়াছে। শক্রাদি দেবতাগণের স্তুতিতেও অনুরূপ এবং আরও অনেক বৈচিত্র্যময় দেবী-প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি মুক্তির কারণ পরাবিদ্যা, যোগশাস্ত্রে উক্ত দুরনুষ্ঠেয় যমনিয়মাদি মহাব্রত তাঁহার সাধন; দেবী শব্দস্বরূপা, বেদত্রয়রূপা, বিশ্বপালনার্থ নানাবিধ বৃত্তিস্বরূপা, সমস্ত জগতের দুঃখহারিণী, এবং দুর্বৃত্তগণের দুষ্টপ্রবৃত্তিদমন তাঁহার স্বভাব। বিষ্ণুমায়াস্তুতিতে জগতের আশ্রয়কারিণী দেবী বিষ্ণুমায়া সর্বভূতে

চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি রূপে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি চিৎশক্তি রূপে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন (চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ)। নারায়ণীস্তুতিতে সর্বাত্মিকা ও বিশ্ব-জগতের আধারভূতা দেবী অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তি, বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রাধানিক রহস্যে বর্ণিত আছে যে দেবীর আর এক নাম বা প্রকাশ মহালক্ষ্মী, ইঁহাতে সত্ত্ব রজঃ ও তম গুণত্রয় প্রকটিত। প্রলয়কালে মহালক্ষ্মীর যে তমোগুণান্বিত রূপ প্রকট হয় উহার নাম মহাকালী; দেবীর এই তমোগুণাশ্রিত প্রকাশ মহামায়া, মহামারী, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা বা যোগনিদ্রা, কালরাত্রি প্রভৃতি নামেও পরিচিত। শ্বেতবর্ণা সত্ত্বগুণান্বিতা মহাসরস্বতী মহালক্ষ্মীর আর এক প্রকাশ; মহাসরস্বতীর বিভিন্ন নাম, যথা—মহাবিদ্যা, মহাবাণী, ভারতী, বাক, আর্যা, ব্রাহ্মী, বেদগর্ভা ইত্যাদি। দেবীর এই তিন প্রকাশ হইতে ব্রহ্মা ও শ্রী, রুদ্র ও ত্রয়ী (বেদবিদ্যা) এবং বিষ্ণু ও গৌরী উদ্ভূত হইয়াছিলেন। বৈকৃতিক ও মূর্তি রহস্যেও দেবীর অপরাপর প্রকাশ বর্ণিত আছে, এবং এই সব বিবরণে দেবীতত্ত্বের গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান দেওয়া আছে। বাহুল্যভয়ে উহাদিগের বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হইল না।

শক্তিতত্ত্বে সাংখ্যোক্ত পুরুষ-প্রকৃতিবাদও গৃহীত এবং ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ইহাতে শিবই সাংখ্যের নিষ্ক্রিয় পুরুষ, এবং অশেষ ও অদ্ভুত ক্রিয়াত্মিকা দেবীই প্রকৃতি। তিনি অণুতে ও মহতে যুগপৎ বিরাজমানা, এবং মানবদেহে কুণ্ডলিনী শক্তি রূপে মূলাধার চক্রে সুপ্ত থাকেন। এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে যোগাদি ও যমনিয়মাদি অভ্যাসের দ্বারা জাগরিত করিয়া মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠানে, পরে পর্যায়ক্রমে মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধি ও আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রারে উন্নীত করাই তান্ত্রিক সাধকের প্রধান সাধনা। উপরোক্ত ছয়টি চক্র তাঁহার শরীরের বিভিন্ন অবয়বে

যথাক্রমে গুহ্যে, লিঙ্গমূলে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও মস্তিষ্কে বা ললাটে অবস্থিত। কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ এবং নিম্নস্থ চক্র হইতে উর্ধ্বস্থ চক্রে উন্নয়ন শাক্ত সাধকের প্রারম্ভিক প্রচেষ্টায় স্থায়ী হয় না; প্রথম প্রথম এই শক্তি জাগরিত ও উর্ধ্বস্থ হইলেও পুনরায় নিম্নগামী হইয়া মূলাধারে আসিয়া সুপ্ত হন। বারংবার তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত যোগাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যখন সাধক কুণ্ডলিনী শক্তিকে সম্যক্ জাগরিত করিয়া নিম্নতর চক্রগুলির মধ্য দিয়া উন্নীত করিয়া স্থায়ীভাবে তাঁহাকে সহস্রারে স্থাপনা করিতে পারেন, তখনই তাঁহার ষট্‌চক্রভেদ হয়, এবং তিনি সাক্ষাৎ আনন্দময়ী দেবীর দর্শন লাভ করেন। ইহাই তাঁহার সিদ্ধি, দিব্যজ্ঞান ও মোক্ষলাভ। জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অভেদজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান, এবং সেদিক দিয়া তান্ত্রিক সিদ্ধি অদ্বৈতবাদের সমর্থক। যোগের আটটি অঙ্গ, যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। যম দশ প্রকার, যথা—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, দয়া, ঋজুতা, ক্ষমা, ধৃতি, মিতাহার ও শৌচ। নিয়মও দশবিধ, যথা—তপ, সন্তোষ, আস্তিক্য-বুদ্ধি, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তবাক্য-শ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও হোম। কামক্রোধাদি ষড়রিপু যোগবিঘ্নকর, অতএব ইহাদিগকে দমন করা সাধকের প্রথম কর্তব্য। হোমবিধির অন্যতম প্রধান অঙ্গ অন্তর্যজন। যথাবিধি অন্তর্যজননিরত থাকিলে সাধক ব্রহ্মময়, পাপপুণ্যহীন ও জীবন্মুক্ত হন। অন্তর্যজনে কৃতকার্য হইলে তিনি লিঙ্গত্রয় (স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ, বাণলিঙ্গ, ইতরলিঙ্গ) সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন ও তাঁহার ষট্‌চক্রভেদ হয়। তিনি চিন্ময় পরশিবসহ কুণ্ডলিনী শক্তির সামরস্য সম্পাদন করিয়া সহস্রদলকমলের মধ্যস্থিত চন্দ্রমণ্ডল হইতে অমিয়-ধারা পান করেন। ইহাই তাঁহার মধুপান (মধুপানমিদং দেবি চেতরং মদ্যপানকম্); ইহার বিষয় পূর্বে একবার বলিয়াছি। যোগবিৎ সাধক জ্ঞান-খড়্গের দ্বারা পাপপুণ্য বোধরূপ পশুকে হত্যা করিয়া, এবং

মানসাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া আত্মযুক্ত করিলে ইহাই তাঁহার মাংসভক্ষণ হয়। যাঁহারা পরাশক্তির সহিত পরশিবের সংযোগ করিয়া আনন্দপূর্ণ হন তাঁহারা মুক্ত—ইহাই তাঁহাদের মৈথুন (পরশক্ত্যাত্মমিথুন সংযোগানন্দনির্ভরাঃ। মুক্তাস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ)। এই শিব-শক্তি সমন্বয় নিজদেহে ষট্‌চক্রভেদের দ্বারা কিভাবে সংঘটিত হয় উহার বিষয় সৌন্দর্যলহরীর নবম শ্লোকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে—

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে॥

সাধক কবি কুণ্ডলিনী শক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে ভগবতি! সমস্ত কুলপথ (তত্ত্বকেন্দ্র), যথা ভূতত্ত্ব মূলাধারে, অপ্‌তত্ত্ব মণিপুরে, তেজোতত্ত্ব স্বাধিষ্ঠানে, বায়ুতত্ত্ব অনাহতে, আকাশতত্ত্ব বিশুদ্ধি-চক্রে এবং মনস্তত্ত্ব ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে (আজ্ঞাচক্র), ভেদ করিয়া আপনি সহস্রার পদ্মে নিজ পতিসহ একান্তে বিহার করিতেছেন।" এই শ্লোকে পঞ্চ মহাভূত ও মন এই ষড়তত্ত্ব দেহস্থ ষট্‌চক্রের সহিত একাত্মীভূত করা হইয়াছে, এবং সম্যক্ সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী শক্তির উদ্বোধন করিয়া সাধক যখন তাঁহাকে সহস্রারপদ্মে স্থায়ী করেন তখনই দেবীর পরশিবের সহিত চিরমিলন হয়।

তন্ত্রসার, সৌন্দর্যলহরী প্রভৃতি হইতে উদ্ধৃত তান্ত্রিক সাধনের যে অন্যতম রূপ প্রদত্ত হইল, উহা পাঠে স্বতঃই মনে হয় যে ইহার মধ্যে নিন্দনীয় কিছুই নাই। সাধনতত্ত্ব অপরের এবং অনধিকারীর পক্ষে দুরূহ ও দুর্বোধ্য ইহা সত্য, কিন্তু সেজন্যই ইহা দূষ্য নহে। বীরাচারী বা বামাচারী সাধকের ভৈরবীচক্র ইত্যাদি মণ্ডলগত সাধনার কথা

যাহা কুলার্ণবাদি তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে উহা যে সমর্থনযোগ্য এবং নির্দোষ ইহা স্বীকার করা যায় না, কিন্তু সময়াচারী বলিয়া বর্ণিত তান্ত্রিকগণের সাধনা, যাহার কথা এইমাত্র বর্ণিত হইল, সমর্থন লাভ করিবার যোগ্য। শক্তিতত্ত্বের আর এক ভেদ শাম্ভবদর্শন নামক শাক্ত-দর্শন সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে। খুব সংক্ষেপে এই তত্ত্বের নিম্নলিখিত পরিচয় দেওয়া হইল। শিব জ্যোতি বা প্রকাশ রূপে বিমর্শ বা স্ফূর্তি রূপা শক্তির মধ্যে অনুপ্রবেশকালে বিন্দুরূপ ধারণ করেন। শিব শক্তির সম্মেলনে নাদ বা শব্দের উৎপত্তি হয়; ইহা স্ত্রীলিঙ্গাত্মক। পুনরায় পুংবীজ শুক্ররূপী বিন্দু ও স্ত্রীবীজ রজরূপ নাদের পরস্পর মিলন হেতু প্রথমে কাম ও পরে কলার উদ্ভব হয়; ইহাদের পারস্পরিক মিলন ফলের নাম কামকলা। বিন্দুই জগৎপপঞ্চের উপাদানীভূত কারণ; নাদ বা শব্দ হইতে পদার্থাদির নামকরণ হয়। পরে কামকলা হইতে সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ, বাক্য ও অর্থাদির বিকাশ হয়। এই কামকলা প্রধানা শক্তি; সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি ও হার্ধকলা (ইহা নাদের উৎপত্তির সমকালে নাদবিন্দুর মিলনের ফলে সঞ্জাত আর এক পদার্থ) ইহার শরীরের বিভিন্ন অবয়ব স্বরূপ। ইনিই সৃজনকর্ত্রী এবং পরা, ললিতা, ভট্টারিকা ও ত্রিপুরসুন্দরী নামে আখ্যাত। শিব বর্ণমালার আদি বর্ণ 'অ', এবং শক্তি ইহার শেষ বর্ণ 'হ'; এই দুইবর্ণের বা শিব-শক্তির সম্মিলিত রূপ 'অহম্' অর্থাৎ অহংজ্ঞান বা ব্যক্তিত্ববোধ কামকলা বা ত্রিপুরসুন্দরীর আর এক রূপ। বর্ণমালার আদি ও অন্ত্যবর্ণ যেমন অন্যান্য বর্ণ এবং সমগ্র বাক্যের ধারক, সেরূপ ইহাদের যুক্তরূপ ত্রিপুরসুন্দরী সমগ্র সৃষ্ট পদার্থের এবং বাক্য ও অর্থের ধারিকা ও বাচিকা। এই হেতু তাঁহার নাম পরা এবং তৎসঞ্জাত সৃষ্টি পরিণাম; ইহাই পরিণামবাদ, বেদান্তে কথিত বিবর্তবাদ হইতে ইহা পৃথক্। বিবর্তবাদের মূলে শঙ্কর-সমর্থিত মায়াবাদ বর্তমান। শক্তিতত্ত্বের শাম্ভবদর্শনোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে ইহার দুরূহত্ব প্রতীয়মান হয়। ইহার আধ্যাত্মিকতা ও প্রকৃত

অর্থ সদ্‌গুরুর উপদেশ ও সাহায্য ব্যতিরেকে বোধগম্য হওয়া সম্ভব নহে। আমি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানীর দিক হইতে ইহার বাহ্যরূপের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে প্রয়াসী হইলাম। শক্তিপূজা, শাক্ত আচার ও শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুশীলনকালে আমার পুনঃপুনঃ ইহাই মনে হইয়াছে যে এই সকল কত বৈচিত্র্যময় ও আপাতবিরোধী তত্ত্বের সংমিশ্রণে বিকশিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনেক ক্ষেত্রে তত্ত্ব দুরূহ, এবং দর্শন গভীর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সূর্য—সৌর

আদিত্য-সূর্য ও গ্রহপূজা, সৌরসম্প্রদায়, সূর্যমূর্তি

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির ধর্মচর্যায় প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যের উপাসনা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। বিশ্ব প্রকৃতির প্রধানতম বিস্ময় সৌরজগতের মধ্যমণি দ্যুতিমান ময়ূখমালী সূর্যকে দেবতারূপে কল্পনা করা ভাবপ্রবণ মানবমনের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। প্রাচীন ভারত-বাসিগণও যে আদিম কাল হইতে তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে হৃদয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিতেছিলেন ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে। সিন্ধুনদ ও তাহার কয়েকটি অববাহিকা আশ্রয় করিয়া সুপ্রাচীন কালে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহা উত্তর ও মধ্যভারতের বিভিন্ন অংশে কালক্রমে বিস্তৃত হইয়াছিল, উহার মধ্যেও মনে হয় এই ধর্মাচরণ প্রথা বর্তমান ছিল। উক্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট যে সকল নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের ব্যাপকতর অনুশীলনের ফলে আমরা হয়ত এবিষয়ে অধিকতর তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে কৃতকার্য হইব। ভারতীয় আর্যগণের প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদ আমাদিগকে সুস্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দেয় যে তৎকালীন আর্য ঋষিগণ প্রত্যক্ষ দেবতা সূর্যের নানাবিধ প্রকাশের কথা কল্পনা করিয়া ইঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞক্রিয়াদি সম্পাদন করিয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেন। যজ্ঞসম্পাদনকালে তাঁহারা যে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, এবং যাহা সূক্তাকারে ঋগ্বেদমধ্যে সন্নিবদ্ধ আছে, ঐগুলি হইতে আমরা দেবতার বিভিন্ন প্রকাশ ও তাঁহাদিগের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কথা জানিতে পারি।

যে সকল বৈদিক দেবতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যহেতু সূর্যের সমগোত্রীয়, উহাদিগের মধ্যে সবিতা, পূষণ, বিবস্বৎ, ভগ, মিত্র, বিষ্ণু

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের সহিত আরও কয়েকটি দেবতার (অর্যমন্, ত্বষ্টা, অংশ, দক্ষ, মার্তাণ্ড বা মার্তণ্ড, ধাতা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতির) নাম বিভিন্ন সময়ে কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন তালিকায় সংযুক্ত হইয়া প্রথমে সপ্ত, অষ্ট বা অনির্দিষ্ট সংখ্যক এবং পরে দ্বাদশ সংখ্যক আদিত্য গোষ্ঠীতে পরিণত হয়; ইহার বিষয় গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (পৃঃ ৩৩-৪)। এই দেবতাগোষ্ঠীর মধ্যে সূর্য ও সবিতাই প্রধান। ঋগ্বেদে সূর্যের ও সবিতার নামে যথাক্রমে পুরাপুরি দশটি ও একাদশটি সূক্ত আছে। ইহা ছাড়া তাঁহাদের নাম অন্যান্য বৈদিক দেবতাদিগের নামের সহিত অপর অনেক সূক্তের বিভিন্ন অনুবাক বা ঋকেও পাওয়া যায়। নভোমণ্ডলগত প্রচণ্ড করোজ্জ্বল সূর্যকে বৈদিক ঋষিরা, কখনও অগ্নির মুখ, আবার কখনও কখনও বিরাট্ বিশ্বের সর্বত্র দৃষ্টিপাতকারী চক্ষুরূপে কল্পনা করিয়াছেন। কোনও বর্ণনায় আকাশ তাঁহার পিতা, আবার বিভিন্ন স্থলে ইন্দ্র, বরুণ, সোম, ধাতা প্রভৃতি বিভিন্ন বৈদিক দেবতা তাঁহার জনয়িতা রূপে উপস্থাপিত হইয়াছেন। কোথাও তিনি আকাশে উড্ডীয়মান সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্ পক্ষী (সুপর্ণ গরুত্মান্) আবার কোথাও আকাশ মধ্যস্থ পথসমূহে বেগে ধাবমান অশ্ব (তার্ক্ষ্য)। তাঁহার আর এক বৈদিক কল্পনা পরবর্তী কালে স্থায়ী রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ঋগ্বেদে তাঁহার এক বা ততোধিক (সাতের বেশী নহে) অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া আকাশপথে ভ্রমণকালে অন্ধকার নাশ করার কথা বলা হইয়াছে; সাতটি অশ্ব তাঁহার সপ্তরশ্মি, আবার ইহাদিগকে সাতটি বৈদিক ছন্দের সহিতও তুলনা করা হইয়াছে। কোথাও বা দেবতা নিজেই রথচক্র রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে সপ্তাশ্ববাহিত একচক্র রথে দেবতার নভোমণ্ডল পরিভ্রমণ এক বিশেষ রূপ ধারণ করিয়াছে। সূর্যের প্রখর রশ্মিজাল রোগবীজাণু ধ্বংসকারী, এজন্য তিনি ব্যাধিমোচনকারী দেবতা। তিনি বিশ্বকর্মা, বিশ্বস্রষ্টা,

দেবতাদিগের পুরোহিত, মনুষ্যের পাপবিমোচনকারী। সবিতা তাঁহার অন্যতম প্রকাশ। ইহাতে তিনি সমগ্র বিশ্বের জীবনধারা ও গতির উন্মেষকারী। যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে তাঁহাকে 'সর্বস্য প্রসবিতা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সবিতার আরও যে সব বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁহার নামসম্বলিত সূক্তগুলিতে পাওয়া যায় উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে সূর্যের দৈবী শক্তিসমূহই যেন তাঁহার সবিতা রূপ প্রকাশে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঋগ্বেদে সূর্যের সহিত আদিত্য গোষ্ঠীর অন্যান্য দেবতাগুলির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কোথাও স্পষ্ট আবার অন্যত্র অস্পষ্ট। পূষণ ইহার আটটি সূক্তে স্তুত হইয়াছেন, এবং এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি ঋগ্বেদে আদিত্য বিষ্ণু অপেক্ষা উচ্চ পর্যায়ের। কিন্তু উত্তর বৈদিক ও বেদ পরবর্তী সাহিত্যে তাঁহার মর্যাদা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। অথচ দ্বাদশ আদিত্যের তালিকার সর্বশেষ আদিত্য বিষ্ণুর গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কি কারণে ইহা সম্ভব হইয়াছিল, উহা গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। পূষণের ব্যক্তিত্ব কিঞ্চিৎ অস্পষ্ট, এবং ঋগ্বেদে তাঁহার সম্বন্ধে যে সব উক্তি আছে. উহা হইতে মনে হয় যে তিনি সূর্যের কল্যাণকর রূপের এক বিশেষ প্রকাশ হিসাবে কল্পিত হইয়াছিলেন। তিনি পুষ্টি আনয়ন করেন সেজন্য তাঁহার আর এক নাম পুষ্টিম্ভর। ভগ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভুক্ত দেবতা অর্থে ব্যবহৃত *bogu* (বোগু) কথাটির ভারতীয় রূপ ; ইহার ইরাণীয় প্রতিরূপ বঘ (*bagha*) শব্দটি দেবতাবাচক ; এই অর্থে ইহা আবেস্তায় অহুর মজদার বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যাস্কের মতে ভগ পূর্বাহ্নের অধিষ্ঠান দেবতা। সূর্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সেরূপ স্পষ্ট নহে, এবং তাঁহার উদ্দেশে রচিত বৈদিক সূক্তসমূহে তিনি ইন্দ্র ও অগ্নি প্রদত্ত ধনৈশ্বর্যের পরিবেশকরূপে প্রায়ই বর্ণিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ৪৬ সংখ্যক সূক্তের ষষ্ঠ অনুবাকের তৃতীয়

চরণে তিনি ধনৈশ্বর্যের বিভক্তা এবং অন্ন ও রক্ষা আনয়নকারী রূপে ঋষি কর্তৃক আহুত হইয়াছেন (ভগো বিভক্তা শবসাবসাগমৎ)। ভগের নাম হইতেই পরবর্তীকালে ভগবৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। বিবস্বৎ মনে হয় আগে উদীয়মান সূর্যের অন্য এক নাম ছিল ; কিন্তু কালক্রমে ইঁহার আবেস্তীয় প্রতিরূপ বিবন্‌হ্বন্তের (Vivanhvant) ন্যায় তিনি প্রথম সোম প্রস্তুতকারক ও মানব জাতির আদি পুরুষ-রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। ঋগ্বেদে সূর্যের সহিত ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা মিত্রের সম্বন্ধও তত স্পষ্ট নহে ; তৎসম্বন্ধীয় অনেক সূক্তে তিনি বরুণের সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। এই মিত্রের ইরাণীয় প্রতিরূপ পরে ভারতের, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতের, সূর্যপূজাকে কি ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছিল সে বিষয় একটু পরে আলোচিত হইবে। অপর ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা অর্যমনেরও সূর্যের সহিত সম্বন্ধ খুব অস্পষ্ট : তবে এমনিতেই এই দেবতা এরূপ বৈশিষ্ট্যহীন যে নিঘণ্টুকার ইঁহাকে বৈদিক দেবতাগণের তালিকাভুক্ত করা আবশ্যক মনে করেন নাই। অপর দুইটি আদিত্য, ধাতা ও রুদ্র, পৌরাণিক ব্রহ্মা ও শিবের আদি বৈদিক রূপ ; আদিত্য বিষ্ণুর রূপান্তরিত দেব সত্তার সহিত একত্রীভূত হইয়া তাঁহারা সৃষ্টি-স্থিতি সংহার কর্তা ব্রাহ্মণ্য দেবতাত্রয় (Brahmanical Triad—Brahmā-Vishṇu-Śiva) রূপে কল্পিত হইয়াছিলেন। ত্বষ্টা, অংশ, দক্ষ ও মার্তাণ্ড বা মার্তণ্ডের নাম ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তে আদিত্য তালিকার মধ্যে পাওয়া যায় ; ইঁহাদের কেহ কেহ পরবর্তী সাহিত্যে স্পষ্টতঃ আদিত্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন কিংবদন্তী সকল প্রচলিত হইয়াছিল। ত্বষ্টা কারুশিল্পী ও রূপকর্তা, ও পরবর্তী কালের বিশ্বকর্মারূপ দেবতা কল্পনার বৈদিক উৎস। বিবস্বৎ-পত্নী সরণ্যু তাঁহার কন্যা, এবং এই দেবদম্পতীর যমজ পুত্রকন্যা যম ও যমী। বিশ্বকর্মা-ত্বষ্টা ও তাঁহার কন্যা জামাতা বিবস্বৎ-সরণ্যুকে অবলম্বন

করিয়া পৌরাণিক যুগে যে কিংবদন্তী রচিত হইয়াছিল উহার গুরুত্ব পরে আলোচনা করা হইবে। অংশ দেবতা হিসাবে ঋগ্বেদে এবং পরেও অতি অস্পষ্ট ও নগণ্য, এবং তিনি ভগদেবতারই আর এক বৈশিষ্ট্যহীন রূপ। দক্ষের কল্পনাও ঋগ্বেদে অনেকটা অনির্দিষ্ট; পরবর্তী ব্রাহ্মণ সাহিত্যে তিনি স্রষ্টা প্রজাপতির সহিত একাত্মীভূত হইয়াছেন। মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া যে কিংবদন্তীসমূহ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা এই গ্রন্থে পূর্বে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৩৩-৩৪)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে মার্তাণ্ড অদিতির অষ্টম পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার মাতা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সাতটি পুত্রকে লইয়া দেবলোকে চলিয়া গিয়াছিলেন (৭২, ৮; অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্যে জাতাস্তন্ব স্পরি। দেবাঁ উপ প্রৈৎসপ্তভিঃ পরা মার্তাণ্ডমাস্যৎ)। মার্তাণ্ডের পরিবর্তিত রূপ মার্তণ্ড মহাকাব্য ও পুরাণের যুগে সূর্যের অন্যতম প্রতিশব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু তৎকালে প্রচলিত দ্বাদশাদিত্যের নামের মধ্যে অধিকাংশ তালিকায় ইঁহার স্থান নাই। ঋগ্বেদেও তাঁহার রূপ খুবই অস্পষ্ট, এবং তাঁহার নাম দু এক বারের বেশী পাওয়া যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে এই নাম অস্তগমনশীল সূর্যকেই বুঝায়।

ঋগ্বেদ-পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সূর্য ও আদিত্যাদি দেবতার উপাসনার ক্রমবর্ধমান রূপ আলোচনা করার পূর্বে গ্রহপূজার বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক। উত্তর বৈদিক ও বেদ পরবর্তী সাহিত্যে যেরূপ দ্বাদশাদিত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, সেরূপ গ্রহদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। ঋগ্বেদে গ্রহদিগের কোনও কথা নাই। সূর্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র ইত্যাদির নাম সেখানে আছে, কিন্তু গ্রহরূপে নয়। শতপথ ব্রাহ্মণে গ্রহ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহার অর্থ সেখানে অন্যরূপ। উহাতে বাক্, নাম, অন্ন ও সোমকে চারিটি গ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সূর্যও গ্রহ বলিয়া বর্ণিত

হইয়াছেন (৪. ৬. ৫, ১ ও ৫) ; কিন্তু এখানে গ্রহের অর্থ ঐন্দ্রজালিক প্রভাববিস্তারকারী শক্তিবিশেষ। মৈত্রায়ণীয় উপনিষদেই বোধ হয় মহাকাব্য, পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থে ধৃত গ্রহার্থবাচক শব্দ প্রথম পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে আদিত্য-সূর্যের বিশেষ বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে উপনিষদকার চন্দ্র, ঋক্ষ, গ্রহ সংবৎসরাদির কথা বলিয়াছেন ; গ্রহের নামাদি ও সংখ্যা এসব কিছুই বলেন নাই (চন্দ্র ঋক্ষ-গ্রহ সংবৎসরাদয়ঃ সূয়ন্তে ; ষষ্ঠ প্রপাঠক, ১৬ অনুবাক)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের সপ্তম অনুবাকে কয়েকবার সপ্তসূর্যের কথা বলা আছে ; এই সপ্তসূর্য কাহারও কাহারও মতে সপ্ত গ্রহকে বুঝায়। মহাভারতে ভীষ্মপর্বে (১০০, ৩৭-৮) ও বামায়ণেব আদিকাণ্ডে (১৯, ২) পাঁচটি গ্রহের কথা আছে ; রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে (১৩) পাঁচ গ্রহের উল্লেখ আছে। কিন্তু এ সব স্থলে উহাদের নাম দেওয়া নাই। স্মৃতি পুবাণাদি গ্রন্থে নবগ্রহ পূজা ও গ্রহযজ্ঞ সম্পাদনের ব্যবস্থা দেওয়া আছে। মৎস্য পুরাণের ২৩৯ অধ্যায়ে রাজগণ কর্তৃক আচবিতব্য গ্রহযজ্ঞ, লক্ষহোম ও সর্বপাপবিনাশক কোটিহোমের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সকল ক্রিয়াকালে যজ্ঞ ও হোমকারী কর্তৃক গায়ত্রী মন্ত্র, 'মানস্তোক' মন্ত্র, গ্রহমন্ত্র, বিষ্ণুদৈবত মন্ত্র, লক্ষ্মীমন্ত্র ও সর্বশেষে ইন্দ্রদৈবত মন্ত্র পাঠ কবিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবার বিধান পুবাণে দেওয়া আছে। একত্রে নয়টি গ্রহের নাম ও তাঁহাদের পূজার কথা আমরা যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, অগ্নি পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে পাই। রঘুনন্দন তাঁহার সংস্কার তত্ত্বের শেষে গ্রহযজ্ঞেব বিষয় বিশদভাবে বণনাকালে যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির গ্রহশান্তি প্রকরণ অধ্যায়ের সমস্ত অংশই উদ্ধৃত করিয়াছেন। চতুর্দশ শ্লোক সম্বলিত এই অধ্যায় আবার অল্প কিছু পরিবর্তিত আকাবে অগ্নি পুরাণের নবগ্রহহোম নামক ১৬৪ অধ্যায়ের এবং গরুড় পুরাণের আচার কাণ্ডে ১০১ অধ্যায়ের (গ্রহশান্তি নিরূপণ নামে) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আমি যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি হইতে প্রথম দুইটি শ্লোক তুলিয়া দিতেছি :—

শ্রীকামঃ শান্তিকামো বা গ্রহযজ্ঞং সমাচরেৎ।
বৃষ্ট্যায়ুঃ পুষ্টিকামো বা তথৈবাভিচরন্নরীন্॥
সূর্যঃ সোমো মহীপুত্রঃ সোমপুত্রো বৃহস্পতিঃ।
শুক্রঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতুশ্চেতি গ্রহাঃ স্মৃতাঃ॥

এখানে নয়টি গ্রহের নাম দেওয়া আছে, এবং বলা হইয়াছে যে শ্রী, শান্তি, বৃষ্টি, আয়ু ও পুষ্টিকামী ব্যক্তি গ্রহযজ্ঞ করিবেন, এবং শত্রুর অনিষ্ট সাধনের জন্যও তিনি গ্রহ পূজার দ্বারা অভিচার ক্রিয়া করিবেন। পরবর্তী শ্লোকগুলিতে গ্রহযজ্ঞের বিধিনির্দেশ বর্ণিত হইয়াছে। শান্তি স্বস্ত্যয়নের জন্য গ্রহপূজা মধ্যযুগের পূর্ব হইতে এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। গ্রহদিগের মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজাকালে অর্চনার বিষয় অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তি হইতে জানা যায়। আমি *Development of Hindu Iconography* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে এইরূপ কয়টি মূর্তির বিবরণ দিয়াছি (পৃঃ ৪৪৪-৪৫)। মধ্যযুগীয় মন্দিরাবলীতে, বিশেষ করিয়া উড়িষ্যা প্রদেশে, গর্ভগৃহে প্রবেশ করিবার দ্বারের শীর্ষে গ্রহের মূর্তিগুলি খোদিত হইত। মনে হয় মন্দিরগুলিকে আকস্মিক বিপদপাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হইত। এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক। উড়িষ্যার ভৌমকর বংশীয় রাজগণের সময়ে যে সকল মন্দির ভুবনেশ্বরাদি স্থানে নির্মিত হইয়াছিল, সেগুলিতে খোদিত গ্রহমূর্তির সংখ্যা কেতুকে বাদ দিয়া আট ছিল। কিন্তু গঙ্গরাজদিগের সময়ে ও তৎপরবর্তী কালে নির্মিত মন্দিরগুলিতে কেতু সমেত নবগ্রহের মূর্তি খোদিত হইত। ইহার তাৎপর্য কি ছিল বলা যায় না।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রাদি উত্তর বৈদিক সাহিত্যের যুগেও সূর্য ও তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশ ভারতীয়গণের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মানিত হইতে থাকেন। কৌষীতকী ঋষি পাপমোচনের জন্য প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যথাবিহিত সূর্যোপাসনার বিধান দিয়াছেন।

উদীয়মান, গগনমধ্যস্থ ও অস্তগমনশীল সূর্যের উপাসনার মন্ত্রও তিনি বলিয়া গিয়াছেন ; এগুলি যথাক্রমে 'বর্গোঽসি পাপ্মানং মে বৃঙ্‌ধি' (আপনি পাপবিনাশক, আমার পাপ নাশ করুন), 'উদ্বর্গোঽসি পাপ্মানং মে উদ্‌বৃঙ্‌ধি' (আপনি পাপের উৎকৃষ্ট বিনাশকর্তা, আমার পাপ উৎকৃষ্টরূপে বিনাশ করুন), 'সংবর্গোঽসি পাপ্মানং মে সংবৃঙ্‌ধি' (আপনি সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশকারী, আমার পাপ সম্যক্‌রূপে বিনাশ করুন ; কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদ, ২, ৫)। উল্লিখিত সূর্যোপাসনা ও সূর্যমন্ত্র আমাদিগকে ব্রাহ্মণদিগের আহ্নিককৃত্য ত্রিসন্ধ্যা ও গায়ত্রীমন্ত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গায়ত্রীছন্দে রচিত এই মন্ত্রের আর এক নাম সাবিত্রী, যেহেতু ইহাতে সূর্যের বিশিষ্টতম প্রকাশ সবিতা দেবতার বরণীয় তেজের কথা বলা আছে। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলস্থ ৬২তম সূক্তের ১০ম সংখ্যক ঋক্ মন্ত্র এইরূপ : 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ'। ইহার নানারূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; আমি ইহার সত্যব্রত সামশ্রমীকৃত অনুবাদটিই এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—'আমরা সবিতৃদেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় কর্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই'। এই ঋক্‌টির পূর্বে প্রণব (ওঁকার) এবং তিনটি ব্যাহৃতি (ভূর্ভুবঃ স্বঃ) যুক্ত হইয়া ইহা উপনয়নসংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যাকালে অবশ্য পঠিতব্য গায়ত্রীমন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকের অন্তর্গত ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অনুবাকত্রয়ে আদিত্য বিষয়ক কয়েকটি মন্ত্র লিখিত আছে। উহাতে আদিত্যমণ্ডল, তন্মধ্যস্থ সর্বাত্মক সর্বভূতের অধিপতি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মস্বরূপ আদিত্যপুরুষ বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহাকে উপাসনা করিলে ব্রহ্মের সাযুজ্য, সালোক্য ও সার্ষ্টি লাভ হয়। তিনি দীপ্তিমান সূর্য আদিত্য (ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ), তাঁহার রস মধু বর্ষণ করে, সত্য তাঁহার রস, জল তাঁহার জ্যোতি, এবং তাঁহার রস অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ (মধুক্ষরন্তি তদ্রসং। সত্যং বৈতদ্রসমাপো জ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্ম)।

ঐ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে আদিত্য গায়ত্রী এইপ্রকার,—ভাস্করায় বিদ্মহে মহাদ্যুতিকরায় ধীমহি তন্নো আদিত্যঃ প্রচোদয়াৎ। সূর্যের আর এক নাম ভাস্কর এই গায়ত্রীতে পাওয়া যায়, এবং এখানে গায়ত্রী মন্ত্রটি ব্রাহ্মণ্য গায়ত্রীর সমপর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদ শাখাভুক্ত মৈত্রায়নীয়সংহিতার অর্বাচীন অংশে শতরুদ্রীয়ের উপক্রমণিকা হিসাবে গিরিসুতা গৌরী, কুমার কার্তিকেয়, হস্তিমুখ গণেশ, চতুর্মুখ ব্রহ্মা প্রভৃতি নানাবিধ পৌরাণিক দেবতার গায়ত্রী মন্ত্রের মধ্যে সূর্যের গায়ত্রীও সন্নিবিষ্ট আছে। ইহা এইরূপ, —ভাস্করায় বিদ্মহে প্রভাকরায় ধীমহি তন্নো ভানু প্রচোদয়াৎ; এখানে ভাস্কর ব্যতীত সূর্যের অপর দুইটি নূতন নাম প্রভাকর ও ভানু ব্যবহৃত হইয়াছে। বহু পরবর্তী কালে রচিত তন্ত্রসারে উদ্ধৃত সূর্যগায়ত্রীটির এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইহার গঠন পূর্বোক্ত সূর্যগায়ত্রী দুইটির গঠনশৈলী অনুকরণ করে; ওঁ আদিত্যায় বিদ্মহে মার্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্যঃ প্রচোদয়াৎ। তন্ত্রোক্ত সূর্যের বীজ হং সঃ; তন্ত্রসার ধৃত কয়েকটি সূর্যমন্ত্র হইতে আমি মাত্র অষ্টাক্ষর সূর্য মন্ত্রটি তুলিয়া দিলাম। উহা এই,—ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে উপরে উদ্ধৃত একটি সূর্যমন্ত্রের প্রথমাংশের সহিত প্রণবযুক্ত হইয়া তান্ত্রিক সূর্যমন্ত্র গঠিত হইয়াছে। সর্বশেষ পর্যায়ের বৈদিক সাহিত্য গৃহ্যসূত্রে সূর্যপূজা পরিস্ফুট রহিয়াছে। গৃহ্য-সূত্রকার নির্দেশ দিতেছেন যে প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা বন্দনার সময় স্নাতক পূর্বাস্য হইয়া ততক্ষণ পর্যন্ত গায়ত্রীমন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবেন যতক্ষণ না সূর্য দিক্‌চক্রবাল হইতে আকাশে সম্পূর্ণরূপে উদিত হন; আবার সায়ং সন্ধ্যাকালে স্নাতকের পশ্চিমাস্য হইয়া ভাবং অনুরূপ মন্ত্রপাঠ কর্তব্য যাবৎ অস্তগমনশীল সূর্য দিক্ চক্রবালে অদৃশ্য না হন। ত্রিসন্ধ্যা-রূপ আহ্নিকক্রিয়াকালেও স্নাতক আর এক সূর্যমন্ত্র পাঠ পূর্বক তাঁহার মস্তকের চারিধারে জল ছিটাইয়া দিবেন। মন্ত্রটি এই,—অসাবাদিত্যো

ব্রহ্ম—ঐ সূর্য ব্রহ্মস্বরূপ (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ৩. ৭, ৪-৬)। ব্রাহ্মণবটুর উপনয়ন সংস্কারকালে আচার্য বালককে সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে বলিয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন, হে সবিতৃদেব! এটি আপনার ব্রহ্মচারী ; আপনি ইহাকে রক্ষা করুন, সে যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হয় (আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র, ১. ২০, ৭)। খাদির গৃহ্যসূত্রে ঐশ্বর্য ও যশ প্রাপ্তির জন্য সূর্যপূজার নির্দেশ দেওয়া আছে (৪.১, ১৪ ও ২৩)।

বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর হইতে সূর্যোপাসনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এইমাত্র সংক্ষেপে আলোচিত হইল। মহাকাব্যদ্বয়েও আমরা দেবতার পূজার সম্যক্ প্রচলন বিষয়ক ইঙ্গিত পাই। এই গ্রন্থে ইহার পূর্ববর্তী দুই অধ্যায়ে রাবণবধের নিমিত্ত শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক আদিত্যহৃদয় স্তবপাঠ ও সূর্যপূজা করার কথা বলা হইয়াছে। মূল রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ষড়ুত্তর শততম সর্গে এই স্তবটি উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং কবি বলিয়াছেন যে রাম ঋষি অগস্ত্য কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনবার আচমন পূর্বক শুচি হইয়া একাগ্রচিত্তে ইহা পাঠ ও সূর্যের আরাধনা করিয়া শত্রুনাশে সমর্থ হন। নাতিদীর্ঘ আদিত্যহৃদয় স্তবটি পাঠ করিলে দেবতার বিশ্বাত্মিকা প্রকৃতি ও নানাবিধ রূপবৈশিষ্ট্যের বিষয়ে সম্যক্‌রূপে জ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি সর্ব দেবাত্মক (একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, ইন্দ্র, কুবের, অশ্বিনীকুমার, যম প্রভৃতি বৈদিক ও পৌরাণিক দেবতার সমন্বয়), ভুবনেশ্বর, নক্ষত্রগ্রহাদির অধিপতি, তমোভেদী ব্যোমনাথ, অগ্নিগর্ভ, দিনাধিপতি, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি নানাবিধ বিশেষণে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে দেবতার সর্বব্যাপক বিরাট্ রূপের যে চিত্র অঙ্কিত করা হইয়াছে, উহা হইতে তিনি জনগণের যে কিরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র ছিলেন উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। মহাভারতে বনপর্বের অন্তর্গত যুধিষ্ঠিরকৃত সূর্যস্তবেও (৩, ৩) দেবতার সর্বাত্মক রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়া সপরিবারে

কাম্যকবনে প্রবেশ করিলে ধৌম্য ঋষি তাঁহাকে সূর্যের অষ্টোত্তরশতনাম বলেন, এবং ঋষিকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তিনি সূর্য-স্তব করিয়া দেবতার নিকট হইতে বর পান। Hopkins তাঁহার *Epic Mythology* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে মহাকাব্যদ্বয়ের অন্তর্গত আদিত্য স্তব কয়টি অর্বাচীন (পৃঃ ৮৮)। ইহা অসম্ভব নহে ; কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ের অন্যান্য প্রাচীনতর অংশ হইতে তৎকালে সূর্যোপাসনা প্রচলনের বহু প্রমাণ তিনি নিজেই তাঁহার গ্রন্থে সংগ্রহ করিয়াছেন (পৃঃ ৮৩-৯)। সে যাহাই হউক এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে এই স্তবগুলি এবং মহাকাব্যে প্রাপ্ত সূর্য বিষয়ক অন্যান্য উক্তি হইতে দেবতার যে সকল প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়, উহাদের অধিকাংশের মূল বেদোক্ত আদিত্য-সূর্য বর্ণনার মধ্যে নিহিত ; এগুলিতে বাহির হইতে আগত এক বিশেষ প্রকার সূর্যপূজা প্রতীকের কোনও প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। মহাভারতের দুএকটি স্থানে কিন্তু ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সে কথা একটু পরে বলিব। এ প্রসঙ্গে হর্ষবর্ধনের জীবনীকার বাণভট্টের বন্ধু ও আত্মীয় ময়ূরপ্রণীত (কিংবদন্তী এই যে বান ময়ূরের জামাতা ছিলেন) সূর্যশতকের কথা বলা যাইতে পারে। কথিত আছে যে ময়ূর শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হইলে সূর্যের উদ্দেশে এই শ্লোক শতক রচনা করিয়া রোগমুক্ত হন। শ্লোকগুলিতেও কোনও বৈদেশিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। Quackenbos তাঁহার *The Sanskrit Poems of Mayūra* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সূর্যশতক বিশ্লেষণ করিয়া ইহার বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ময়ূর তাঁহার সুলিখিত ও সুন্দর কবিতাগুলিতে বেদ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেই সূর্যসম্বন্ধীয় কিংবদন্তী ইত্যাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভবভূতির মালতী-মাধবের প্রথমাংশে সূত্রধার কর্তৃক সূর্যের নিকট প্রার্থনার মধ্যেও সাধারণভাবে সূর্যোপাসনার কথাই জানা যায়। এ উপাসনায় শকদ্বীপীয় সূর্যপূজার কোনও সুস্পষ্ট ছাপ

দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক কাল হইতে সনাতন প্রথায় প্রত্যক্ষ দেবতার উদ্দেশে ভারতীয়গণ যে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রদান করিয়া আসিতেছিলেন ইহাতে তাহারই অন্যরূপ প্রকাশ অনুভূত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ১০৭ হইতে ১১০ সর্গে সূর্যস্তুতি ও সূর্য সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বর্ণিত আছে; ইহাদিগের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে কোনও অভারতীয় কাহিনী বা কিংবদন্তীর উল্লেখ নাই। তবে ইহাতে সূর্যের শ্বশুর শিল্পী বিশ্বকর্মা কর্তৃক তাঁহার দেহকে শাণ যন্ত্রে ফেলিয়া তাঁহার তেজ হ্রাস করিবার যে গল্প আছে, উহাতে এতৎসম্পর্কিত কিছু পরোক্ষ ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধে পরে আরও আলোচনা করিব। এ প্রসঙ্গে আমি গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের সময়ে ও তাঁহার কিছু পরে ভারতীয় সূর্যপূজার বিষয়ে দুএকটি প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ উপস্থাপিত করিব। স্কন্দগুপ্তের সামন্তরাজ সর্বনাগ যখন অন্তর্বেদীর শাসক, তখন দেববিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপুরস্থিত (উত্তর প্রদেশে স্থিত বুলন্দসর জিলার বর্তমান ইন্দোর গ্রাম) সূর্যমন্দিরে প্রদীপদানের জন্য অক্ষয়নীবিতে কিছু অর্থ দান করিয়াছিলেন। হূণরাজ মিহিরকুলের নাম সম্বলিত গবালিয়র শিলালেখ হইতে জানা যায় যে মাতৃচেট নামক এক ব্যক্তি গোপাদ্রি পর্বতে (যে পাহাড়ে গবালিয়র দুর্গ অবস্থিত) একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সাধারণভাবে সূর্যবন্দনা বা উপাসনার বহুকাল যাবৎ প্রচলনের ফলে সুপ্রাচীনকালে হয়ত এই দেবতার সম্পূর্ণ ভারতীয় একভক্ত পূজক গোষ্ঠী গঠিত হইয়াছিল। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয় বলেন, 'It cannot but be expected, therefore, that a school should come into existence for the exclusive worship of the sun' (*op. cit.*, p. 152); তাঁহার অনুমান অযৌক্তিক নহে। Hopkinsএর মতে মহাভারতের দ্রোণপর্বে বোধ হয় এইরূপ এক সূর্যপূজক গোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তিনি তাঁহার *Epic Mythology* নামক গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, 'In the camp of the Pāṇdus there were "a thousand and eight others who were Sauras". That many worshipped the sun particularly, may be seen from the names of the Kurus' battle-friends, Sūryadhvaja, Rocamāna, Aṁśumat, Sūryadatta etc. There was also a "secret Veda of the sun" taught to Arvāvasu.'[১] প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে যে কতকগুলি ভারতীয় প্রাচীন মুদ্রায় (এগুলিকে সাধারণতঃ খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতক হইতে প্রথম খৃষ্টাব্দের মধ্যে ফেলা যায়) সূর্যমিত্র (সুয়মিত) ও ভানুমিত্র (ভানুমিত) নাম দুইটি পাওয়া যায় ; এগুলি তাম্রমুদ্রা, এবং ইহাদের একদিকে বৃত্তাকার রশ্মিমান সূর্যদেবতা পূজামূর্তিরূপে উৎকীর্ণ আছেন। পঞ্চাল দেশীয় সূর্যমিত্র ও ভানুমিত্র, যাঁহাদের নামে এই তাম্রমুদ্রাগুলি প্রস্তুত করা হইয়াছিল, মনে হয় সূর্যের একভক্ত পূজক বা সৌর ছিলেন।

উপরিলিখিত সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণের পরবর্তী কালের সাহিত্যেও সম্পূর্ণ ভারতীয় সৌর সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বিষয়ক প্রমাণ পাওয়া যায়। আনন্দগিরি প্রণীত শঙ্করবিজয় গ্রন্থের ত্রয়োদশ প্রকরণে শঙ্করাচার্য কর্তৃক সৌরমত নিরাকরণ প্রসঙ্গে সৌরদিগের

---

১ Hopkins পাণ্ডবদিগের পক্ষভুক্ত যে ১০০৮ সৌরদিগের কথা বলিয়াছেন, উহার প্রমাণ তিনি দ্রোণপর্বের ৮২ অধ্যায়ের ১৬ সংখ্যক শ্লোকে পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমি মহাভারতের কয়েকটি সংস্করণের উক্ত অংশে কোথাও তাঁহার উদ্ধৃতির অনুরূপ শ্লোক পাইলাম না। আমার মনে হয় এখানে কিছু ছাপার ভুল আছে। তবে তিনি যে সৌরদিগের সম্বন্ধে ঐরূপ প্রমাণ মহাভারতে পাইয়াছিলেন ইহা ঠিক, কারণ তিনি মহাভারতের এই শ্লোকটির আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন। কৌরবদিগের পক্ষেও সূর্যপূজক বীরগণের থাকা কিছুই অসম্ভব নহে।

বিবরণ দেওয়া আছে। আনন্দগিরি লিখিতেছেন বৃত্তাকার তিলক লাঞ্ছিত দিবাকরাদি সূর্যভক্তগণ লালবর্ণ পুষ্প হস্তে ধারণ করিয়া আচার্যসকাশে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজেদের উপাস্যদেবতার গুণসকল বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা শ্রুতি হইতে 'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ' (ঋগ্বেদ, ১. ১১৫, ১ ; সূর্য স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা), 'অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম' (ঐ সূর্যই ব্রহ্মস্বরূপ) প্রভৃতি বচন উদ্ধৃত করিয়া সূর্যই যে জগৎকারণ পরমাত্মা ইহা বলিলেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ (৩. ১, ১) হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহারা প্রতিপন্ন করিলেন যে ব্রহ্ম যখন সর্বজগতের কারণ এবং সূর্যই যেহেতু ব্রহ্ম সেহেতু সূর্যের জগৎকারণত্ব স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা স্মৃতি হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করিলেন :

> নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎ প্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
> ত্রয়ীময়াথ ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চি নারায়ণ শঙ্করাত্মনে ॥

'জগতের একচক্ষু, উহার সৃষ্টি-স্থিতি-নাশের কারণ, সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণের ধারক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক ত্রয়ীময় সূর্যদেবতাকে নমস্কার'। তাঁহারা যে পূর্বোক্ত অষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্রের (ওঁ ঘৃণিঃ সূর্য আদিত্যঃ) উপাসক ইহাও বলিলেন। আনন্দগিরি অতঃপর রক্তচন্দন পুণ্ড্রমালাধারী ষড়্‌বিধ সূর্যভক্তদিগের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম ভক্তগোষ্ঠী ব্রহ্মাত্মক সৃষ্টিকারণরূপে উদীয়মান সূর্যের ভজনা করেন। দ্বিতীয় উপাসকদল মধ্যগগনস্থ দেবতাকে সর্বজগতের সংহারকর্তা (রুদ্রশিবাত্মক) রূপে উপাসনা করিতেন। তৃতীয় সৌরবিভাগ অস্তগামী সূর্যকে বিষ্ণ্বাত্মক ও জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টিলয় হেতুভূত ও পরিপালক হিসাবে আরাধনা করেন। কোনও সৌরদল আবার দেবতার এই তিন প্রকাশকেই একত্রে উপাসনা করিতেন। অপর গোষ্ঠী সূর্যমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ পরমাত্মাস্বরূপের আরাধনা-তৎপর ছিলেন। শেষ দল সূর্যমণ্ডল নিরীক্ষণ, দেবতার ষোড়শোপচারে পূজা

প্রদান, তাঁহাতে সর্বকার্য সমর্পণ, এবং আগে সূর্যদর্শন করিয়া পরে খাদ্য গ্রহণ করা প্রভৃতি সৌরব্রত পালন করিতেন। ইহারা উত্তপ্ত লৌহ-ফলকের দ্বারা ললাটে, বক্ষঃস্থলে ও বাহুমূলে মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া অনুক্ষণ দেবতা ধ্যানতৎপর থাকিতেন[১]। ষড়বিধ সৌরগণ অষ্টাক্ষর সূর্যমন্ত্র পাঠ করিতেন এবং পুরুষসূক্ত, শতরুদ্রীয় এবং অন্যান্য নানাবিধ শ্রৌত গ্রন্থ হইতে বহু উক্তি সৌরমতের সমর্থনে ব্যাখ্যা করিতেন। বাণের হর্ষচরিত হইতে হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভাকরবর্ধন যে সৌর ছিলেন উহা জানা যায়। হর্ষবর্ধনের সোনপত তাম্রমুদ্রিকা (copper seal) লেখে উদ্ধৃত উঁহার বংশপরিচয়াত্মক অংশে প্রভাকর-বর্ধন, তাঁহার পিতা আদিত্যবর্ধন ও পিতামহ রাজ্যবর্ধনকে পরমাদিত্য-ভক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হর্ষের পিতা সম্বন্ধীয় বাণের বিবৃতিতে তাঁহাকে স্বভাবতই আদিত্যভক্ত বলা হইয়াছে। তিনি প্রতিদিন সূর্যোদয়ে স্নানপূর্বক শ্বেতবস্ত্র পরিধান ও শ্বেত বস্ত্রখণ্ডে মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া পূর্বাস্য ও নতজানু হইয়া কুঙ্কুম পিষ্টানুলিপ্ত মণ্ডলে সূর্যদেবের উদ্দেশে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে রক্তপদ্মের স্তবক অর্ঘ্য দিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে পুত্রকামনায় সমাহিতচিত্তে উপযুক্ত আদিত্যহৃদয় স্তব ভক্তিভাবে পাঠ করিতেন।[২] প্রভাকরের সৌরমত

---

১ আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয়, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ (এসিয়াটিক সোসাইটি, বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিস, পৃঃ ৯৬-৬)।

২ নিসর্গত এব চ স নৃপতিরাদিত্যভক্তো বভূব। প্রতিদিনমুদয়ে দিনকৃতঃ স্নাতঃ সিতদুকূলধারী ধবলকর্পটপ্রাবৃতশিরঃ প্রাঙ্মুখঃ ক্ষিতৌ জানুভ্যাং স্থিত্বা কুঙ্কুমপঙ্কানুলিপ্তে মণ্ডলকে পবিত্র পদ্মরাগপাত্রী নিহিতেন স্বহৃদয়েনেব সূর্যানুরক্তেন রক্তকমলষণ্ডেনার্চা দদৌ। অজপচ্চ জপ্যং সুচরিতঃ প্রত্যূষসি মধ্যন্দিনে দিনান্তে চাপত্যহেতোঃ প্রাধ্বং প্রযতেন মনসা জপ্তপূকো মন্ত্রমাদিত্য-হৃদয়ম্ ; হর্ষচরিত, চতুর্থ উচ্ছ্বাস। এখানে বলা আবশ্যক যে আনন্দগিরি বর্ণিত সৌর সম্প্রদায়ের কোনও কোনওটির ধর্মাচার ক্রিয়ার সহিত প্রভাকরের

সম্পূর্ণ ভারতবর্ষীয় ছিল বলিয়া অনুমান অযৌক্তিক নহে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর নাট্যকার কৃষ্ণমিশ্র (ইনি যেজকভুক্তির চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মনের সভাপণ্ডিত ছিলেন) তাঁহার প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে বৈষ্ণব শৈব ও সৌরদিগকে দেবী সরস্বতীর আশ্রয়ে থাকিয়া সেনাপতি মহামোহের অধীন বৌদ্ধ, জৈন ও জড়বাদী লোকায়ত বা চার্বাকদিগের সহিত যুদ্ধরত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রভাকরবর্ধনধৃত সৌরমত ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ে উক্ত সৌরদিগের ধর্মবিশ্বাস মনে হয় সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিল। এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে গুর্জরপ্রতীহাররাজ বিনায়কপালদেব (মহীপালদেব) ও তাঁহার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ মহারাজ শ্রীরামভদ্রদেব পরমাদিত্যভক্ত ছিলেন (পৃঃ ২৫৫-৫৬)। তবে তাঁহাদের সম্প্রদায় পূর্ণ ভারতবর্ষীয় ছিল কিনা বলা যায় না।

সূর্য-আদিত্য পূজা ও সূর্যপূজকগোষ্ঠীর যে পরিচয় উপরে দেওয়া হইল উহাতে কোনও অভারতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল না। গ্রহপূজা, যাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে প্রচলিত হয়, প্রথমে সম্পূর্ণ বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত ছিল কিনা উহা স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না। তবে বেশ কিছু প্রাচীন কাল হইতেই যে শকদ্বীপীয় সূর্যপূজা ভারতে, বিশেষ করিয়া উত্তর ভারতে, ইহার প্রভাব বিস্তার করে সে বিষয়ে সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয় ভারতীয় সূর্যোপাসনা ও বৈদেশিক লক্ষণযুক্ত সূর্যপূজা খৃষ্টাব্দ প্রারম্ভের অল্পকাল পর হইতেই যুগপৎ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। মহাকাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে শকদ্বীপ বলিয়া যে দেশ বর্ণিত আছে, উহা পারস্যদেশের পূর্বাংশকে বুঝাইত। ঐতিহাসিকগণের মতে খৃষ্টাব্দ আরম্ভের বহুপূর্ব হইতে মধ্য এশিয়ার শক জাতি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পূর্ব পারস্যে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস

সূর্যপূজাক্রম আংশিক ভাবে মিলে। তবে থানেশ্বর রাজ প্রভাকরবর্ধন শঙ্করা-চার্যের অন্তত দেড় শতাব্দী পূর্বে বর্তমান ছিলেন।

করিবার ফলে এই প্রদেশের নাম উহাদের নামের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। শকেরা পূর্বে যাযাবর প্রকৃতির ও অল্প সভ্যতাবিশিষ্ট ছিল, এবং ক্রমশঃ যে সব সভ্যজাতির সংস্পর্শে তাহারা আসে তাহাদের ধর্মাচার ও অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা উহারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে। পূর্ব পারস্যে বসবাসকালে শকেরা পারস্যদেশের ধর্মবিশ্বাস অনেকাংশে গ্রহণ করে, এবং তদ্দেশীয় অগ্নি ও সূর্যোপাসনাও উহাদের মধ্যে প্রচলিত হয়। এই শকদ্বীপ বা শকস্থান (ইহার বৈদেশিক রূপ Seistan বা Sijistan) হইতে তাহাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে বোলান গিরিবর্ত্মের (Bolan Pass) মধ্য দিয়া পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম ভারতে, পঞ্জাবে এবং মধ্যভারতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করে। তাহাদের সঙ্গেই মনে হয় পারসীক মিহির-মিথ্র পূজা (ভারতীয় মিত্র যে ইন্দো-ইরাণীয় দেবতা উহা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে) এদেশে প্রথম অনুপ্রবেশ করে, এবং পরে কুষাণ রাজগণ যখন খৃষ্টীয় প্রথম শতকে শক-পহ্লব রাজগণকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তখন উক্ত বৈদেশিক সূর্যপূজা ক্রমশঃ উত্তর ভারতে প্রভাবশালী হয়। দুইজন কুষাণ সম্রাট্ প্রথম কনিষ্ক ও হুবিষ্ক যে বুদ্ধ, শিব ও উমা, নানা, আতস প্রভৃতি ভারতীয় ও অন্যান্য জরথুস্ত্রীয় (পারসীক) দেবদেবীর সহিত মিহির মিথ্র দেবতার প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, উহা তাঁহাদের সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়। তাঁহাদের এইরূপ মুদ্রার অনেকগুলিতে মিহির-মিথ্র নাম সম্বলিত দেবমূর্তি উৎকীর্ণ আছে। উক্তরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং শক-পহ্লব-কুষাণাদি জাতিভুক্ত অপরাপর বৈদেশিকগণের চেষ্টায় মনে হয় এদেশে পারসীক সূর্যপূজা ক্রমশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। দেবতার পারসীক বিধি অনুযায়ী পূজাকার্যের জন্য ও অন্যান্য কারণে অগ্নি ও মিথ্রপূজক ম্যাগি নামক তদ্দেশীয় পুরোহিতগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আসিয়া

বসবাস করিতে থাকেন। কুব্জিকামত নামক প্রাচীন তন্ত্রের গ্রন্থকার ভীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যে সকল মগেরা শকদ্বীপ হইতে ভারতে প্রবেশ করিতেছিলেন তাঁহারা অচিরে ব্রাহ্মণদিগের সমান হইবেন। বলা বাহুল্য ইহা তন্ত্রকারের ভবিষ্যদ্বাণী নহে ; তাঁহার সময়ের পূর্বেই শকদ্বীপী ম্যাগি মগ-ব্রাহ্মণে পরিণত হইয়াছিলেন। কালক্রমে ইঁহাদের বংশধরেরা ভোজক ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন, এবং তাঁহাদের অনেকে জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া দৈবজ্ঞের কার্য উপজীবিকা-রূপে গ্রহণ করেন। তাঁহারা গ্রহবিপ্র নামেও পরিচিত হন, এবং হিন্দু গৃহস্থ কর্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্যে তাঁহাদের সর্বাগ্রে দান গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলনের ফলে, তাঁহারা কোথাও কোথাও (বাংলাদেশের অনেক স্থানে) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হন। মগ ব্রাহ্মণ-বংশীয়েরা যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতেই এই সকল কার্যের জন্য প্রসিদ্ধ হন উহা আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি। উহার গ্রন্থকার খুব সম্ভব ইঁহাদের অন্যতম ছিলেন ; ইহা তাঁহার নাম হইতে অনুমিত হয়। তিনি নিজে জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন ; তাঁহার গ্রন্থের সাংবৎসরসূত্র নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকে বরাহ-মিহির বলিতেছেন :

গ্রন্থতশ্চার্থতশ্চৈতৎ কৃৎস্নং জানাতি যো দ্বিজঃ।
অগ্রভুক্ স ভবেচ্ছ্রাদ্ধে পূজিতঃ পংক্তিপাবনঃ।

'(জ্যোতিষশাস্ত্র) গ্রন্থ এবং ইহার অর্থ যে ব্রাহ্মণ সম্যক্‌রূপে জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে অগ্রভুক্ ও পংক্তিপাবন (যে সারির প্রথমে ভোজনার্থে উপবেশন করেন ঐ সারিভুক্ত সকলকে পবিত্র করেন) বলিয়া সম্মানিত হন'। কিন্তু ভোজক, দৈবজ্ঞ ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা যে কালক্রমে অতি নিম্নস্তরের অপাংক্তেয় ব্রাহ্মণরূপে সমাজে নিন্দিত হন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কৃষ্ণদাস মিশ্রের রচিত মগব্যক্তি নামক গ্রন্থের সম্পাদনাকালে ওয়েবার জার্মান ভাষায় ইহার যে ভূমিকা লিখিয়াছিলেন,

উহা হইতে মগদিগের সম্বন্ধে বহু বিষয় জানা যায়। ওয়েবার সম্পাদিত গ্রন্থের নাম *Über die Magavyakti von Krishnadas Misra.*

উপরে খুব সংক্ষেপে শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার ভারতবর্ষে প্রথম অনুপ্রবেশ ও পরে বিস্তারের ঐতিহাসিক ক্রম আলোচিত হইল। উহার কাল্পনিক কাহিনী ভবিষ্য, সাম্ব, বরাহ প্রভৃতি পুরাণে কিভাবে বর্ণিত আছে এখন সংক্ষেপে উহার আলোচনা আবশ্যক। বাসুদেব-কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী জাম্ববতীর গর্ভজাত পুত্র সাম্ব কোনও কারণে এক সময়ে পিতার বিরাগভাজন হন। কৃষ্ণ সাম্বকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত পুত্র রোগগ্রস্ত হইয়া পিতার নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করিলে সূর্যপূজা করিতে উপদিষ্ট হন। ভারতীয় প্রথায় সূর্যোপাসনা করিয়া তাঁহার রোগের উপশম না হওয়াতে তিনি শকদ্বীপীয় প্রথায় দেবতার পূজা করিতে আদিষ্ট হন। তিনি চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্তী মুলস্থানপুরে (আধুনিক মুলতান) এক সূর্যমন্দির নির্মাণ করিয়া দেবতার বিগ্রহ স্থাপনা করেন। স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ এই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নিয়মিত পূজা করিতে অস্বীকার করায় বা অপারগ হওয়ায় সাম্ব চিন্তান্বিত হইয়া পড়েন। কংসপিতা মথুরাধিপতি উগ্রসেনের প্রধান পুরোহিত গৌরমুখ তখন তাঁহাকে শকদ্বীপে যাইয়া তদ্দেশস্থ সূর্যপূজক মগ ব্রাহ্মণগণকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে এই কার্যের ভার দিতে বলেন। এই উপদেশ অনুসারে শকদ্বীপে গিয়া সাম্ব সেখান হইতে এদেশে মগ ব্রাহ্মণ লইয়া আসেন, এবং এই পুরোহিতগণ শকদ্বীপীয় প্রথামত দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও পূজাদি করিলে তিনি রোগমুক্ত হন। ভবিষ্যপুরাণের ১৩৯তম অধ্যায়ে মগদিগের কাল্পনিক পুরাবৃত্ত দেওয়া আছে। শকদ্বীপে সুজিহ্ব নামক মিহির গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণের নিক্ষুভানাম্নী এক কন্যার গর্ভে সূর্যদেবতার ঔরসে জরশব্দ বা জরশস্ত নামে পুত্র জন্মে। জরশব্দ বা জরশস্তই মগদিগের

পূর্বপুরুষ। মগেরা তাঁহাদের বংশের আদি সূর্যদেবতার পূজাপরায়ণ ছিলেন, এবং তাঁহারা তাঁহাদের কটিদেশে অব্যঙ্গ নামে পবিত্র মেখলা ধারণ করিতেন। অভিনিবেশ সহকারে এই কিংবদন্তী অনুশীলন করিলে ইহার মধ্য হইতে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করা যায়। সূর্যপূজা যে কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক উহা ময়ূরের সূর্যশতক রচনার ইতিহাস হইতে আমরা জানিয়াছি। ভারতের বাহিরে ইরাণেও সুপ্রাচীনকাল হইতে জনগণের এ বিশ্বাস ছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক Herodotus বলিয়াছেন যে পারসীকদিগের মধ্যে এই ধারণা আছে যে সূর্যদেবতার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিলে কুষ্ঠরোগ হয়, এবং দেবতাকে যথাবিধানে তুষ্ট করিলে রোগমুক্তি ঘটে। সুতরাং পারস্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে মিত্র বা সূর্যপূজা প্রচলিত ছিল। পুরাণোক্ত জরশব্দ বা জরশস্ত পারসীক ধর্মগুরু Zoroasterএর ভারতীয় প্রতিরূপ ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায়। পারসীক ম্যাগি শব্দ হইতে যে মগ কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে—এ কথা আমি পূর্বে বলিয়াছি। মগ পরিহিত অব্যঙ্গ আবেস্তায় উক্ত Aivyāonghen কথাটি হইতে উদ্ভূত ; উহা পারসীকগণের দ্বারা ব্যবহৃত পবিত্র কুস্তির নামান্তর। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য পুরাণোক্ত কাহিনীর সহিত একত্রে তুলনামূলক আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে কিংবদন্তী রচয়িতৃগণ কিরূপে এক ইতিহাস সম্মত সত্যের কাল্পনিক রূপ দান করিয়াছিলেন।

এখন সুপ্রাচীন ও পরবর্তীকালের সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ আমাদিগকে এ বিষয়ে কিরূপ সাহায্য করে উহার আলোচনা প্রয়োজন। ভারতের একাংশে যে মগ ব্রাহ্মণগণ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় বা হয়ত প্রথম শতকে অধিষ্ঠিত ছিলেন উহা খুব সম্ভব টলেমির এক উক্তি হইতে জানা যায়। তাঁহার ভূগোল গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৭৪ সংখ্যক অংশে তিনি Brakhmanoi Magoi এবং তাহাদের অধ্যুষিত Brakhme নগরের কথা বলিয়াছেন। ভারততত্ত্ববিদ ল্যাসেন বহু পূর্বে অনুমান

করিয়াছিলেন যে ইহার দ্বারা টলেমি হয় ভারতে উপনিবেশকারী একদল পারসীক পুরোহিত নয় ম্যাগিদিগের ধর্মমত গ্রহণকারী এদেশীয় এক ব্রাহ্মণগোষ্ঠীর উল্লেখ করিয়াছেন। টলেমির এ উক্তি তিনি সমর্থন করেন নাই, কারণ তিনি বোধ হয় মনে করিয়াছিলেন যে এত পূর্বে মগ ব্রাহ্মণদিগের ভারতের কোন স্থানে, বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারতে (টলেমির বর্ণনায় মগ ব্রাহ্মণেরা কাবেরী তটবর্তী প্রদেশে বাস করিতেন) অবস্থান করা অসম্ভব। কিন্তু উপরে উদ্ধৃত ঐতিহাসিক তথ্য হইতে টলেমির উক্তি অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। বৃহৎসংহিতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপনম্ নামক অধ্যায়ে যে মগদিগের উল্লেখ আছে একথা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে (পৃঃ ১৪)। বরাহমিহিরের মতে মগ দ্বিজগণই সূর্যমূর্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। হিউয়েন সাং তাঁহার সি-ইউ-কিতে মুলতানের সূর্যমন্দির সম্বন্ধে বলিতেছেন, 'সেখানে বৌদ্ধ ব্যতীত অন্যান্য ধর্মসংশ্লিষ্ট মন্দিরগুলির মধ্যে একটি বৃহৎ ও সুন্দর সূর্যমন্দির উল্লেখযোগ্য ; সূর্যদেবের স্বর্ণ বিগ্রহ নানাবিধ মূল্যবান প্রস্তরখচিত ছিল, ইহা অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা-সম্পন্ন এবং ইহার যশ সুদূর বিস্তৃত ছিল। এই মন্দিরে নারীগণ (দেবদাসী ?) সর্বদা নৃত্যগীত করিতেন, সমস্ত রাত্রি আলো জ্বালিয়া রাখা হইত, এবং প্রায় সব সময়ে পুষ্প ধূপাদি দেবতাকে নিবেদন করা হইত। ভারতীয় রাজগণ ও বিভবশালী ব্যক্তিগণ দেবতার উদ্দেশে মূল্যবান দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিতেন এবং দুঃস্থ ও পীড়িত তীর্থযাত্রীদিগের জন্য খাদ্য, পানীয় ও ঔষধাদিসহ বিশ্রামগৃহ (ধর্মশালা) সকল নির্মাণ করিয়া দিতেন। সকল সময়েই মন্দিরে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত অন্যূন এক সহস্র তীর্থযাত্রী প্রার্থনারত থাকিতেন। মন্দিরের চারি পার্শ্বে দীর্ঘিকা, পুষ্পপূর্ণ উদ্যান ইত্যাদি থাকার জন্য স্থানটি অতি মনোরম আশ্রমে পরিণত হইয়াছিল (Watters, *On Yuan Chwang*, Vol. II, p. 254)। চীন পরিব্রাজকের মুলতানস্থ

সূর্যমন্দির সংক্রান্ত উপরিলিখিত বর্ণনা হইতে পুরাণোক্ত কাহিনীর পরোক্ষভাবে সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহার প্রায় চারি শতাব্দী পরে ভারতে আগমনকারী আরব পণ্ডিত ও ভৌগোলিক আবু রিহান (অল্ বিরুণী) মুলতান সূর্যমন্দিরের বিগ্রহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'মুলতানে হিন্দুদিগের আদিত্য নামে সূর্যবিগ্রহ আছে; ইহা কাষ্ঠনির্মিত ও রক্তবর্ণ চর্মাচ্ছাদিত; ইহার দুই চক্ষুতে দুইটি লাল চুনী বসানো। মুলতানের সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিল এই মূর্তি, যেহেতু ইহা দর্শন করিতে ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে তীর্থযাত্রী সমাগম হইত, এবং ইহার জন্য প্রচুর ধনরাশি প্রদত্ত হইত'। মুলতানের সূর্যমন্দির ও বিগ্রহ সম্পর্কে ঐ সময়কার অন্যান্য আরব ভৌগোলিকদিগের গ্রন্থ হইতেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ইহাদিগের মধ্যে আবু ইশাক অল ইস্তাখ্রি ও অল ইদ্রিসির নাম উল্লেখযোগ্য। যখন সিন্ধু ও তন্নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ আরবদিগের অধিকারে আসে, তখন মুসলমান শাসকগণ মুলতানের সূর্যবিগ্রহ ও মন্দির নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেন। যখনই তাঁহারা গুর্জর প্রতীহার প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের দ্বারা আক্রান্ত হইতেন, তখনই তাঁহারা এই মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া হিন্দুগণকে নিরস্ত করিতেন। দেবমন্দির ও বিগ্রহ হিন্দুপূজকদিগের নিকট এতই মূল্যবান ছিল যে তাঁহারা ইহাদের বিনিময়ে শত্রুনাশও চাহিতেন না। এই সূর্যমন্দির ঔরঙ্গজেব ধ্বংস করেন। অল্ বিরুণি বলিয়াছেন 'মুলতানের হিন্দুগণ তাঁহাদের পূজার দেবতা সূর্যের সম্মানে প্রতিবৎসর সাম্বপুরযাত্রা নামক এক উৎসব করিতেন। অল্ বিরুণি মগদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তাঁহার সময়েও ম্যাগিরা ভারতবর্ষে বাস করিতেন, সেখানে তাঁহারা মগ নামে অভিহিত হইতেন।[১]

১ Sachau, *Alberuni's India*, pp. 116, 184, and 21; বরাহ পুরাণের ১৭৭ অধ্যায়ে সাম্বাদিত্য নামে এক সূর্যবিগ্রহ মথুরায় সাম্বকর্তৃক

প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণও আদিমধ্যযুগে ভারতে মগ ব্রাহ্মণ ও শকদ্বীপী সূর্যপূজা সম্বন্ধে প্রভূত আলোকপাত করে। আমি মাত্র দুএকটি এজাতীয় সাক্ষ্যের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। মগধের উত্তর গুপ্তবংশীয় নৃপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের দেও-বরণার্ক স্তম্ভলেখে সূর্যপূজক ভোজকদিগের কথা আছে। লেখটির বিষয়বস্তু মোটামুটি এইরূপ,—মহারাজ জীবিতগুপ্ত বরুণবাসিন্ আখ্যায় বর্ণিত সূর্যবিগ্রহের উদ্দেশে পূর্বপ্রদত্ত বারুণিকা বা কিশোরবাটক নামক একটি গ্রাম দেবতার পূজার নিমিত্ত ব্যবহার করিবার পূর্ব ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহাতে বরুণবাসিন্ সূর্যমন্দিরের সহিত সংশ্লিষ্ট ভোজক সূর্যমিত্র, ভোজক হংসমিত্র, ভোজক ঋষিমিত্র এবং ভোজক দুর্ধরমিত্রের নাম উৎকীর্ণ আছে। বরাহমিহির কথিত দৈবচিন্তক জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রজ্ঞ অগ্রভুক্ ব্রাহ্মণের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। ইহারাই যে ভোজক মগ ব্রাহ্মণ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। Monier Williams তাঁহার *Sanskrit-English Dictionary*তে ভোজক শব্দের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন,—'ভোজজাতীয় রমণীগণের গর্ভে মগদিগের ঔরসে জাত সূর্যপূজক একশ্রেণীর পুরোহিত'। কিন্তু ইহা অপেক্ষা 'ভুজ্' ধাতুর প্রকৃত অর্থ ভোজন হইতে ভোজক শব্দের উৎপত্তি স্বীকার যুক্তিসঙ্গত। ইহার কয়েক শতাব্দী পরের গোবিন্দপুর শিলালেখে (শকাব্দ ১০৫৯, খৃষ্টাব্দ ১১৩৭-৩৮) এক শকদ্বীপীয় মগ ব্রাহ্মণবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। লেখটিতে মগবংশীয় কবি গঙ্গাধরের পূর্বপুরুষদিগের প্রশস্তি বর্ণিত আছে, এবং এই প্রশস্তি গঙ্গাধর নিজেই রচনা করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ ছিলেন ভারদ্বাজ, এবং ইহার শতসংখ্যক শাখা

স্থাপনের কথা বলা আছে; এই বিগ্রহের আর এক নাম সাম্বপুর। অল্ বিরুণির উক্তি অনুযায়ী সাম্বপুর মুলতানের সহিত সংযুক্ত, এবং ইহা মনে হয় প্রাচীনতর কিংবদন্তীর সমর্থক।

ছিল। ইহাতে ছয় জন প্রখ্যাত কবির উদ্ভব হয়, তাঁহাদের কাহারও কাহারও রচনার উল্লেখ পরবর্তী সাহিত্যে পাওয়া যায়; গঙ্গাধর তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। প্রশস্তির দ্বিতীয় পংক্তিতে লিখিত আছে যে সূর্য হইতে মগদিগের উৎপত্তি হয়, এবং সাম্বই ইহাদিগকে ভারতে আনয়ন করেন।[১] গঙ্গাধর তাঁহার মাতাপিতার পুণ্যহেতু একটি দীর্ঘিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। দেও-বরণার্ক গ্রাম বিহার প্রদেশের আরা জিলার এবং গোবিন্দপুর গ্রাম ঐ প্রদেশের গয়া জিলার অন্তর্ভুক্ত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে মধ্যযুগে মগধে বহু মগ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে এবং অন্যান্য অংশেও মধ্যযুগে শকদ্বীপীয় সূর্যপূজার বহুল প্রচলন ছিল। মুলতান হইতে গুজরাট ও কচ্ছদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে ঐ সময়ে বহু সূর্যমন্দির নির্মিত হইয়াছিল, উহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পাটনের ১৮ মাইল দক্ষিণে মোঢেরা নামক স্থানের সূর্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব ভারতের উড়িষ্যা প্রদেশের কোনার্ক সূর্যমন্দির বিখ্যাত। এই বিশাল দেবায়তন খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে গঙ্গবংশীয় নৃপতি লাঙ্গুলীয় নরসিংহবর্মনের আদেশে নির্মিত হইয়াছিল; ইহার যে অংশ এখনও বর্তমান আছে তাহার স্থাপত্য, কারুশিল্প ও বিশালত্ব বিশ্বের প্রত্যেক শিল্পরসিকেরই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। ব্রহ্ম পুরাণে এই দেবায়তন ও ইহার সূর্যমূর্তি সম্বন্ধে প্রচ্ছন্ন উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরাণটির কোণাদিত্য-মাহাত্ম্যবর্ণনম্ নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আছে:

---

১ *Epigraphia Indica*, Vol II, p. 333; পংক্তিটি এইরূপ—

দেবো জীয়াত্রিলোকীমণিরয়মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ শকদ্বীপী স্ম
দুগ্ধাম্বুনিধিবলয়িতো যত্র বিপ্রে মগাখ্যা।
বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততনোর্ভাস্বতঃ স্বাঙ্গ-সাম্বো যানানিনায়
স্বয়মিহ মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥

ততঃ সূর্যালয়ং গচ্ছেৎ পুষ্পমাদায় বাগ্‌যতঃ।
প্রবিশ্য পূজয়েত্তামুং কৃত্বা তু ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্ ॥৪৬॥
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা কোণার্কং মুনিসত্তমাঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা দীপৈর্ধূপৈর্নৈবেদ্যকৈরপি ॥৪৭॥

*　　　*　　　*

এবং ময়া মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রোক্তং ক্ষেত্রং সুদুর্লভম্।
কোণার্কস্যোদধেস্তীরে ভুক্তিমুক্তি ফলপ্রদম্ ॥৬৪॥

শকদ্বীপীয় সূর্যপূজার সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতে, তথা উত্তর ভারতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠালাভের বিষয় অধুনাপ্রাপ্ত দেবতা মূর্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয়। সূর্যবিগ্রহের প্রাচীনতম বর্ণনা বৃহৎ-সংহিতার প্রতিমালক্ষণম্ অধ্যায়ে (৫৭, দ্বিবেদী সংস্করণ) দেওয়া আছে। উহা এইরূপ :—

নাসাললাটজঙ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোন্নতানি রবেঃ।
কুর্যাদুদীচ্যবেষং (শং) গূঢ়ং পাদাদুরো যাবৎ ॥৪৬॥
বিভ্রাণঃ স্বকররুহে পাণিভ্যাং পঙ্কজে মুকুটধারী।
কুণ্ডলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারী বিয়দ্গ(ঙ্গ)বৃতঃ ॥৪৭॥

ইহার ভাবার্থ : 'সূর্যের (বিগ্রহ) নাসা, ললাট, জঙ্ঘা, উরুদেশ, গণ্ড ও বক্ষ উন্নত করা হইবে; (দেবতা) উদীচ্যবেশে সজ্জিত হইবেন, এবং তাঁহার পদদ্বয় হইতে বক্ষ পর্যন্ত আবৃত থাকিবে। তাঁহার দুই হস্ত হইতে দুইটি (সনাল) পদ্ম নির্গমনশীল, তাঁহার মস্তকে মুকুট, কণ্ঠে হার, কর্ণে কুণ্ডল এবং কটিদেশে বিয়দ্গ (ঙ্গ—অব্যঙ্গ)'। এই বর্ণনার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। দেবতার উত্তরদেশীয় পোষাক গ্রন্থকার-কর্তৃক স্পষ্টতরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার প্রায় সমস্ত শরীর আবৃত, এবং তাঁহার পরিধানে বিয়ঙ্গ বা অব্যঙ্গ নামক মেখলা। অব্যঙ্গ পারসীক Aivyāonghen কথাটির ভারতীয় প্রতিরূপ; উহার প্রকৃত অর্থ একটু আগে বলা হইয়াছে। উদীচ্যবেশ সম্বন্ধে ইহা বলিলে

যথেষ্ট হইবে যে শক বা কুষাণ প্রভৃতি উত্তরদেশাগত ভারতের বৈদেশিক শাসকগণের যে বেশ ছিল উহারই এই নাম। পূর্ববর্তী দুই একটি অধ্যায়ে ভূমারার শিব মন্দিরের কথা বলা হইয়াছে। উক্ত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষগুলির (এগুলি এখন কলিকাতাস্থ Indian Museum এ রক্ষিত আছে) মধ্যে একটি দণ্ডায়মান সূর্যমূর্তি আছে। উহা অনেকাংশে বৃহৎসংহিতার বর্ণনার সহিত মিলে, এবং ইহা হইতে উদীচ্যবেশের প্রকৃত রূপ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। মথুরা মিউজিয়মে রক্ষিত মহারাজাধিরাজ প্রথম কণিষ্কের প্রতিমূর্তির স্কন্ধদেশ হইতে আজানু প্রলম্বিত দীর্ঘ গাত্রাবরণ (long coat) উদীচ্যবেশের প্রধান অঙ্গ, এবং ভূমারা সূর্যবিগ্রহের গাত্রাবরণের আদর্শ। ভূমারা সূর্যের পা দুটি দেখানো নাই ; যদি তাঁর স্থানক মূর্তি পূরাপূরি দেখানো থাকিত তাহা হইলে তাঁহার পদদ্বয়ে কণিষ্কের পায়ে যেরূপ 'মোটা ও লম্বা জুতা' পরানো আছে, সেরূপ দেখা যাইত। গুপ্তযুগের ও তৎপরবর্তীকালের উত্তরভারতীয় মূর্তিকারগণ প্রায় সর্বত্র সূর্যমূর্তির পায়ে এই 'বুট জুতা' দেখাইয়াছেন। দীর্ঘ গাত্রাবরণ কালক্রমে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্হিত হয়, কিন্তু পদাবরণ উদীচ্যবেশের প্রতীক রূপে থাকিয়া যায়। কটিদেশে মেখলার সঙ্গে অব্যঙ্গ কোথাও স্পষ্ট, আবার কোথাও অস্পষ্ট। উত্তর ভারতীয় সূর্য বিগ্রহের হস্তস্থিত পদ্ম, কর্ণে কুণ্ডল ও শিরোভূষণ প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার, সপ্তাশ্ব যোজিত রথ ইত্যাদি বিবিধ ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অব্যঙ্গ, দীর্ঘ গাত্রাবরণ ও উচ্চ পদাবরণ একত্র মিলিত হইয়া এতদ্দেশীয় সূর্যপূজা যে কি ভাবে শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পড়ে তাহার পরিচয় প্রদান করে। দক্ষিণ ভারতীয় সূর্যমূর্তিগুলিতে এই সকল বৈদেশিক ছাপ নাই ; সেখানে মন্দির ও বিগ্রহ সহযোগে সূর্যোপাসনা সেরূপ বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

উত্তর ভারতীয় সূর্যবিগ্রহের অভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যাখ্যাকল্পে

পুরাণকারগণ নানাবিধ কিংবদন্তী রচনা করিয়া ঐগুলি যে বহিরাগত নহে বোধ হয় ইহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সব গল্প অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা, এবং এগুলিতে সাধারণতঃ বিগ্রহের পদাবরণের ব্যাখ্যাই দেওয়া হইয়াছে, গাত্রাবরণের নহে[১]। প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ। বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞার সহিত সূর্যের বিবাহ হয়। প্রথম প্রথম সূর্যপত্নী স্বামীর প্রচণ্ড তেজ সহ্য করিলেও, অল্প দিন পরেই উহা তাঁহার অসহ্য হইয়া পড়ে। তখন সংজ্ঞা তাঁহার ছায়াকে স্বামীর নিকট তাঁহার পরিবর্ত স্বরূপ রাখিয়া সূর্যের অজ্ঞাতসারে উত্তর-কুরুপ্রদেশে চলিয়া যান। সূর্য প্রথমে সংজ্ঞার ছায়াকে সংজ্ঞা মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু যখন তাঁহার ভ্রান্তি নিরসন হয় তখন তিনি সংজ্ঞার সন্ধানে উত্তরকুরুপ্রদেশে গিয়া নিজ স্ত্রীর সহিত মিলিত হন। কেন সংজ্ঞা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন উহার কারণ স্ত্রীর নিকট জানিতে পারিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুর শিল্পী বিশ্বকর্মার দ্বারা নিজ শরীরের তেজ হ্রাস করাইয়া লন। বিশ্বকর্মা জামাতার দেহকে তাঁহার শানযন্ত্রে ফেলিয়া উহার বেশী অংশের তেজ হ্রাস করেন, কিন্তু পদদ্বয়ের তেজ হ্রাস করিতে পারেন নাই। সুতরাং পা দুটি আবৃতই থাকিয়া যায়। ইহাই সংক্ষেপে সূর্যের পদাবরণের ব্যাখ্যা। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক যে এই পৌরাণিক গল্প সূর্যসম্বন্ধীয় এক বৈদিক উপাখ্যানকে

---

১ দু একটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন পুরাণে তাঁহার গাত্রাবরণের কথা আছে, কিন্তু তাহার বিশদ ব্যাখ্যা দিবার কোনও প্রয়াস নাই। বিষ্ণুধর্মোত্তরে সূর্যমূর্তি বর্ণন প্রসঙ্গে উহার উদীচ্যবেশের ও বর্মাচ্ছাদিত দেহের কথা আছে (তৃতীয় খণ্ড, অধ্যায় ৬৭) ; মৎস্য পুরাণে তাঁহার গাত্রাবরণের ও পদাবরণের কথা এইভাবে বলা হইয়াছে :—চোলকচ্ছন্ন বপুষং ক্বচিচ্চিত্রেষু দর্শয়েৎ। বস্ত্রযুগ্মসমোপেতং চরণৌ তেজসাবৃতৌ (২৬১, ৪)। বিগ্রহের দেহ কোথাও কোথাও বস্ত্রাবৃত, আর উহার দুই চরণ তেজোরাশির দ্বারা ঢাকা। এই 'তেজোরাশির' ব্যাখ্যা অপর কয়টি পুরাণে দেওয়া আছে।

আশ্রয় করিয়া বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ কিংবদন্তীকার কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তে যে ত্বষ্টৃ দুহিতা সরণ্যূর সূর্যদেবতা বিবস্বতের সহিত বিবাহ ইত্যাদির গল্প বর্ণিত আছে, উহাই পুরাণকার এই প্রকারে ব্যবহার করিয়াছিলেন। শকদ্বীপীয় সূর্যোপাসনার ভারতে প্রচলন বিষয়ে মূর্তিগত পরিচয় যে এরূপ ভাবে পাওয়া যায়, ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। মহাভারতে সূর্যপুত্র কর্ণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, উহাতেও মনে হয় এ বিষয়ক ইঙ্গিত আছে। ইহাতে সূর্যের ঔরসজাত কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের জন্মকালে তাঁহার দেহ সহজাত কবচে আচ্ছাদিত ছিল।

সৌরদিগের পূজা প্রতীক সম্বন্ধে আর দু একটি কথা বলিয়া আমি এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। পূর্ণ ভারতীয় মতে সূর্য্যোপাসনায় সূর্যের বৃত্তাকার বিম্ব, অর ও নেমিযুক্ত চক্র, এবং সনাল ও নালবিহীন কমল ইত্যাদির চিত্র প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হইত। এতদ্দেশীয় প্রাচীন অঙ্কচিহ্নযুক্ত (punch-marked) মুদ্রা এবং পঞ্চাল দেশীয় সূর্যমিত্র ও ভানুমিত্রের মুদ্রা প্রভৃতি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। তবে খৃষ্টাব্দ প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার সামান্য কিছু পূর্ব হইতেই যে সূর্যদেবতার মনুষ্যরূপী মূর্তি পূজিত হইতে থাকে উহার প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ পাওয়া যায়। বম্বে প্রদেশস্থিত ভাজা গুহা গাত্রে, ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফা গাত্রে এবং বুদ্ধগয়ার প্রাচীন মন্দির বেষ্টনীতে চতুরশ্ববাহিত রথে আসীন দ্বিভুজ দেবতার মূর্তি খোদিত দেখা যায়। তবে ইহা সত্য যে এই তিন স্থানে দেবতা বুদ্ধ ও জিন পূজার আঙ্গিক হিসাবে প্রদর্শিত হইয়াছিলেন। সৌর সম্প্রদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট দেবতার পূজামূর্তি বোধ হয় মথুরাতেই প্রথম পাওয়া যায়। রক্ত প্রস্তরে (red sandstone) নির্মিত যে কয়টি মূর্তি মথুরা ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে সেগুলি শক-কুষাণযুগের, এবং তাহাদের আকৃতি হইতে বুঝা যায় যে উহারা শকদ্বীপী প্রথায় সূর্যপূজার জন্য ব্যবহৃত

হইত। এগুলি ছিল সাধারণতঃ দ্বিভুজ, গাত্র ও পদাবরণযুক্ত আসন মূর্তি ; ইহাদের হস্তে পদ্মকোরক, দণ্ড বা খড়্গ প্রভৃতি দেখানো হইত। এ প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে মথুরা ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এ জাতীয় অপর কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, যেগুলিকে সূর্যোপাসক শাম্বের পূজামূর্তি বলিয়া নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। আমি আমার একটি প্রবন্ধে এই অনুমানের সপক্ষে যুক্তি দিয়াছি। পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুযায়ী শকদ্বীপীয় সূর্যপূজা ভারতে আনয়নকারী কৃষ্ণপুত্র সাম্বের অনেকাংশে সূর্যের অনুরূপ বিগ্রহ পূজা সৌরদিগের মধ্যে প্রচলিত থাকা আদৌ অসম্ভব নহে (*J. I. S. O, A.*, 1944, 'Images of Sāmba')। গুপ্তযুগের উত্তরভারতীয় সূর্যবিগ্রহগুলি প্রায়ই স্থানক পর্যায়ের ছিল, এবং ইহাদের একচক্র রথে সপ্তাশ্ব যোজিত থাকিত। অতি সুন্দরভাবে নির্মিত দুইটি প্রস্ফুট সনাল পদ্ম ইহাদের হস্তে দেওয়া হইত। উত্তর গুপ্ত ও বিশেষ করিয়া গুপ্ত পরবর্তী যুগে সূর্য বিগ্রহগুলির পরিবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দেবমূর্তির সম্মুখে ও পার্শ্বে তাঁহার সারথি অরুণ (মধ্যযুগীয় মূর্তিশাস্ত্রে ইহাকে কখনও কখনও অনূরু বলা হইয়াছে, অনূরুর অর্থ যাঁহার উরুর নিম্নভাগ বা পদ নাই), মহাশ্বেতা বা পৃথিবী, রাজ্ঞী (সংজ্ঞা), ছায়া, নিক্ষুভা ও সুবর্চসা নামক সূর্যের পত্নীগণ, দণ্ডী ও পিঙ্গল প্রভৃতি অনুচর (বিভিন্ন মূর্তিশাস্ত্রে সূর্যানুচরদের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা স্কন্দ, শ্রৌষ ইত্যাদি পাওয়া যায়), অন্ধকার বিনাশকারী উষা ও প্রত্যূষা দেবীদ্বয় প্রভৃতি প্রদর্শিত হইতে থাকেন। দক্ষিণ ভারতীয় সূর্যমূর্তিগুলির এত বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য ছিল না। খুব সংক্ষেপে ভিন্ন ভিন্ন যুগে সূর্যদেবতার বিভিন্ন রূপ কল্পনার সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, উহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই বিচিত্র দেব-বিগ্রহগুলি ভারতীয় ও অভারতীয় সূর্যোপাসনার কিরূপভাবে সংমিশ্রণ হইয়াছিল সে বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করে। আধুনিক কালে ভারতবর্ষে একাত্মিকা সূর্যপূজার প্রচলন আর নাই। কিন্তু আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন

বিশেষ করিয়া স্মার্তমতাবলম্বী হিন্দুর নানাবিধ ধর্মাচরণের মধ্যে ইহা পূর্ণভাবে বর্তমান। বাংলাদেশের 'ইতুপূজা' (অনেকের মতে 'ইতু' 'মিতু' বা 'মিত্র শব্দের অপভ্রংশ) এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশীয় ভারতবাসীর 'ছট্‌পরব' প্রভৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পূর্বযুগের সূর্যোপাসনা আত্মগোপন করিয়া আছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্মার্ত পঞ্চোপাসনা

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় হইতে ত্রয়োদশ অধ্যায় অবধি দ্বাদশটি অধ্যায়ে পঞ্চোপাসনার প্রত্যেকটির রূপগত বৈশিষ্ট্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সর্বশেষ চতুর্দশ অধ্যায়ে পাঁচটি উপাসনার সমন্বয়সূচক প্রকৃতি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলন আবশ্যক। বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রধান উপাস্য দেবতার রূপ বিশ্লেষণ কালে দেখানো হইয়াছে যে এইরূপ এক একটি দেবতার পূর্ণ রূপায়ণে কত বিচিত্র উপাদান কার্যকরী হইয়াছিল। গাণপত্য, বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকবৃন্দ তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার রূপ কল্পনায় এক দেবতার সহিত অন্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। দেবতা পরস্পরের মধ্যে কল্পিত নানারূপ সম্পর্ক যে প্রধানতঃ কিংবদন্তী-মূলক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেমন শিব ও শক্তি বা শিব ও গণপতির স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্র সম্পর্ক, মহাকাব্যকার ও পৌরাণিক কিংবদন্তীকারগণ সর্বতোভাবে সমর্থন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল কল্পিত সম্পর্কের উৎস যে ইঁহাদেরই উর্বর মস্তিষ্ক ব্যতীত অন্য কিছু নহে ইহা বলা চলে না। ইহাদের উৎস সন্ধানে আমাদের বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন স্তরে পৌঁছাইতে হয়। বাজসনেয়ী সংহিতায় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে রুদ্র (শিবের বৈদিক প্রতিরূপ) অম্বিকার (শক্তির অন্যতম নাম) ভ্রাতা, এবং কিঞ্চিৎ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাঁহার স্বামী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন। রুদ্র যে মরুৎগণের পিতা একথা বেদের কোনও কোনও অংশে উক্ত আছে। এই সম্পর্ক খুব সম্ভব পৌরাণিক যুগে শিব ও গণের অধিপতি গণেশের সম্পর্ক নির্ধারণে সাহায্য করিয়াছিল, এ কথা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছি। বৈদিক

বিষ্ণু সূর্যের আদিত্যরূপের এক প্রকাশ, ইহা সর্বজনবিদিত। বৈদিক যুগে বিষ্ণু ও শক্তির মধ্যে কোনও সম্পর্কের বিষয় বর্ণিত না হইলেও, বেদোত্তর যুগে শক্তির এক প্রকাশ বাসুদেব-কৃষ্ণ-বিষ্ণুর ভগিনী রূপে কল্পিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র কোথাও কোথাও আদিত্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন; সুতরাং বিষ্ণুর সহিত ইঁহার সহজাত সম্পর্ক বর্তমান থাকা অসম্ভব নহে। এদিক দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে পৃথক্‌ভাবে গৃহীত পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন মুখ্য ইষ্ট দেব দেবীর আদি রূপগুলির পরস্পরের মধ্যে মিলন প্রবণতা সম্প্রদায়গত উপাসনার প্রবর্তনের পূর্ব হইতেই বর্তমান ছিল। পরে ভক্তিবাদের পূর্ণতর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যখন পৃথক্ পৃথক্ ভক্তিপাত্র বা ভক্তিপাত্রীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপাসক গোষ্ঠী গড়িয়া উঠিল, তখন বা তাহার অল্পকাল পর হইতেই এই পার্থক্যের মধ্য হইতে ঐক্যের ও সমন্বয়ের চেষ্টা আরম্ভ হইল। উপাস্য দেব দেবীর মধ্যে কল্পিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে এই চেষ্টার সহায়ক হইয়াছিল, এ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

কিন্তু সম্প্রদায়গত ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রধানতম সহায়ক ছিল স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ এবং ইহাদিগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতজীবন স্মার্ত সম্প্রদায়। স্মৃতি শাস্ত্র শ্রুতি বা বেদ হইতে পৃথক্, এবং ব্যাপক অর্থে ইহা ছয়টি বেদাঙ্গ, শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রাবলী, ধর্মশাস্ত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতিগ্রন্থ, মহাকাব্যদ্বয় (এগুলি ইতিহাস নামে অভিহিত), বিভিন্ন পুরাণ ও উপপুরাণ এবং নীতিশাস্ত্র-সমূহ ইত্যাদিকে বুঝাইত। আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রায় এই সকল গ্রন্থাদিতে লিখিত ভিন্ন ভিন্ন অনুশাসনের এবং বিধি নিষেধের দ্বারা পরিচালিত হইতেন। এদিক দিয়া বিচার করিতে গেলে তাঁহাদের গোষ্ঠীগত ঐক্যের কথা স্বভাবতই মনে পড়িবে। কিন্তু ইহাও সত্য যে তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার

তাঁহাদের ধর্মজীবনে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতেন। দীক্ষিত বৈষ্ণব, দীক্ষিত শৈব প্রভৃতি উপাসকগণ এইরূপে ধর্মজীবনের দিক দিয়া পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িলেও, ব্যবহারিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য কোনও সময়ে ছিন্ন হয় নাই। এই ঐক্য হইতে আবার ক্রমশঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে ধর্মের দিক দিয়াও সমন্বয় সাধিত হয়। এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদিগকে দৃষ্টি দিতে হইবে। বহু পূর্ব হইতেই অনেক হিন্দু মনীষী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি-দিগের মধ্যে এ ধারণা ছিল যে মত ও পথ বিভিন্ন হইলেও সকলের লক্ষ্য একই। উপাসকগণ পৃথক্ পৃথক্ মুখ্য দেবতার উপাসনা করিলেও তাঁহারা অনেকে এক ঈশ্বরের বহু নাম ও রূপ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। শ্রুতিতে উক্ত 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'র প্রকৃত তাৎপর্য তাঁহারা কোনও দিন বিস্মৃত হন নাই, এবং তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার মধ্যে যে অন্য সম্প্রদায়গত দেবতাদিগের প্রকাশ ছিল উহা তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস করিতেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উক্তি এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। ইহার সপ্তম অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে, নবম অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে এবং অন্যত্র তাঁহাকে দিয়া বলানো হইয়াছে যে বিভিন্ন দেবতার ভক্তগণ যখন ভক্তিভাবে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ইষ্ট দেবতার পূজা করেন, তখন তাঁহারা নিজ নিজ বিধি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন। গীতা স্মৃতিশাস্ত্রের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ ও প্রস্থান ত্রয়ের মুখ্যতম প্রস্থান। সুতরাং ইহার সাক্ষ্যের মূল্য খুব বেশী। এ সম্বন্ধে কৃষ্ণ মিশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয়ের একটি উক্তিও উল্লেখযোগ্য। নাটকে বলা হইয়াছে যে বৈষ্ণব, শৈব ও সৌরগণ দেবী সরস্বতীর অধীনে থাকিয়া সেনাপতি মহামোহের অধীন বৌদ্ধ, জৈন ও চার্বাকদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। ইহার পঞ্চম অঙ্কে শান্তিদেবী প্রশ্ন করিতেছেন যে বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন

মতাবলম্বিগণ কিরূপে তাঁহাদের পরস্পরের ভিতর পার্থক্যবোধ বিস্মৃত হইয়া একত্র হইলেন? ইহার উত্তরে শ্রদ্ধাদেবী বলিতেছেন যে বিজ্ঞ ব্যক্তিরা ভাল রূপেই জানেন যে এই সকল সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণ ও তাঁহাদের ধর্মদর্শন আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে সত্যকারের কোনও বিরোধ নাই; উপাসকদিগের আগমশাস্ত্র সকল নানা পথের কথা বলিলেও সকল জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে তেমন এই বিভিন্ন পথ ও মত জগদীশ্বরের দিকেই তাঁহাদিগকে লইয়া যায়।[১] ইহার পরিপোষক যুক্তি আমরা বৈষ্ণব শৈবাদি উপাসকদিগের মুখ্য ইষ্ট দেবতাগণের উদ্দেশ্যে রচিত স্তব বা স্তোত্রসমূহ বিশ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া পাঠ করিলেই বুঝিতে পারি। এই সকল স্তবস্তুতিতে এক সম্প্রদায়ের দেবতা অন্য সম্প্রদায়ের দেবতার সহিত একাত্মীভূত হইতেন। কিংবদন্তীকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। হরি-হর, শিব-শক্তি, শিব-সূর্য, বিষ্ণু-সূর্য প্রভৃতি দেবতা সমন্বয় সম্বন্ধে তাঁহারা কাহিনী রচনা করিয়া সর্বাত্মক সমন্বয় সাধনে যত্নবান হইতেন। সমন্বয়াত্মক পূজাপ্রতীকগুলিও (syncretic icons) কিরূপে অপেক্ষাকৃত প্রাচীনকাল হইতে এই বিষয়ে এক কার্যকরী অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে কথা একটু পরে বলিতেছি।

---

১ নাটকের পঞ্চমাঙ্কে বিষ্ণুভক্তি সকাশে শ্রদ্ধা দেবী সরস্বতী ও তাঁহার অনুচরবর্গের (বৈষ্ণব শৈবসৌরাদয়ঃ) সহিত মহামোহের অধীনস্থ কাম ক্রোধাদির সংগ্রামের বিবরণ প্রদান কালে শান্তিদেবী প্রশ্ন করিতেছেন, অয়ে, কথং পুনঃ স্বভাব প্রতিদ্বন্দিনামাগমানাং তর্কানাং চ সমবায়ঃ সম্পন্নঃ। তখন শ্রদ্ধা উত্তর করিতেছেন: আগমানাং চ তত্ত্বং বিচারয়তামবিরোধ এব। তথাহি—

তৈস্তৈরিব সদাগমৈঃ শ্রুতিমুখৈর্নানাপথপ্রস্থিতৈ—
র্গম্যোঽসৌ জগদীশ্বরো জলনিধির্বারাং প্রবাহৈরিব॥

(প্রবোধচন্দ্রোদয়, নির্ণয় সাগর সংস্করণ, পৃঃ ১৭২-৪)

দীক্ষিত স্মার্ত উপাসক উল্লিখিত নানা কারণে একত্রে পঞ্চোপাসকরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। আনন্দগিরিকৃত শঙ্করবিজয় কাব্যে শঙ্করাচার্য-কর্তৃক গাণপত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগোষ্ঠীর পরাজয়ের যে সব কাহিনী বর্ণিত আছে, উহার প্রত্যেকটির শেষে বলা হইয়াছে যে ইহারা পরমগুরু (শঙ্করাচার্য) কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার শুদ্ধাদ্বৈতবাদনিরত স্নান ও পঞ্চপূজাদি সংকর্মপরায়ণ শিষ্যে পরিণত হইয়াছিলেন (ইত্যুপদিষ্টাস্তে পরমগুরুং নত্বা শুদ্ধাদ্বৈত-বিদ্যানিরতাঃ স্নানপঞ্চপূজাদিসৎকর্মিণঃ শিষ্যা বভূবুঃ ; শঙ্করবিজয়, পৃঃ ১২৯)। আনন্দগিরির উক্তি অনুযায়ী বলিতে হয় যে শঙ্করাচার্য প্রখ্যাত অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক হইলেও ব্যবহারিক জীবনে স্মার্ত পঞ্চোপাসক ছিলেন।

সনাতনপন্থী হিন্দুগণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, শ্রৌত ও স্মার্ত। শেষোক্ত বিভাগের সংখ্যা অত্যধিক এবং ইহাদিগের মধ্যে দীক্ষিত ও অদীক্ষিত সকলেই প্রায় পঞ্চপূজাপরায়ণ ছিলেন। কোনও বিশেষ দেবতামন্ত্রে দীক্ষিত স্মার্ত উপাসক পূজাকালে তাঁহার ইষ্টদেবতাকে স্বভাবতই প্রাধান্য প্রদান করিতেন; কিন্তু তিনি পঞ্চোপাসনার বিষয়ীভূত অন্যান্য দেবতাকেও তাঁহার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি সমর্পণ করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। নিত্যাহ্নিক প্রভৃতি কার্যেও যেরূপ তিনি নিজ ইষ্টদেবতা ব্যতীত অন্য চারি দেবতাতে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, সেরূপ নৈমিত্তিক কার্যেও স্মার্ত গৃহস্থের বাটীতে পুরোহিত 'গণেশাদি পঞ্চ দেবতাভ্যো নমঃ' মন্ত্র পাঠ করিয়া ফুল জল অর্ঘ্যাদির দ্বারা পঞ্চ দেবতার পূজা করিতেন এবং এখনও করেন। আহ্নিক সন্ধ্যা-বন্দনাকালে স্মার্তপূজক কি ভাবে পঞ্চদেবতার উপাসনা করেন, উহার খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা Farquhar তাঁহার *An Outline of the Religious Literature of India* গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠায় দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, 'Images or stone and metal symbols,

or diagrams, or earthenware pots, may be used to represent the divinities. The image or symbol of the god whom the worshipper prefers is placed in the centre, and the other four are so set as to form a square around the central figure.' ইহার অর্থ এইরূপ,—'মূর্তি কিংবা প্রস্তর বা ধাতুখণ্ডরূপ প্রতীক, কিংবা অঙ্কিত চিত্র অথবা মৃৎপাত্রসমূহ (পঞ্চ) দেবতার প্রতিভূস্বরূপ রাখা হয়। যে দেবতা উপাসকের সর্বাপেক্ষা প্রিয় উহার মূর্তি বা প্রতীক মধ্য-ভাগে রাখিয়া অপর চারিটি দেবতার মূর্তি বা প্রতীকগুলিকে উহার চারি পার্শ্বে এমন ভাবে সাজানো হয় যাহাতে কেন্দ্রস্থ মূর্তি বা প্রতীকসহ সেগুলি একটি চতুষ্কোণের রূপ ধারণ করে। এখানে বলা আবশ্যক যে গ্রন্থকার যেখানে পূজকের পছন্দমত দেবতাকে কেন্দ্রস্থ করার কথা বলিয়াছেন, সেখানে উহার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে যে মধ্যস্থিত প্রতীকরূপী দেবতার দীক্ষিত উপাসক হিসাবে স্মার্তপূজক তাঁহার ইষ্টদেবতাকে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক স্থান দিয়া থাকেন।'[১]

এই গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে তন্ত্রসারে বর্ণিত পঞ্চায়তনী দীক্ষা নামক অন্যতম তান্ত্রিক দীক্ষাবিধির কথা বলা হইয়াছে। যামল হইতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয় নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়া তান্ত্রিক শক্তি উপাসকের এই বিধি অনুযায়ী পূজাক্রমের কথা বলিয়াছেন :—

---

১ Farquhar পঞ্চদেবতার সাধারণ পূজা প্রতীকগুলির এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুর : শালগ্রামশিলা, শিবের : নর্মদেশ্বর প্রস্তর (ইহাকে বাণ-লিঙ্গও বলা যাইতে পারে); দেবীর : একখণ্ড ধাতু বা দক্ষিণ ভারতের একটি নদীতে প্রাপ্ত স্বর্ণরেখা নামক প্রস্তরখণ্ড ; সূর্যের : হয় বৃত্তাকার সূর্যকান্ত প্রস্তর, নয় একখণ্ড স্ফটিক ; গণেশের : আরা (বিহার প্রদেশস্থ)র নিকটবর্তী নদীতে প্রাপ্ত স্বর্ণভদ্র নামক প্রস্তর ফলক।

ভবানীন্তু যদা মধ্যে ঐশান্যামচ্যুতং যজেৎ।
আগ্নেয্যাং পার্বতীনাথং নৈঋর্ত্যাং গণনায়কঃ।
বায়ব্যাং তপনঞ্চৈব পূজাক্রমঃ উদাহৃতঃ॥

(তন্ত্রসার পৃঃ ১১৮)

অর্থাৎ, 'মধ্যে (আধার মধ্যে) ভবানী, ঈশান কোণে বিষ্ণু (অচ্যুত), অগ্নিকোণে উমাপতি শিব, নৈঋর্ত কোণে গণপতি এবং বায়ুকোণে তপন (সূর্য) কে অর্চনা করিবে; ইহাই (পঞ্চায়তনী দীক্ষা সম্মত) পূজাক্রম বলিয়া বর্ণিত।' শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকের পক্ষে দেবী ভবানীকে কেন্দ্রস্থ করাই স্বাভাবিক। কিন্তু তন্ত্রসারকার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বলিয়াছেন যে যখন গোবিন্দ, শিব, সূর্য এবং গণেশকে একৈক ক্রমে কেন্দ্রস্থ করা হইবে তখন চতুষ্পার্শ্বস্থ দেবতার অবস্থান পরিবর্তিত হইবে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে গ্রন্থকার দীক্ষিত স্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগেরই এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তন্ত্রসারের অন্যস্থানেও স্মার্ত পঞ্চোপাসনার কথা আছে; বাহুল্যভয়ে উহার বিশদ আলোচনা এখানে করা হইল না। প্রসঙ্গতঃ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে একজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিত মহারাষ্ট্র দেশে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার বিষয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া নিজ গ্রন্থে উহার বিবরণ দিয়াছেন, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি। পঞ্চায়তন পূজায় পাঁচটি শিলা ব্যবহৃত হইয়া থাকে; শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গ বিষ্ণু ও শিবের, একখণ্ড ধাতু প্রস্তর শক্তির, এক খণ্ড স্ফটিক সূর্যের এবং রক্তবর্ণ প্রস্তর গণেশের প্রতীক। এগুলি একটি বৃত্তাকার মুক্তাবরণ ধাতুপাত্রে বিভিন্ন ক্রমে (উপাসকের ইষ্টদেবতা অনুযায়ী) সাজাইয়া পূজার নামই পঞ্চায়তন পূজা। পূজাপ্রতীকগুলির ধাতুপাত্রে স্থাপনের ভিন্ন ভিন্ন ক্রম তন্ত্রসারোক্ত পাঁচটি পৃথক্ ক্রমের সহিত মিলে। পঞ্চায়তন পাত্রের এক পার্শ্বে একটি ঘণ্টা, অপর পার্শ্বে একটি শঙ্খ এবং নিকটে নিম্নে ছিদ্রযুক্ত একটি কলস রক্ষিত থাকে; সছিদ্র কলসের

জলে পূজা প্রতীকগুলিকে স্নান করানো হয় বলিয়া ইহার নাম অভিষেক কলস। উক্ত ধাতুপাত্রের নিকটে আর একটি ধাতুপাত্রে তুলসী (বিষ্ণুপূজাব জন্য), বিল্বপত্র (শিব, শক্তি ও গণপতি পূজায় ব্যবহৃত), নানারূপ পুষ্প, চন্দন, দূর্বা ইত্যাদি রক্ষিত থাকে। সাধারণ তান্ত্রিক পূজাক্রম যথা আচমন, গণপতি বন্দন (এ গণপতি ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলেব ২৩ সূক্তে স্তুত ব্রহ্মণস্পতি-বৃহস্পতি স্বরূপ), ন্যাস, আসন শুদ্ধি, জলশুদ্ধি, শঙ্খ ঘণ্টাদির পূজা ও ঘণ্টাবাদ্য করিয়া উপাসক পঞ্চদেবতাকে ষোড়শোপচারে পুরুষসূক্তেব (ঋগ্বেদ, ১০,৯০) ষোড়শ অনুবাক একৈকক্রমে মন্ত্ররূপে পাঠ কবিয়া পূজা করেন।[১] এখানে বলা আবশ্যক যে এই পূজাক্রম যে শুধু পঞ্চায়তন পূজাতেই ব্যবহৃত হইত বা হয় তাহা নহে; ইহা সাধাবণতঃ পৃথক্ ভাবে দেবদেবীব পূজায় বা অংশতঃ সন্ধ্যা বন্দনায়ও আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু কর্তৃক অনুসৃত হইয়া থাকে।[২]

পঞ্চায়তন পূজার প্রত্নতাত্ত্বিক যে সকল নিদশন অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে এখন কিছু বলা প্রযোজন। এই নিদর্শনগুলি প্রধানতঃ মধ্যযুগীয় মর্তি ও মন্দিবসংক্রান্ত। প্রথমে বিহার প্রদেশের

১ ষোডশোপচার নিম্নলিখিত রূপঃ (১) আবাহন, (২) আসন (তুলসীপত্র), (৩) পাদ্য (পদ প্রক্ষালনার্থ জল), (৪) অর্ঘ্য (সচন্দন দূর্বা ও অক্ষত অর্থাৎ আতপ চাল), (৫) আচমনীয় (জল), (৬) স্নান (দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ইত্যাদি মিশ্রিত জলের সাহায্যে), (৭) বস্ত্র (তুলসী-পত্র), (৮) উপবস্ত্র (তুলসীপত্র), (৯) গন্ধ (চন্দন), (১০) পুষ্প, (১১) ধূপ, (১২) দীপ, (১৩) নৈবেদ্য (১৪) প্রদক্ষিণ, (১৫) মন্ত্রপুষ্প (শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র পাঠসহ পুষ্পপ্রদান), ও (১৬) প্রণাম।

২ Monier Williams তাঁহার *Religious Thought and Life in India* নামক গ্রন্থের ৪১১-১৬ পৃষ্ঠায় মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের বাডীতে তিনি যে পঞ্চাযতন পূজা দেখিয়াছিলেন উহার উপরিলিখিতরূপ বিবরণ দিয়াছেন।

এক অংশে প্রাপ্ত এবং অধুনা Indian Museumএ রক্ষিত একটি শিবলিঙ্গের কথা বলা যাইতে পারে। Museumএর নথিপত্রে ইহাকে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। মধ্যস্থ শিবলিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে গণপতি, বিষ্ণু, পার্বতী ও সূর্যের মূর্তি খোদিত আছে। ইহার এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে যে কেন্দ্রস্থ শিবলিঙ্গ সমেত ইহা বিহারবাসী কোনও প্রাচীন স্মার্ত পঞ্চোপাসকের পূজা প্রতীক। শিবলিঙ্গ মধ্যে থাকায় ইহা অনুমান করা আদৌ অসঙ্গত নহে যে এই স্মার্ত পঞ্চোপাসক শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি কাশীর এবং উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি ভাস্কর্যনিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। এগুলির আয়তন দৈর্ঘ্যে ৩।৪ ফুটের অনধিক ও ভিত্তিতে ইহাদের পরিধিও প্রায় ঐরূপ, এবং ইহাদের আকৃতি ক্ষুদ্র রেখমন্দিরের অনুরূপ। ইহাদের শিখরের নিম্নভাগে চারিপার্শ্বে চারিটি ছোট ছোট নাতিগভীর মন্দিরপ্রকোষ্ঠ (niche) উৎকীর্ণ, এবং এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে যথাক্রমে গণপতি, বিষ্ণু, সূর্য ও উমা-মহেশ্বরের মূর্তি খোদিত রহিয়াছে। এই ক্ষুদ্রাকৃতি ভাস্কর্য নিদর্শনগুলিও যে স্মার্ত পঞ্চোপাসনার প্রতীক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। উমা-মহেশ্বরের একত্র মূর্তি শৈব-শাক্ত উপাসনার এবং গণপতি, বিষ্ণু ও সূর্যের মূর্তি একৈকভাবে গাণপত্য, বৈষ্ণব ও সৌর উপাসনার প্রতীক। এই জাতীয় নিদর্শনগুলি যে স্মার্ত পঞ্চোপাসকদিগের পূজাকার্যে ব্যবহৃত হইত এ অনুমান খুবই সঙ্গত। ইহা ত গেল পূজার জন্য ব্যবহৃত সমন্বয়-সমর্থক মূর্তি ও ক্ষুদ্র মন্দিরগুলির কথা। কিন্তু মধ্যযুগের ভারতের, বিশেষ করিয়া মধ্য ও পূর্ব ভারতের, অংশবিশেষে যে সকল মন্দির-সংস্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাদিগের কতকগুলি উপরি লিখিত স্মার্ত পূজাবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়।

ইণ্ডো-এরিয়ান স্থাপত্যশৈলীর এই জাতীয় মন্দির-সংস্থা পঞ্চায়তন

পর্যায়ে ফেলা হয়। ইহার মধ্যভাগে শিব, বিষ্ণু, দেবী বা সূর্যের মূল মন্দির, এবং মন্দির চত্বরের চারিকোণে পঞ্চোপাসনার অপর চারিটি দেবতার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। এই পর্যায়ভুক্ত মন্দিরাবলীর অন্যতম প্রাচীন দেবগৃহ উড়িষ্যা প্রদেশের মুখলিঙ্গমস্থ মুখলিঙ্গেশ্বরের শিবমন্দির। ইহা খৃষ্টীয় নবম-দশম শতকের; ইহার কেন্দ্রস্থলে শিবের মন্দির, এবং চত্বরের চারিকোণে চারিটি ছোট ছোট মন্দির। মধ্যভারতের খাজুরাহোর চন্দেল্লবংশীয় নৃপতিগণ খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগ হইতে খৃষ্টীয় একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে বহু বিচিত্র মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাদিগের অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের, এবং ইহাদের মধ্যে দুইটি স্পষ্টতঃ পঞ্চায়তন পর্যায়ভুক্ত। এ দুইটি বিশ্বনাথ শিবমন্দির ও চতুর্ভুজ বিষ্ণুমন্দির; ইহাদের কেন্দ্রস্থলে যথাক্রমে শিব ও বিষ্ণুর নাতিবৃহৎ মন্দির এবং চারিকোণে অপর চারিটি দেবতার ক্ষুদ্র মন্দির। ভুবনেশ্বরের বহুসংখ্যক শিবমন্দিরের মধ্যে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উড়িষ্যারাজ উদ্যোতকেশরীর মাতা রাণী কোলাবতীর আদেশে নির্মিত ব্রহ্মেশ্বর শিবমন্দির পঞ্চায়তন জাতীয়। রাজপুতানার (বর্তমান রাজস্থান প্রদেশ) যোধপুব সহরের ৩২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ওসিয়া গ্রামে নাতিবৃহৎ কিন্তু অনবদ্য স্থাপত্যশৈলীর পরিচায়ক ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মসংক্রান্ত অনেকগুলি দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি এই পযায়ের, এবং একটির মূল মন্দিরস্থ গর্ভগৃহে হরি-হর দেববিগ্রহ অবস্থিত। এই বৈষ্ণব-শৈব সম্প্রদায়ের সমন্বয়াত্মক দেববিগ্রহ সম্বন্ধে পরে আরও কিছু বলা হইবে, কিন্তু এখানে ইহা বলা আবশ্যক যে স্মার্ত পঞ্চোপাসনা সংক্রান্ত মন্দির-সংস্থার মুখ্য বিগ্রহটিও সমন্বয়সূচক। ওসিয়ার অপর দুই একটি পঞ্চায়তন মন্দিরের মধ্যে সপ্তম সংখ্যক মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার মূল মন্দিরে সূর্যবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, এবং অন্য চারি দেবতার ক্ষুদ্র মন্দিরগুলি

মুখ্য সূর্যমন্দিরের সহিত বারান্দার দ্বারা যুক্ত। এই মন্দির-সংস্থার শিল্পকলা অতি মনোরম, এবং ওসিয়াস্থ অন্য মন্দিরগুলির কারুকার্য অপেক্ষা উন্নত। ইহাদের নির্মাণকালও অপেক্ষাকৃত প্রাচীন—আনুমানিক খৃষ্টীয় অষ্টম-নবম শতাব্দী। ইহার কিছু পরে ভারতের সুদূর উত্তরে কাশ্মীর প্রদেশে তথাকার উৎপলবংশীয় স্মার্ত বিষ্ণুভক্ত নরপতি অবন্তীবর্মণের (৮৫৫—৮৮৩ খৃষ্টাব্দ) সময়ে নির্মিত অবন্তী-স্বামী বিষ্ণু মন্দিরটির কথা বলা আবশ্যক। ইহাও স্মার্ত পঞ্চোপাসনা সংক্রান্ত, এবং ইহার মধ্যস্থ মুখ্য বিষ্ণুমন্দিরের চারিকোণে চারিটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির অন্য চারি দেবতার অবস্থান সূচিত করিতেছে। তবে এক্ষেত্রে মুখ্য ও গৌণ মন্দিরগুলি পরস্পর সংযুক্ত নহে। ইহার ন্যূনাধিক তিন শতাব্দী পরে নির্মিত দাক্ষিণাত্যের নাসিক জিলাস্থ সিন্নার গ্রামের গোণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরটি পঞ্চায়তনী পর্যায়ের; এ জাতীয় মন্দির দাক্ষিণাত্যে অধিকসংখ্যক পাওয়া যায় না[১]। Farquhar স্মার্ত উপাসনাসংক্রান্ত সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু মন্দিরগুলির দুই প্রধান বিভাগের কথা বলিয়াছেন, একটি স্মার্ত ও অপরটি সাম্প্রদায়িক। তাঁহার মতে স্মার্তমন্দিরের পূজাবিধি বৈদিক, কিন্তু ইহা সর্বাংশে সত্য নহে। পূজাক্রমে যে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হইত উহার কথা একটু আগেই বলিয়াছি। কিন্তু অন্য নানাবিধ নিয়ম তান্ত্রিক পর্যায়ের ছিল। Farquhar প্রসঙ্গতঃ বলিয়াছেন যে উত্তর ভারতে

---

১ উড়িষ্যা প্রদেশের মুখলিঙ্গেশ্বর ও ব্রহ্মেশ্বর মন্দির আমি নিজে দেখিয়াছি। খাজুরাহো, অবন্তীস্বামী ও সিন্নার মন্দির সংস্থাগুলির বর্ণনা আমি Percy Brown মহাশয়ের *Indian Architecture Buddhist and Hindu* গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। ওসিয়া মন্দির কয়টি সম্বন্ধে আমি ভারতীয় বিদ্যাভবন হইতে প্রকাশিত *The History and Culture of the Indian People,* Vol. V এ শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী মহাশয় লিখিত ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ক অধ্যায় হইতে সাহায্য লইয়াছি।

এখন বিশুদ্ধ স্মার্তমন্দির খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গুজরাটের এখনকার শিবমন্দিরগুলিতে, শিবলিঙ্গ ব্যতীত (প্রধান গর্ভগৃহে), দেবী, গণেশ, কুর্মরূপী বিষ্ণুর মূর্তি দেখা যায়। সূর্যের কোনও বিগ্রহ দেখা যায় না, কারণ তিনি প্রত্যক্ষ দেবতারূপে পূজিত হন। ইহা স্বীকার্য যে এখন অধিকাংশ স্মার্তই শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত, যদিও বৈষ্ণব ও শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত স্মার্তও দেখা যায়। সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়-ভুক্ত স্মার্ত এখন বড় দেখা যায় না।

স্মার্ত পঞ্চোপাসনার সাহিত্যগত, ব্যবহারিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনার পর ইহার বিবর্তনে আরও যে এক উপাদান সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতে খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পর কিছু পূর্বে এবং পরে যবন, শক, পহ্লব, কুষাণ ও হূণ প্রভৃতি যে সব বৈদেশিক জাতি উত্তর ভারতে অভিযান করিয়া নিজ নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল এবং অল্পকালেব মধ্যে ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসীরূপে পরিণত হইয়াছিল তাহাদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাগবত হেলিওদোর ও পঞ্চ বৃষ্ণিবীরের প্রতিমা প্রতিষ্ঠাপায়িত্রী শক মহিলা তোষার কথা এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এই সব বিদেশী ও বিদেশিনীর এবং ভারতীয় আদিম অধিবাসীদিগের ভাগবত ধর্ম গ্রহণের কথা ভাগবতকার অতি নিপুণভাবে একটি শ্লোকে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

কিরাত হূণান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা আভীর সুহ্মা যবনা খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়া শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥

(ভাগবত পুরাণ, ২. ৪, ১৮)

ইহার তাৎপর্য—'কিরাত, হূণ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, সুহ্ম, যবন ও খসাদি এবং অন্যান্য পাপ জাতি যাঁহার উপাশ্রিত অর্থাৎ ভক্তদিগের শরণাগত হইয়া শুদ্ধিলাভ করে (পবিত্র ভাগবত ধর্ম গ্রহণ করে), সেই প্রভাবশালী ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার।' রুদ্রদামন প্রভৃতি শক

মহাক্ষত্রপ, কুষাণরাজ বিম কদফিস, হূণ রাজ মিহিরকুল প্রভৃতি যে শৈবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহার প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ বর্তমান। কুষাণ-বংশীয় মহারাজ কনিষ্ক ও হুবিষ্ক ব্রাহ্মণ্য হিন্দু দেব দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন; ইহা তাঁহাদের স্বুবর্ণ ও তাম্র মুদ্রা হইতে প্রমাণিত হয়। এই প্রসঙ্গে কতকটা যাযাবর প্রকৃতির ও অল্পসভ্য শক, কুষাণ, হূণ প্রভৃতি জাতীয় নরপতির ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত মনোভাব বিশ্লেষণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে তাঁহারা একাধিক দেবতাকে একৈকভাবে বা উহাদের সমন্বয় জ্ঞাপক দেবতাকে আরাধনা করিতে ভালবাসিতেন। Azes, Azilises, ও Gondophares প্রভৃতি শক-পহ্লব রাজগণের কতকগুলি মুদ্রা এবং কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের মুদ্রারাজি এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। এ সবের বিস্তৃত আলোচনা করা এখানে সম্ভব নহে।[১]

আমি এ প্রসঙ্গে মাত্র একটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের প্রতি আমার পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। ইহা একটি nicolo seal (একরূপ ধাতুতে নির্মিত মুদ্রিকা); ইহার কথা বহুপূর্বে Alexander Cunningham প্রথম বলেন। মুদ্রিকাটির মাত্র এক দিকে একটি দৃশ্য ও Tocharian লিপিতে একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। দৃশ্যটি এই—স্থানক চতুর্ভুজ দেববিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে এক বৈদেশিক নৃপতি দণ্ডায়মান; বিগ্রহের শিরোভূষণ ও অল্প কয়টি অলঙ্কার আছে; ইহার সম্মুখের হস্ত দ্বয়ে চক্র ও গদা, এবং পিছনের দুই হাতে শঙ্খ (?)

---

১ *Development of Hindu Iconography* (Second Edition) গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ের ৫৪২ হইতে ৫৪৩ পৃষ্ঠায় এবং The Cultural Heritage of India, Vol. IV এর Cult Syncretism নামক ২৩ সংখ্যক প্রবন্ধে (পৃঃ ৩৩২—৩৪) আমি এবিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থের পাঠকবর্গকে আমি উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাগুলি পাঠ করিতে বিনীত অনুরোধ করি।

ও অস্পষ্ট লাঞ্ছন। বিগ্রহের পার্শ্ববর্তী লেখটি Cunningham পড়িতে পারেন নাই এবং সেজন্য ইহার বিষ্ণু বলিয়া ভ্রান্ত পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু R. Ghirshman ইহার সঠিক পাঠোদ্ধার করিয়া বলিয়াছিলেন যে লেখটিতে এক সঙ্গে শিব, বিষ্ণু ও মিহিরের নাম পাওয়া যায়। Ghirsman আরও বলিয়াছেন যে Cunningham যে সম্মুখস্থ নৃপতির হুবিষ্ক বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন উহাও ভ্রান্ত। তিনি যথার্থই বলিয়াছিলেন যে লেখ হইতে বুঝা যায় যে বিগ্রহটি শিব, বিষ্ণু ও মিহির (সূর্য) দেবতাত্রয়ের সমন্বয়াত্মক প্রকাশ, ও ইহার উপাসক একজন Hephthalite হূণ সর্দার বা নৃপতি। তাঁহার মতে এ মুদ্রিকাটির নির্মাণকাল খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের পূর্বে হইতে পারে না। উপরিলিখিত প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শনসমূহ অভিনিবেশ সহকারে অনুশীলন করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার সমন্বয় সাধনে অল্প সভ্য বৈদেশিকগণের সক্রিয় অংশ ছিল।[১]

একাধিক দেবতার সমন্বয় ও যুগপৎ পূজা সাধারণ ভারতবাসী কি ভাবে করিয়াছিলেন এ সম্বন্ধে আমি এখন কয়েকটি প্রত্নতত্ত্বগত নিদর্শন উপস্থাপিত করিব। ইতিপূর্বে আমি দেখাইয়াছি যে একই ব্যক্তি যুগপৎ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতার উদ্দেশে বিগ্রহ স্থাপনা ও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে সামন্তরাজ বিষ্ণুবর্মনের অমাত্য ময়ূরাক্ষক কর্তৃক বিষ্ণু ও মাতৃগণের মন্দির স্থাপনার কথা পূর্বে বলা হইয়াছে (পৃঃ ২৫২)। আমি এখন এরূপ আরও কয়েকটি উদাহরণ দিব। গৌপ্তাব্দ ১৯৩ (খৃষ্টাব্দ ৫১২-১৩) সালে গুপ্ত সামন্ত নৃপতি উচ্ছকল্পের মহারাজ শর্বনাথের একটি তাম্র-

১ Nicolo sealটি সম্বন্ধে আমি আমার পূর্বোদ্ধৃত গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে (পৃঃ ১২৪) ও দ্বাদশ অধ্যায়ে (পৃঃ ৫৪৪) বিশদ আলোচনা করিয়াছি। মুদ্রিকাটি উক্ত গ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে (plate XI, No. 2)।

শাসন মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এলাকাস্থ খো নামক গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। ইহার বিষয়বস্তু অংশতঃ বৈষ্ণব ও অংশতঃ সৌর। ইহাতে লিখিত আছে যে মহারাজ শর্বনাথ তমসা নদীতীরস্থিত আশ্রমক নামক গ্রামটি বিষ্ণু ও সূর্যমন্দিরের ব্যয় নিবাহার্থ দান করিয়াছিলেন (C. I. I., III, pp. 126-27)। গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায়ে মৌখরিরাজ অনন্তবর্মন কর্তৃক নাগার্জুনী পর্বতস্থ গুহা মন্দিরে কাত্যায়নী (মহিষমর্দিনী) বিগ্রহ স্থাপনার কথা বলা হইয়াছে (পৃঃ ২৫২)। অনন্তবর্মন সম্ভবতঃ স্মার্ত পঞ্চোপাসক ছিলেন; কারণ তাঁহার অপর দুএকটি শিলালেখ হইতে জানিতে পারি যে তিনি অন্য দেবতাবিগ্রহ তথায় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নাগার্জুনি পর্বতের নিকটস্থ বরাবর (ইহার পূর্ব নাম প্রবরগিবি) পর্বতে লোমশ ঋষি গুহার প্রবেশ দ্বারের একটি লেখ হইতে জানা যায় যে সামন্তরাজ মৌখরি অনন্তবর্মন প্রবরগিরি পর্বত গুহায় ভগবান কৃষ্ণের একটি সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন (C. I. I., III, pp. 222-23)। নাগার্জুনি পর্বতে প্রাপ্ত উক্ত নৃপতির অপর একটি লেখ আমাদিগকে জানাইয়া দেয় যে তিনি সেখানে ভূতপতি শিব ও দেবীর একটি বিস্ময়কর মূর্তি স্থাপনা করেন (তেনাদ্ভুতং কারিতং বিম্বং ভূতপতে-গুর্হাশ্রিতমিদং দেব্যাশ্চ)। একটি বিগ্রহই যখন শিব ও উমার বিগ্রহ বলিয়া লেখটিতে বর্ণিত হইয়াছে, তখন যে ইহা শিব-শক্তির সমন্বয়সূচক অর্ধনারীশ্বর মূর্তি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই (*Ibid*, pp. 224-25)। অর্ধনারীশ্বরের দক্ষিণার্ধে শিবের দেহার্ধ ও বামার্ধে উমার দেহার্ধ একত্রিত হইয়া শিব-শক্তির যুক্তরূপ চিত্রিত করে। এলিফ্যান্টা গুহা মন্দিরে যে এই রূপ সমন্বয় কি অনবদ্য উপায়ে শিল্পী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছিল সে কথা গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। অনন্তবর্মনের শিলানুশাসনগুলি প্রমাণিত করে যে তিনি তিনটি মুখ্য সাম্প্রদায়িক ধর্মের (শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব) প্রতি যুগপৎ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

অধ্যায় শেষে আমি আরও কতিপয় সমন্বয়াত্মক মূর্তির বা ঐ জাতীয় নিদর্শনের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। প্রথমেই দক্ষিণ ভারতে কাবেরীপক্কম্ নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলা ফলকের কথা বলিব। ইহা অসম চতুষ্কোণ, এবং ইহার উপরিভাগে সারিবদ্ধ-ভাবে গণপতি, ব্রহ্মা, নরসিংহ, শিবলিঙ্গ, বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, উমা-মহেশ্বর, শ্রীবৎসচিহ্ন এবং দুর্গা মহিষমর্দিনীর চিত্রসকল খোদিত আছে। ইহাতে সূর্যের চিত্র দেখা যায় না (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে দক্ষিণ ভারতে মূর্তির সাহায্যে সূর্যপূজার সেরূপ প্রচলন ছিল না); কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বলা যায় যে পূজা প্রতীক এই শিলাফলকটি বিশিষ্ট উপায়ে তথাকার এক আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দুর সমন্বয়সূচক ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। হরিহর বা হর্যর্ধমূর্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এইরূপ বহু প্রাচীন মূর্তি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে; আমি তন্মধ্যে বাদামী গুহা মন্দিরের গাত্রে খোদিত একটি শিল্পসমৃদ্ধ হরিহর মূর্তির কথাই বলিব। চতুর্ভুজ স্থানক দেবতার দক্ষিণার্ধ হরের এবং বামার্ধ হরির; হরার্ধের সম্মুখস্থ হস্তের কিছু অংশ ভাঙিয়া যাওয়ায় ইহাতে যে কি লাঞ্ছন ছিল তাহা বুঝা যায় না, কিন্তু অন্য হস্তে এক প্রসারিতফণ সর্প; হরি অংশের সামনের হাত কটির উপর ন্যস্ত ও পিছনেরটি শঙ্খ ধরিয়া আছে। বৃষভানন নররূপী নন্দী ও উমা হর ভাগের পার্শ্বে, এবং হ্রস্বাকৃতি মনুষ্যরূপী গরুড় এবং পদ্মকরা লক্ষ্মী হরি অংশের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আনুমানিক খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের এই মূর্তিটি সুন্দর ভাবে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের সমন্বয় সূচনা করিতেছে। বিহার প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত (অধুনা Indian Museumএ রক্ষিত) একটি মিশ্রপ্রকৃতির মূর্তি কয়েকটি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মের ঐক্যবোধক পরিচয় দেয়। চতুর্ভুজ হরিহরের দুইপার্শ্বে সূর্য ও বুদ্ধকে দেখাইয়া বিগ্রহকার বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও বৌদ্ধধর্মের ঐক্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু

ও বৌদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের দেবতাদিগের সমন্বয় নির্দেশক কয়েকটি মূর্তি আশুতোষ চিত্রশালা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা (রাজসাহী) প্রভৃতি স্থানে রক্ষিত আছে। ইহাদের এরূপ নামকরণ করা যায়—যথা, শিব-লোকেশ্বর, সূর্য-লোকেশ্বর, বিষ্ণু-লোকেশ্বর ইত্যাদি। শৈব ও সৌর সম্প্রদায়ের সমন্বয়-জ্ঞাপক একটি মূর্তি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির রাজসাহীস্থ চিত্রশালায় দেখা যায়; শারদাতিলক তন্ত্র অনুযায়ী ইহাকে মার্তণ্ড-ভৈরবের মূর্তি বলা চলে। মধ্যপ্রদেশে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগের সূর্য-নারায়ণের কয়েকটি বিগ্রহ পাওয়া গিয়াছে; ইহারা বৈষ্ণব ও সৌর ধর্মের ঐক্য সূচনা করে।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের সহিত সূর্যের একত্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উল্লেখযোগ্য—

ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তনুঃ।
ত্রিধা যস্য স্বরূপস্তু ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০৯, ৭১)

ইহার অর্থ—'হে দীপ্তিমান্ সূর্য আপনার শরীরে ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণু অধিষ্ঠিত, উহার (আপনার তনুর) এই তিন রূপ, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'। শারদাতিলক তন্ত্রের চতুর্দশ পটলের ৪১-২ শ্লোক দুইটি অনুরূপ ভাব-প্রকাশক। ইহার রচয়িতা লক্ষণদেশিক (খৃষ্টীয় একাদশ শতক) বলিতেছেন—

বন্দেৎপাদং চতুর্থস্তং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্।
সৌরায় যোগপীঠায় নমঃ পদমনন্তরম্!
পীঠমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতো দিনেশস্য জগৎপতেঃ॥

অর্থাৎ, 'সৌর যোগপীঠকে নমস্কার: ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক সূর্যের চারি পাদ (বা রূপ) বলা হয়। ইহাই জগৎপতি দিনেশের (সূর্যের) পীঠমন্ত্র বলিয়া আখ্যাত।' উক্ত শ্লোক দুইটিতে ব্যাখ্যাত সমন্বয়াত্মক

দেববিগ্রহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনেক পাওয়া গিয়াছে। আমি উহাদিগের মধ্যে মাত্র কয়েকটির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিব। চিদম্বরমের নটরাজ মন্দিরের গোপুরস্থ ত্রিশীর্ষ, অষ্টভুজ, সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে অধিষ্ঠিত সূর্যমূর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার সামনের হাত দুইটি অভয় ও বরদ মুদ্রায় প্রদর্শিত, কিন্তু পিছনের অন্যান্য হস্তে চক্র, পাশ, শূল, টঙ্ক, পদ্ম, পুস্তক প্রভৃতি লাঞ্ছন ন্যস্ত আছে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কি করিয়া ইহা একাধারে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক সূর্যদেবতাকে রূপায়িত করিতেছে। উত্তর গুজরাট প্রদেশস্থ দেলমাল গ্রামে যে লিম্বোজী মাতার মন্দির আছে, উহার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রায় অনুরূপ সূর্যবিগ্রহের একটি ছোট মন্দির দেখা যায়। উহার তিন মস্তক (মাঝেরটি একসঙ্গে বিষ্ণু ও সূর্য, ও পাশের দুটি ব্রহ্মা ও শিবকে নির্দিষ্ট করিতেছে), হস্তস্থিত শূল, সর্প, কমণ্ডলু (চক্র ও অন্যান্য লাঞ্ছন ছিল কিন্তু হাত কয়েকটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না) প্রভৃতি চিহ্ন ইহার প্রকৃত রূপ জানাইয়া দিতেছে। উহা গরুড়বাহন, এবং উহার নিম্নে হংস ও বৃষভের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তি খোদিত। বাহনগুলিও যে ইহার সমন্বয়াত্মক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয় সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। বহুপূর্বে Burgess ইহার প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, 'in one figure the four divinities, Viṣṇu, Śiva and Brahmā, or the Trimūrti—with Sūrya, appear blended' (*Architectural Antiquities of Northern Gujrat*, pp. 88-9, pls. LXIX and LXXI, 7)। খাজুরাহোর দুলা দেও শিব-মন্দিরে অনেকাংশে ঐরূপ একটি সূর্যমূর্তি দেখা যায়; ইহার দেহটি বর্মাচ্ছাদিত।[১]

---

১ আমার *Development of Hindu Iconography* গ্রন্থের দ্বিতীয়

স্মার্ত পঞ্চোপাসনার মূলগত বৈশিষ্ট্য যে কিরূপ প্রাচীন উহা এই অধ্যায়ের গোড়ার দিকে বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ এই সমন্বয়াত্মক মনোভাব হিন্দুর চিন্তায় ও কর্মে নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন হিন্দু ধর্মদর্শন ও উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে কোনও বিরোধ ছিল না এ কথা কেহই বলেন না। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় হইতে ত্রয়োদশ অবধি দ্বাদশটি অধ্যায়ে পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনার কালে দেখানো হইয়াছে যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শাখার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে দর্শনতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিশেষ পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্যবোধ সময়ে সময়ে তিক্ততারও সৃষ্টি করিয়াছিল। উপাসকদিগের ধর্মাচরণ সম্পর্কিত ক্রিয়াতেও কখনও কখনও সুস্পষ্ট উপায়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার সাহিত্য ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণ বর্তমান। কিন্তু এই সকল আপাতবিরোধকে খর্ব করিয়া তাঁহাদিগের অন্তর্নিহিত ঐক্য ও সমন্বয় বোধ বহু ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। অনেকের মতে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ ও প্রভুত্ব এই মনোভাবের বর্ধনে ও পুষ্টিসাধনে বিশেষ কার্যকরী হইয়াছিল। দেশের বিভিন্ন অংশের স্মার্ত ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ প্রাণপণ চেষ্টায় প্রাচীন শ্রুতি, স্মৃতি ও দর্শন শাস্ত্র হইতে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া একত্র সন্নিবদ্ধ করেন; হিন্দুর আচার, ব্যবহার, ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বগত জীবন নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করিতে এই সব সঙ্কলনের মূল্য অপরিসীম। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের এ-বিষয়ক একটি উক্তি আমি কিছু পূর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ঐ প্রসঙ্গে নাট্যকার কৃষ্ণ মিশ্র শ্রদ্ধাদেবীকে দিয়া বলাইয়াছেন—

সমানান্বয়জাতানাং পরস্পর বিরোধিনাম্‌।
পরৈঃ প্রত্যভিভূতানাং প্রসূতে সংগতিঃ শ্রিয়ম্‌॥

সংস্করণে দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে, আমি সমন্বয়াত্মক মূর্তি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছি (পৃঃ ৫৪০—৬৩)।

যেন বেদপ্রসূতানাং তেষামবান্তরবিবোধেঽপি বেদসংরক্ষণার্থায় নাস্তিক-পক্ষ প্রতিক্ষেপণায় শাস্ত্রাণাং সাহিত্যমেব। আগমানাং চ তত্ত্বং বিচারয়-তামবিরোধ এব। ইহার তাৎপর্য এই—'একই বংশ (বেদ) হইতে উৎপন্ন পরস্পরবিরোধী (শাস্ত্রগণ) (সাধাবণ শত্রু) অপরেব দ্বারা যখন অভিভূত হয় তখন তাহাদের ঐক্য মঙ্গলদায়ক হয়। বেদ হইতে উৎপন্ন ইহাদেব পরস্পবের মধ্যে বিরোধ অবান্তর, বেদ সংরক্ষণের জন্য এবং নাস্তিক পক্ষকে পরাভূত করিবাব জন্য এই সকল শাস্ত্রের সংহতি হইয়াছে। তত্ত্ববিচাবকারী আগমদিগেব মধ্যে (সত্যই) কোনও বিরোধ নাই' (প্রবোধচন্দ্রোদয়, পঞ্চম অঙ্ক, পৃঃ ১৭৬-৭৭)। কৃষ্ণ মিশ্র একাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার কয়েক শতাব্দী পবে বিজয়নগবের মাধবাচার্য ও সায়ণাচায (খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতক) তাঁহাদের গ্রন্থের উপোদ্ঘাতেও এই প্রকাব মত সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাদেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুসূদন সরস্বতী (খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী) তাঁহার প্রস্থানভেদ নামক স্মার্ত সমন্বয়সূচক গ্রন্থে যে এই সমন্বয়বোধকেই প্রাধান্য দিয়াছিলেন, উহা তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ হইতেই প্রতীয়মান হয়; প্রস্থানভেদেব অর্থ এই—'ঈশ্বরের অভিমুখীন পথেবই বিভিন্নতা'। আমি উপাস্য ও উপাসকদিগের সমন্বয়সূচক কয়েকটি সহজবোধ্য সংস্কৃত শ্লোক দুএকটি তন্ত্র ও পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিব। মুণ্ডমালাতন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে উক্ত আছে—

> রুদ্রস্য চিন্তনাদ্রুদ্রো বিষ্ণুস্যাদ্বিষ্ণুচিন্তনাৎ।
> দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্দুর্গা ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
> যথাশিবস্তথা দুর্গা যা দুর্গা বিষ্ণুরেব সঃ।
> অত্র যঃ কুরুতে ভেদং স নরো মূঢ় দুর্মতিঃ॥
> দেবী বিষ্ণু শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।
> ভেদকৃন্নরকং যাতি রৌরবং নাত্র সংশয়ঃ॥

শ্যামাসপর্যাধৃত শৈবাগমে—

পন্থানো বহবঃ প্রোক্তা মন্ত্রশাস্ত্র মনীষিভিঃ।
স্বগুরোর্মতমাশ্রিত্য শুভং কার্যং ন চান্যথা॥

পঞ্চদেবতানামেকত্বমাহ পদ্মপুরাণে—

সৌরাশ্চ শৈবা গাণেশা বৈষ্ণবাঃ শক্তিপূজকাঃ।
মামেব তে প্রপদ্যন্তে বর্ষান্তঃ সাগরং যথা।
একোঽহং পঞ্চধা যাতঃ ক্রীড়ার্থং নামভিঃ কিল॥

পরিশিষ্ট

সাম্প্রদায়িক তিলকচিহ্নাদি বাহ্য নিদর্শন

বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান ও ক্রমবিকাশের ঠিক কোন পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণের মধ্যে তিলকাদি বাহ্যচিহ্ন ধারণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয় এ সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। এই অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়গুলির বিবর্তনের পূর্বে বেদবিহিত যজ্ঞক্রিয়ায় হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু ও অথর্বন্ পুরোহিতবর্গ, যজ্ঞে সমবেত ঋষি, সদস্য এবং যজমানগণ যে হোমভস্ম ও দেবতাগণকে নিবেদিত ঘৃতাদির অবশিষ্টাংশের সাহায্যে ললাটে তিলকচিহ্ন ধারণ করিতেন ইহা অনুমান করা যায়। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্য হইতে সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। বৈষ্ণব শৈবাদি সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির বিশেষ প্রচলনের পরেও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠান অপ্রচলিত হয় নাই, এবং ইহাতে হোমভস্মের টীকা গ্রহণ প্রশস্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালের সাম্প্রদায়িক তিলকচিহ্নাদি বাহ্য নিদর্শনগুলির বৈশিষ্ট্য উহাতে ছিল না। ইহাও সত্য যে উহাদের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যাদির বিবর্তন সময়সাপেক্ষ ছিল, এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ ও তৎপরবর্তী কালেও কয়েকটি নূতন চিহ্নলাঞ্ছনাদির উদ্ভব হইয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই তিলকচিহ্নাদি বাহ্য নিদর্শনের বিচিত্রতা ও আধিক্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; ইহার মুখ্য কারণ এই যে ইঁহাদের পাঁচটি প্রধান বিভাগ ব্যতীত আরও নানা উপবিভাগ কালক্রমে উদ্ভূত হয়, এবং বিভিন্ন উপবিভাগভুক্ত উপাসকগণ পূর্বপ্রচলিত তিলকচিহ্নাদির আংশিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের দ্বারা নূতন নূতন চিহ্নাদির সৃষ্টি করেন।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকদিগের তিলকাদি বাহ্য নিদর্শন ধারণের সাহিত্যগত প্রমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে উঁহাদিগের ইষ্ট

দেবতাবর্গের বর্ণনা ও বিগ্রহাদির কয়েকটি লাঞ্ছন সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। এখানে আমি বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত এই তিন মুখ্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতাদিগের কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন বা লাঞ্ছনের প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। বৃহৎসংহিতায় লিখিত বিষ্ণুর রূপবর্ণনায় শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি লাঞ্ছন ব্যতীত তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি ধারণের কথা বলা আছে (শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃ কৌস্তুভমণিভূষিতোরস্কঃ ; ৫৭ অধ্যায়, শ্লোক ৩১)। শিবের মনুষ্যমূর্তিতে দণ্ড, শূল, পরশু, মৃগ প্রভৃতি লাঞ্ছনেব অতিরিক্ত ললাটস্থিত ঊর্ধ্বাধরূপে প্রদর্শিত তৃতীয় নয়ন ও শিরস্থ চন্দ্রকলাব বিষয় বর্ণিত আছে (শম্ভোঃ শিরসীন্দুকলেতি ; বৃহৎসংহিতা, দ্বিবেদী সংস্করণ, পৃঃ ৭৮৫)। দেবীব মূর্তিসমূহে শিবেব ন্যায় তৃতীয় নয়ন বর্তমান, এবং এজন্য তাঁহার আর এক নাম ত্রিনয়নী, যেমন শিবেব অন্য নাম ত্রিলোচন। শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূল, শক্তি (বর্শাজাতীয় অস্ত্র) বিষ্ণু, শিব, শক্তি আদি দেবতাবিগ্রহেব হস্তে দেওয়া হইত, এবং বক্ষে, ললাটে বা শিরে উপরোক্ত চিহ্নসকল চিত্রিত থাকিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভাবতে বিষ্ণু ও শিব বিগ্রহের ললাটদেশে 'নামম্' চিহ্ন প্রদর্শিত হইত। ফরাসী পণ্ডিত Jouveau-Dubreuil তাঁহার *Archaelogie du sud de l' Inde* নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন যে আধুনিক কালে দক্ষিণ ভারতীয় বিষ্ণুবিগ্রহগুলিব ললাটদেশ তিরুনামম্ (শ্রীনামম্) চিহ্ন দ্বাবা শোভিত থাকে। ইহা পবিত্র তীর্থ তিরুপতি হইতে সংগৃহীত এক জাতীয় 'খড়ি' এবং চূর্ণ মিশ্রিত হলুদ রংয়ের সাহায্যে অঙ্কিত হয়। এই চিহ্ন ঊর্ধ্বাধরূপে দর্শিত তিনটি রেখার সমন্বয়, পার্শ্বের দুই রেখা প্রশস্ততর এবং শ্বেতাভ ও অধোভাগে সম্মিলিত, মধ্যস্থিত বেখাটি অপেক্ষাকৃত ক্ষীণকায় এবং গৈরিকবর্ণ (পরে বলা হইবে যে ইহা শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্যতম তিলকচিহ্ন ; চিত্র ১, সংখ্যা ২)। পার্শ্বস্থ রেখা দুটির নাম গোপীচন্দন এবং মধ্যস্থিত রেখার

নাম তিরুচূর্ণম্ (সমগ্র চিহ্নটি বৈষ্ণব সাহিত্যাদিতে বর্ণিত উর্ধ্বপুণ্ড্রের অন্যতম রূপ)। ফরাসী পণ্ডিত আরও বলিয়াছেন যে প্রাচীন চালুক্য, পল্লব ও রাষ্ট্রকূট যুগের বিষ্ণুমূর্তিতে এই নামম্ চিহ্ন দেখা যায় না, এবং খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বেকার মূর্তিগুলিও নামম্ চিহ্নবিহীন। তাঁহার মতে বিগ্রহে এইরূপ চিহ্ন বিজয়নগর রাজাদিগের সময়েই প্রথম প্রবর্তিত হয় (Vol. II, P. 62)। কিন্তু এই মত শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী মহাশয় সমর্থন করেন নাই। তিনি পরাক্রান্ত চোল সম্রাট্ রাজরাজের (৯৮৫-১০১৪ খৃষ্টাব্দ) সমকালীন একটি লেখ হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বিষ্ণুবিগ্রহের ললাটে সুবর্ণনির্মিত নামম্ চিহ্ন কখনও কখনও উৎকীর্ণ থাকিত (*The Colas*, Second Edition, pp. 648, 659)। শিববিগ্রহের ললাট বা শিবলিঙ্গের পূজাভাগের উপরদিকে তিনটি শ্বেতবর্ণ তির্যক্‌বিস্তৃত রেখা অঙ্কিত করার প্রথা এখনও দেখা যায়। এই চিহ্নের নাম ত্রিপুণ্ড্র, এবং শিবোপাসকগণের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুণ্ড্র ও উর্ধ্বপুণ্ড্রের বিষয় একটু পরে সবিস্তারে আলোচিত হইবে। দেবীমূর্তির ললাটমধ্যস্থ ত্রিনয়নের নিম্নে রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন অঙ্কিত করার প্রথা অদ্যাপি বর্তমান। এই চিহ্ন শক্তি-সাধকের অন্যতম লাঞ্ছন। ত্রিপুণ্ড্র ও বিন্দুচিহ্নাদি দেবতা-বিগ্রহাবলীতে ঠিক কোন সময়ে প্রথম ব্যবহৃত হয় সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হওয়া যায় না।

গোপাল ভট্ট রচিত হরিভক্তিবিলাসে দ্বাদশ তিলক বিধি ও উর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ সম্বন্ধে পূর্ববর্তী সাহিত্য হইতে বহু উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে প্রাচীনতম উক্তি হিরণ্যকেশী শাখা ভুক্ত যজুর্বেদ হইতে উদ্ধৃত, এবং ইহা এইরূপ—হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি, স পুণ্যবান ; মধ্যে ছিদ্রমূর্ধ্বপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি। ইহার অর্থ—'হরির পদচিহ্ন যিনি নিজের (শরীরে) ধারণ করেন তিনি অপরের প্রিয় ও পুণ্যবান হন ; মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট উর্ধ্বপুণ্ড্র যিনি ধারণ করেন, তাঁহার মোক্ষলাভ হয়।' এই

উদ্ধৃতি ঠিক সংহিতাযুগের শ্রুতি পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় আছে, কারণ ইহা বৈষ্ণবধর্মের পূর্ণ সম্প্রসারণের সমকালীন বলিয়া মনে হয়, এবং এই সম্যক্ সম্প্রসারণ যে প্রাক্গুপ্ত যুগে হয় নাই ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। গোপাল ভট্ট ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের গ্রন্থাদি হইতে যে সব উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন উহার তুএকটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দর্পণ বা জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিয়া দশ, নয় বা অষ্টাঙ্গুল প্রমাণ যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও তৃতীয় স্তরের উর্ধ্বপুণ্ড্র অঙ্কনের কথা বলা আছে; এই চিহ্ন অঙ্গুলির অগ্রভাগের সাহায্যে অঙ্কিত করা হয়, কিন্তু ইহাতে নখস্পর্শ চলে না (বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ। উর্ধ্বপুণ্ড্রং মহাভাগ স যাতি পরমাং গতিম্॥ দশাঙ্গুলপ্রমাণন্ত উত্তমোত্তমমুচ্যতে। নবাঙ্গুলং মধ্যমং স্যাদষ্টাঙ্গুলমতঃপরম্। এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্তু কারয়েন্ন নখৈঃ স্পৃশেৎ)। পদ্ম পুরাণ উত্তরখণ্ড হইতে তিনি যে শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন সেগুলি হইতে এ সম্বন্ধে আরও অধিক তথ্য জানা যায়। উদ্ধৃতিটি এইরূপ—

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতিঃ॥
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং তথা।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভম্।
বর্তুলং তির্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।
বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতম্॥
অশুভং রুক্ষমাসক্তং তথা নাঙ্গুলিকল্পিতম্।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকম্॥
আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্।
নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষ্যতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥

সংক্ষেপে ইহার ভাবার্থ এই—'একান্তধর্মা (বৈষ্ণবধর্ম) বলম্বী মহাশয়গণ অন্তরালসহিত হরিপদাকৃতি পুণ্ড্র (অঙ্কন) করিয়া থাকেন। শ্যাম, রক্ত, পীত, শ্বেত ইত্যাদি বর্ণানুসারে এই চিহ্ন যথাক্রমে শান্তি, বশ্যতা, মঙ্গল ও মোক্ষবিধায়ক। বর্তুলাকার তির্যক্‌বিস্তৃত, অন্তরাল-রহিত, হ্রস্ব, অতি দীর্ঘ, বক্র, কুৎসিৎদর্শন, উপরিভাগে মিলিত ও নিম্নাংশে বিচ্ছিন্ন, স্থানচ্যুত, অশুভ্র, রুক্ষ ও আসক্ত (রেখাগুলি পরস্পর মিলিত), অঙ্গুলি সাহায্য বিনা অঙ্কিত, বিগন্ধ ও অপসব্য (দক্ষিণ হইতে বাম দিক বিস্তারী ?) পুণ্ড্ররেখাগুলি অনর্থকর। নাসিকামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটদেশের শেষ সীমা পর্যন্ত মৃত্তিকা (গঙ্গামৃত্তিকা, গোপীচন্দনাদি) দ্বারা ইহা অঙ্কিত করিতে হইবে। নাসিকার তিনভাগ (?) নাসামূল (হইতে পুণ্ড্ররেখা ঊর্ধ্বগামী ?) এবং ভ্রূদ্বয়ের মূল (সংযোগস্থল হইতে) অন্তরাল রচনা করিবে।' দুই পার্শ্ববর্তী ঊর্ধ্বগামী রেখার মধ্যে ব্যবধান রচনা করা বিশেষরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পুরাণকার বলিতেছেন, 'যে দ্বিজাধম ঊর্ধ্বপুণ্ড্র অচ্ছিদ্র করেন তাঁহাদের ললাটে কুকুরের পদচিহ্ন থাকে' (অচ্ছিদ্রমূর্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যে কুর্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনোপাদ ন সংশয়ঃ)। নাসাদি কেশ পর্যন্ত দীর্ঘায়ত, মধ্যে ছিদ্রযুক্ত, সুন্দরভাবে চিত্রিত ঊর্ধ্বপুণ্ড্রকে হরিমন্দির বলা হয় ; বামভাগস্থ রেখাপার্শ্বে ব্রহ্মার এবং দক্ষিণদিকস্থ রেখাপার্শ্বে সদাশিবের স্থান এবং রেখাদ্বয়ের মধ্যভাগে বিষ্ণুর অবস্থান হেতু এই অন্তরাল লেপন করিতে নাই (নাসাদিকেশপর্যন্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুক্তং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম॥ বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াত্তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ)।[১]

১ হরিভক্তিবিলাস (গৌড়ীয় মঠের সংস্করণ) বৈষ্ণবালঙ্কার নামক চতুর্থ বিলাস্ হইতে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঊর্ধ্বপুণ্ড্রের উপরিলিখিত বর্ণনার সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অন্যতম তিলকচিহ্ন (এই গ্রন্থের চতুর্থ চিত্রের ১৮ সংখ্যক তিলক) সম্পূর্ণ মিলিয়া যায়। শ্রীবৈষ্ণবাদি সম্প্রদায়ের যে সকল তিলক এই গ্রন্থের তৃতীয় ও চতুর্থ চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে সেগুলি ঊর্ধ্বপুণ্ড্র জাতীয় হইলেও পুরাণোক্ত বর্ণনার সহিত অনেকাংশে মিলে না; ঐগুলি অধিকতর বৈচিত্র্যপূর্ণ। হরতত্ত্বদীধিতি নামক গ্রন্থে স্বর্গীয় হরমোহন ঠাকুর মহাশয়ও বিভিন্ন তন্ত্র পুরাণাদি হইতে এ বিষয়ক অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত করা হইল না। আমি উহার একটি উদ্ধৃতির প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছেন যে বৈষ্ণবেরা নিজ নিজ জাতিসম্মত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র ধারণ করিয়া দেহের বিভিন্ন স্থানে শঙ্খ চক্র গদাদির চিহ্ন ধারণও করিবেন। তিনি রাঘব ভট্টের নিম্নলিখিত উক্তিটি প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ললাটে তু গদা কার্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরং তথা।
নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে॥
শঙ্খচক্রাঙ্কিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি।
প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য নারদ॥[১]

(বিষ্ণুর খড়্গের নাম নন্দক)

ত্রিপুণ্ড্র ধারণ শৈব উপাসকের অবশ্য কর্তব্য। নাগোজী ভট্ট সূতসংহিতা হইতে এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—শিবাগমে দীক্ষিতৈস্তু ধার্যং তির্যক্ ত্রিপুণ্ড্রকম্, 'যাঁহারা শিবাগমে দীক্ষিত অর্থাৎ শৈব তাঁহারা (ললাটে) সমান্তরালভাবে তিনটি রেখা (তির্যক্ ত্রিপুণ্ড্র) ধারণ করিবেন'। এই রেখাগুলি যে ভস্ম সাহায্যে অঙ্কিত হইত উহার অন্যতম প্রাচীন প্রমাণ আমরা বাণভট্টের কাদম্বরী হইতে পাই। বাণ

১ হরতত্ত্বদীধিতিঃ (৺সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদিত সংস্করণ), পৃঃ ৯০।

লোপামুদ্রার পুত্র শৈব তাপস দৃঢ়দস্যুর নিম্নলিখিত বর্ণনা দিতেছেন—তৎপুত্রেণ চ গৃহীত ব্রতেনাষাঢ়িনা পবিত্র ভস্মবিরচিত ত্রিপুণ্ড্রকাভরণেন কুশচীবরবাসসা মৌঞ্জমেখলাকলিত মধ্যেন ('দৃঢ়দস্যুর হস্তে পলাশদণ্ড, ললাটে পবিত্র ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র, তাঁহার কুশময় কৌপীন এবং মুঞ্জ-নির্মিত মেখলা…')। জাবালি ঋষির বর্ণনাতেও গ্রন্থকার এই ভস্মরচিত ত্রিপুণ্ড্রের কথা বলিয়াছেন—উপরচিতভস্মত্রিপুণ্ড্রকেণ তির্যক্‌-প্রবৃত্ত-গঙ্গাস্রোতস্ত্রয়েন ('জাবালি ললাটে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন; তাহাতে বোধ হইতেছিল যেন হিমালয়ের কোনও প্রস্তরফলকে গঙ্গার তিনটি স্রোত তির্যক্‌ভাবে প্রবাহিত হইতেছে')।[১] হরমোহন ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পূর্বোক্ত গ্রন্থে পরবর্তী কালের তান্ত্রিক সাহিত্য হইতে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। আমি এখানে দুএকটি উদ্ধৃতির কথাই বলিব। শ্যামার্চন-চন্দ্রিকাধৃত বৃহদ্ধারাবলীতে ত্রিপুণ্ড্রের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়—বক্রা ললাটগা খণ্ডচন্দ্ররেখা ত্রিপুণ্ড্রকম্‌; ইহাতে ললাটস্থিত ত্রিপুণ্ড্র-রেখা ঈষৎ বক্র ও খণ্ডচন্দ্রের আকারে অঙ্কিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই গ্রন্থের পঞ্চম চিত্রের দুএকটি শৈব ত্রিপুণ্ড্রের উপরিলিখিত বর্ণনার সহিত আংশিক মিল দেখা যায়। শাশ্বততন্ত্রে ত্রিপুণ্ড্রান্তর্গত তিনটি রেখা যে ত্রিগুণাত্মক ইহা বলা হইয়াছে। তন্ত্রকার বলিতেছেন—

অধো রেখা তামসী স্যান্মধ্যরেখা চ রাজসী।
ঊর্ধ্বা তু সাত্ত্বিকী প্রোক্তা বামাংশাদ্দক্ষিণং গতা॥

---

১ বাণভট্টরচিত কাদম্বরী (হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত সংস্করণ), পৃঃ ৭৭ ও ১৬৩। শুষ্কগোময় (করীষ—ঘুঁটে) ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র অঙ্কন প্রথা প্রচলিত আছে। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে করীষভস্ম, হোমভস্ম, বিষ্ণুযাগ হইতে প্রাপ্ত ভস্ম, শিবহোম হইতে সংগৃহীত ভস্ম, স্বীয় দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হোমসঞ্জাত ভস্ম উত্তরোত্তর অধিক প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

'সর্বনিম্ন রেখা তামসী, মধ্যরেখা রাজসী ও ঊর্ধ্বরেখা সাত্ত্বিকী; (রেখাগুলি) বাম হইতে দক্ষিণাভিমুখী (দক্ষিণাবর্ত)'। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রের পঞ্চম পটলে ত্রিপুণ্ড্র ধারণের ফল সম্বন্ধে যাহা উক্ত আছে, উহার ভাবার্থ এই—'ইহলোকে গঙ্গাদি যে সব নদী তীর্থ আছে, যাঁহার ললাটে ত্রিপুণ্ড্র তাঁহার সেই সব তীর্থে স্নান করার ফল হয়। সাত কোটি মহামন্ত্র ও সাত কোটি উপমন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয় উহা ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ করিলে হয়। শ্রীবিষ্ণুর ও শিবের কোটি মন্ত্র জপ করিলে যে ফল হয় উহা ত্রিপুণ্ড্র ধারণে হয়।' ত্রিপুণ্ড্র মাত্র শিবোপাসকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত তিলকচিহ্ন ছিল না, এবং ক্রমশঃ অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসকগণও ত্রিপুণ্ড্রজাতীয় তিলক ধারণ করিতে থাকেন। শ্যামাপ্রদীপধৃত শাশ্বততন্ত্রের একটি উক্তি ইহা সমর্থন করে। তন্ত্রকার বলিতেছেন—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্বাণো যাত্যধোগতিম্॥

'বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত ও সৌর, ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ, ত্রিপুণ্ড্র (ধারণ) না করিয়া পূজা করিবেন, তাঁহার অধঃপতন হইবে।' হরতত্ত্বদীধিতিকার বলিয়াছেন যে এই শ্লোকস্থিত বা শব্দের দ্বারা অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে গাণপত্য সম্প্রদায়ের কথাও বুঝাইতেছে (অত্র অন্তঃস্থ বাশব্দস্যানুক্তসমুচ্চয়ার্থত্বেন গাণপত্যোঽপি,—হরতত্ত্বদীধিতিঃ, পৃঃ ৮৭)। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রেও প্রায় অনুরূপ কথা বলা আছে; তন্ত্রকার বলিয়াছেন, 'শৈব, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ শক্তিরূপা ধেনুর গোময় ভস্মের দ্বারা ত্রিপুণ্ড রচনা করিবেন'।[১] কিন্তু শিবার্চনচন্দ্রিকাধৃত যামলে

---

১ কিন্তু গোপাল ভট্ট অন্য শাস্ত্র প্রমাণের সাহায্যে বৈষ্ণবদিগের ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্র ভিন্ন ত্রিপুণ্ড্র ধারণ যে নিষিদ্ধ ও দোষাবহ ইহা বলিয়াছেন (ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ ঊর্ধ্বপুণ্ড্রে ন কুর্বীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥) হরিভক্তিবিলাস, পৃঃ ১৮৭-৮৯।

বর্ণভেদানুযায়ী বিভিন্ন তিলকধারণের কথা বলা হইয়াছে ; 'ব্রাহ্মণের ঊর্ধ্বপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয়ের ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্যের অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক এবং শূদ্রের বর্তুলাকৃতি তিলক গ্রহণ বিধিসঙ্গত (ব্রাহ্মণস্যোর্ধ্বপুণ্ড্রং স্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকম্। বৈশ্যপুণ্ড্রমর্ধচন্দ্রং শূদ্রানাং বর্তুলাকৃতি ॥—হরতত্ত্বদীধিতিঃ, পৃঃ ৮৭)। এই গ্রন্থের চিত্র কয়েকটিতে বিভিন্ন আকারের যে সকল তিলক অঙ্কিত আছে উহাদিগের মধ্যে অর্ধচন্দ্রাকৃতি ও বর্তুলাকৃতি তিলকও দেখা যায় ; সেগুলি যামলের প্রমাণানুসারে বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় শিবোপাসকদিগকে বুঝাইতে পারে। প্রসঙ্গতঃ আমি চর্যাগীতি-কোষের একটি পদের প্রতি আমার পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। ইহা এই—জাহের বাণ চিহ্ন রূব ন জানী। সো কইসে আগম বেএঁ বখানী ॥ পদকর্তা লুইপাদ বলিতেছেন যে 'যাঁহার (পরমতত্ত্বের) বর্ণ-চিহ্ন ও রূপ অজ্ঞাত, তাঁহার কথা কিরূপে বেদ ও আগম শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইতে পারে'। এখানে এই 'বাণচিহ্ন' কথাটি সাম্প্রদায়িক তিলকচিহ্ন বুঝায় বলিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত। তিনি এই পদটির প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। দক্ষিণ ভারতে যেমন তিলকাদি চিহ্ন তিরুনামম্ বলিয়া বর্ণিত হইত, উত্তর ভারতে বোধ হয় মধ্যযুগে ও পরে এগুলির আখ্যা ছিল 'বাণ-চিহ্ন' (বর্ণচিহ্ন)।

গ্রন্থপঞ্জী

ক—সাহিত্য—মূলগ্রন্থাদি

ক (১)—বৈদিক :

ঋগ্বেদ (মূল ও বঙ্গানুবাদ—রমেশচন্দ্র সম্পাদিত সংস্করণ) ; যজুর্বেদ (শুক্ল ও কৃষ্ণ—বাজসনেয়ী ও মৈত্রায়নীয় সংহিতা) ; অথর্ববেদ।

শতপথ ব্রাহ্মণ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ; তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

ছান্দোগ্য উপনিষদ; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ উপনিষদ; কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদ; শ্বেতাশ্বতর, কাঠক, কেন, মুণ্ডক, মহানারায়ণ, মৈত্রায়নীয় ও অথর্বশিরস্ উপনিষদ।

আপস্তম্ব, আশ্বলায়ন, খাদির, হিরণ্যকেশিন গৃহ্যসূত্রাদি।

(J. Muir—Original Sanskrit Texts, Vols. IV & V)

ক (২)—মহাকাব্য ও পুরাণাদি সংক্রান্ত :

মহাভারত (বঙ্গবাসী ও পুনা সংস্করণ); রামায়ণ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সংস্করণ)।

অগ্নি, কালিকা, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ভবিষ্য, ভাগবত, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, বায়ু, বরাহ পুরাণ (বঙ্গবাসী ও আনন্দাশ্রম সিরিজ সংস্করণ)।

ক (৩)—তান্ত্রিক :

অহির্বুধ্ন্য, সাত্বত, ঈশ্বর, পাদ্মতন্ত্র প্রভৃতি পাঞ্চরাত্র সংহিতানিচয়।

অংশুমদ্ভেদাগম, সুপ্রভেদাগম প্রভৃতি কয়েকটি শৈবাগম। তন্ত্রসার (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ,—রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত); মৎস্য-সূক্ত (হলায়ুধ মিশ্র,—এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি); মন্ত্রমহোদধি (মহীধর—ঐ); সৌন্দর্যলহরী (লক্ষ্মীধর কৃত ভাষ্য সমেত--Mysore Sanskrit Series); শারদাতিলক (লক্ষণদেশিক—জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত সংস্করণ); পাশুপতসূত্র (রাশীকর কৌণ্ডিন্যভাষ্য সমেত, ত্রিবান্দ্রাম সংস্কৃত গ্রন্থমালা)।

ক (৪)—প্রাচীন পুঁথি সংক্রান্ত :

Hara Prasad Sastri—Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Manuscripts belonging to the Durbar Library, Nepal (Asiatic Society); Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the collection of the Royal Asiatic Society, Bengal, Vol. IX, edited by Chintaharan Chakravarty.

ক (৫)—জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক :

অষ্টাধ্যায়ী (পাণিনি—শ্রীশচন্দ্র বসু সম্পাদিত ইংরাজী অনুবাদসহ সংস্করণ), মহাভাষ্য (পতঞ্জলি,—Kielhorn সম্পাদিত সংস্করণ); বৃহৎসংহিতা (বরাহমিহির,—সুধাকর দ্বিবেদী সম্পাদিত সংস্করণ); হরিভক্তিবিলাস (গোপাল ভট্ট,—পুরীদাস সম্পাদিত সংস্করণ); হর্ষচরিত (বাণভট্ট, পি, ভি, কনে সম্পাদিত সংস্করণ); কাদম্বরী (বাণভট্ট,—হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ সম্পাদিত সংস্করণ); শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (W. D. P. Hill সম্পাদিত সংস্করণ); শ্রীশ্রীচণ্ডী (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত সংস্করণ); মনুস্মৃতি (গঙ্গানাথ ঝা সম্পাদিত সংস্করণ, Bibliotheca Indica Series); যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (Mysore Sanskrit Series); শঙ্করবিজয় (আনন্দগিরি বা অনন্তানন্দ গিরি বিরচিত,—জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ, Bibliotheca Indica Series-এ প্রকাশিত); শঙ্করদিগ্বিজয় কাব্য (মাধব বিদ্যারণ্য বিরচিত ধনপতি কৃত ডিণ্ডিমাখ্য ভাষ্যসহ,—আনন্দাশ্রম সিরিজ, পুনা); সর্বদর্শনসংগ্রহ (মাধবাচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত সংস্করণ, Bibliotheca Indica Series; Cowell's English Tanslation); প্রবোধচন্দ্রোদয় (কৃষ্ণমিশ্র,—নির্ণয়-সাগর প্রেস, বোম্বাই); শিবসূত্র বিমর্ষিণী (ক্ষেমরাজ, Kashmir Sanskrit Text Series); অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (রঘুনন্দন, জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত); সূর্যশতক (ময়ূর;—Quackenbos: The Sanskrit Poems of Mayūra, Text and Translation); হরতত্ত্বদীধিতিঃ (হরকুমার ঠাকুর, সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর সম্পাদিত সংস্করণ)।

ক (৬)—কোষগ্রন্থ :

Macdonell and Keith—Vedic Index ;
শব্দকল্পদ্রুম (রাধাকান্ত দেব) ;
V. V. Apte—Sanskrit-English Dictionary ;
Monier Williams—Sanskrit-English Dictionary.

ক (৭)—বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য :

মজ্ঝিম নিকায় ; নিদ্দেস ; মহামায়ূরী ; সাধনমালা (Gaekwad Oriental Series) ; চর্যাগীতিকোষ (বিশ্বভারতী)। জৈন ভগবতী সূত্র।

খ—মূলগ্রন্থ—প্রত্নতত্ত্ব সংক্রান্ত :

খ (১)—V. A. Smith—Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I ;

J. Allan—Catalogue of Gupta Coins in the British Museum. A. S. Altekar—The Gupta Gold Coins in the Bayana Hoard.

খ (২)—E. Hultzsch—Corpus Inscriptionum Indicarum,(*C.I.I.*) Vol. I—Aśokan Inscriptions ;

Sten Konow—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. II (Kharoshṭhi Inscriptions) ;

J. F. Fleet—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III (Gupta Inscriptions) ;
Epigraphia Indica.

খ (৩)—N. K. Bhattasali—Catalogue of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum ;

T. A. G. Rao—Elements of Hindu Iconography, Vols. I & II ;

J. N. Banerjea—Development of Hindu Iconography (Second Edition) ;

B. T. Bhattacharyya—Buddhist Iconography (Ist & 2nd Editions) ;

Percy Brown—Indian Architecture, Vol. I (Hindu and Buddhist).

খ (৪)—Annual Reports of the Archaeological Survey of India.

গ—প্রাচীন বৈদেশিক লেখকদিগের ভারতবর্ষ বিষয়ক গ্রন্থ (ইংরাজী অনুবাদ) ঃ

McCrindle—Ancient India as described by Megasthenes, Arrian and others ;

„ „ —Ptolemy, edited by S. N. Majumdar Sastri ;

W. W. Schoff—Periplus of the Erythrean Sea ;

Thomas Watters—On Yuan Chwang, Vols. I and II ;

C. Edward Sachau—Alberuni's India.

G. Rawlinson—Herodotus (Dent Edition).

ঘ—ভারততত্ত্ব বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ ঃ

ঘ (১) R. G. Bhandarkar—Vaiṣṇavism, Śaivism and Minor Religious Systems (Strasburg Edition) ;

H. C. Raychaudhuri—Materials for the Study of the Early History of the Vaishṇava Sect (Second Edition) ;

Schraeder—Introduction to the Pāñcharātra Ahirbudhnya Saṃhitā ;

C. Eliot—Hinduism and Buddhism, Vol. II ;

J. Marshall—Mohenjo-daro and Indus Civilisation ;

E. Mackay—Early Indus Civilisation (2nd edition) ;

M. S. Vats—Excavations at Harappa ;

A. A. Macdonell—Vedic Mythology ;

E. W. Hopkins—Epic Mythology ;

Farquhar—Outline of Religious Literature of India ;

Monier Williams—Religious Thought and Life in India ;

Hooper—Hymns of the Ālvārs ;

Kingsbury and Phillips—Hymns of the Tamil Saivaite Saints ;
R. P. Chanda—Indo-Aryan Races ;
S. N. Das Gupta—History of Indian Philosophy, Vol V ;
J. C. Chatterjee—Kashmir Saivism ;
Arthur Avalon (John Woodroffe)—Shakti and Shākta ;
K. A. Nilakanta Sastri—The Colas (2nd Edition) ;
H. H. Wilson—Religious Sects of the Hindus ;
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—শ্রীরামানুজ চরিত ;
বিমানবিহারী মজুমদার—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উপাদান (২য় সংস্করণ) ;
অক্ষয়কুমার দত্ত—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় (দ্বিতীয় সংস্করণ) ;
শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ।

ঘ (২)—ভারততত্ত্ববিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থমালা :

History of Bengal, Vol. I (Dacca University) ;
Comprehensive History of India, Vol II. (Indian History Congress Association) ;
History and Culture of Indian People, Vols. II—V (Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay).

ঙ—ভারততত্ত্বমূলক মৌলিক প্রবন্ধাদিযুক্ত সাময়িকী ঃ

Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute ;
Indian Antiquary ;
Indian Historical Quarterly (I. H. Q.) ;
Journal of the Asiatic Society of Bengal ;
Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal ;
Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland ;
Journal Asiatique ;
Revue les Arts Asiatiques (Musee Guimet, Paris) ;
Journal of the Indian Society of Oriental Art.

শুদ্ধি ও সংযোজনীপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫	১৯ ও ২১	নৃত্য	নৃত্য
২৭	২০	শঙ্করদিগ্বিজয়	শঙ্করবিজয় (আনন্দগিরি)
৩১	২৪	অনন্তান্দগিরি	অনন্তানন্দ গিরি
৯৩	২	তিরুজ্ঞানসম্বন্ধরের	তিরুজ্ঞানসম্বন্ধের
১০২, ১০৬		টেঁনকলই	তেনকলই
১৫৪	১৮	পাশুমত	পাশুপত
১৬০	১৩	পরমাত্মাকে	পরমাত্মাতে
১৬৪-৬৫	বাণভট্ট কাদম্বরীতে যে রক্তবস্ত্র-পরিহিত সন্ন্যাসীদিগের কথা বলিয়াছেন, উঁহারা বৌদ্ধও হইতে পারেন। ক্ষীরস্বামী বৌদ্ধজ্ঞাপক কয়েকটি প্রতিশব্দ এই ভাবে দিয়াছেন :—রক্তাম্বরঃ ভদন্তশ্চ শাক্যঃ শ্রমণবন্দকৌ। তবে উগ্রতান্ত্রিক শৈব পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরাও যে রক্তবসন পরিধান করিতেন, উহার সাহিত্যগত প্রমাণ আছে।		
১৬৫	৩৮	বন্ন	বন্ন্
১৯৪	২৩	ছয়টি	আটটি
২২০	১৬	শারদীয়া	শারদীয়
২৪৫	৮	সারুড়া	সারূঢ়া
২৫২	৮	গোপেন্দ্রস্যানুজ্যা	গোপেন্দ্রস্যানুজ্ঞা
„	৯	আলাচনা	আলোচনা
২৫৪	১২	উৎকল	উৎপল
২৫৯	২১-২		

চীন চীনদেশই, কিন্তু মহাচীন বলিতেও চীনদেশকে বুঝাইতে পারে; স্বর্গীয় ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী মহাশয়ের মতে মহাচীন সম্ভবতঃ মোঙ্গোলিয়াকে বুঝাইত (*I. H. Q.*, Vol. VII, p. 4)।

২৬৪-৬৫ ডাকিনী, শাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীগণের প্রকৃত পরিচয় সম্বন্ধে বিভিন্ন মত বর্তমান। ডক্টর বাগ্‌চী অনুমান করিয়াছিলেন যে লাকিনী, ডাকিনী, শাকিনী নামগুলি পশ্চিম তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন জাতিভুক্ত ইন্দ্রজাল-বিদ্যা-পারদর্শিনী বিশেষ নারীমণ্ডলীকে বুঝাইত (*op. cit.*, p. 8)। অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ও প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি ডাকিনী জ্ঞানী অর্থে ব্যবহৃত তিব্বতী 'ডাক' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন (ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃঃ ১৩)। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর গাঙ্গধার শিলালিপিতে প্রাপ্ত ডাকিনী শব্দটি হইতে মনে হয় উক্ত মতগুলি আংশিকভাবে ভ্রান্ত। ইহা সম্পূর্ণ ভারতীয়, এবং 'ডাক' বা 'ডাকা' এইরূপ দেশী শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন। শিলালেখটিতেও ডাকিনীদিগের চীৎকার-প্রবণতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। শাকিনী, লাকিনী প্রভৃতি শব্দের যে ব্যাখ্যা বাগ্‌চী মহাশয় দিয়াছেন উহা আংশিক সত্য হইতে পারে।

২৭৮ ১২-৯

মহীধরের আবির্ভাবকাল ও আদি বাসস্থান সম্বন্ধে কোনও অনিশ্চয়তা নাই। Aufrechtএর *Catalogus Catalogorum*এ তাঁহার সম্বন্ধে বলা আছে যে তিনি রামভক্তের পুত্র ও রত্নেশ্বরের শিষ্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত পি, কে. গোডে মহাশয়, 'The Chronology of the Works of Mahidhara' নামক একটি প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছেন যে তাঁহার আদি বাসস্থান ছিল অহিচ্ছত্রে (এখনকার আওনলা বা রামনগর)। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রত্নাকর নামক জনৈক বৎসগোত্রীয় ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র ছিলেন রামদাস বা রামভক্ত (অন্য নাম ফনুভট্ট); ইনিই ছিলেন মহীধরের পিতা। মহীধর ১৫৪০ হইতে ১৬১০

খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ; তিনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে মন্ত্রমহোদধিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাকে তিনি 'একগ্রন্থাস্থিতং সর্বতন্ত্রাণাং সারং' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণ পিতাকে এই মহাগ্রন্থ রচনায় প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন (*Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute,* Vol. XXI, 1939-40, pp. 248-61)।

উপরিলিখিত তথ্যাদি হইতে জানা গেল যে মহীধর বাঙ্গালী ছিলেন না। মৎস্যসূক্তকার হলায়ুধ মিশ্রের কিঞ্চিন্ন্যূন চারি শতাব্দী পরে তিনি বর্তমান ছিলেন, এবং এজন্য তাঁহার গ্রন্থে অধিক সংখ্যক মহাবিদ্যার নামোল্লেখ কিছুই আশ্চর্য নহে। তবে ইহাও লক্ষ্য করার বিষয় যে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের প্রায় সমকালীন হইয়াও তিনি দশটি মহাবিদ্যার নাম করেন নাই। তিনি বাঙ্গালী ছিলেন না, সুতরাং বাংলাদেশের এই তান্ত্রিক ধর্মাচার সম্বন্ধে বিশদ কিছু না বলা তাঁহার পক্ষে অস্বাভাবিক নহে।

২৮০ ১৪-৫

মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যেও শরৎকালে দেবীপূজার কথা আছে। শ্রীশ্রীচণ্ডীর শেষ অধ্যায়ে এই শ্লোকটি পাওয়া যায় :

শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। (১২, ১২)

কিন্তু এই শ্লোকটি মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণে আদিতে ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। দেবীভাগবতে (ইহা মূল মার্কণ্ডেয় পুরাণের অনেক পরে রচিত) বাসন্তী ও শারদীয়া উভয়প্রকার দেবীপূজার কথা পাওয়া যায়। কালিকা পুরাণের ষষ্টিতম অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোকেও (১—৩২) শরৎকালে রাবণবধের জন্য রাম কর্তৃক দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের কথা বলা

আছে। সুতরাং আমি গ্রন্থের ২৮০-৮১ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ক যে মন্তব্য করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ সংশোধন আবশ্যক। কৃত্তিবাস মনে হয় কালিকা' পুরাণের এই অধ্যায়ের উক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীর অকালবোধনের কথা তাঁহার রামায়ণে লিখিয়াছিলেন। পুরাণের পঞ্চষষ্টিতম ও ষষ্টিতম অধ্যায়ের দুইটি উক্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য হইতে অনুমিত হয় যে শারদীয়া পূজার বিধিবিধান-সম্বলিত ষষ্টিতম অধ্যায় কিঞ্চিৎ পরবর্তীকালে পুরাণটিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই অনুমান উক্ত অধ্যায়ের ৩৯-৪৩ শ্লোকগুলি হইতে সমর্থিত হয়:—

ইতি বৃত্তং পুরাকল্পে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
প্রাদুর্ভূতা দশভুজা দেবী দেবহিতায় বৈ॥
নৃণাং ত্রেতাযুগস্যাদৌ জগতাং হিতকাম্যয়া।
পুরাকল্পে যথা বৃত্তং প্রতিকল্পং তথা তথা॥
প্রবর্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ।
প্রতিকল্পং ভবেদ্রামো রাবণশ্চাপি রাক্ষসঃ।
তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথা ত্রিদশসঙ্গমঃ॥
এবং রাম সহস্রাণি রাবণানাং সহস্রশঃ।
ভবিতব্যানি ভূতানি তথা দেবী প্রবর্ততে॥

২৯৫ ৮-১১

ঋগ্বেদের মার্তাণ্ড সম্বন্ধীয় এই উক্তিই মনে হয় মহাভারতে বর্ণিত গঙ্গা কর্তৃক শান্তনুর ঔরসজাত তাঁহার অষ্টম পুত্র ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গপ্রয়াণ কাহিনীর উৎস।

৩০২	১২	সর্বনাগ	শর্বনাগ
৩১৯	৪	শাম্ব	সাম্ব
৩৩০	৪	উড়িষ্যা	অন্ধ্র
৩৩৪	১৯	বিষ্ণুবর্মন	বিশ্ববর্মন

চিত্র পরিচিতি

চিত্র নং ১

(1) ভস্ম বা বিভূতি রচিত ত্রিপুণ্ড্র; ইহা স্মার্ত শঙ্করমতাবলম্বিগণ ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন।

(2) ত্রিরেখাসম্বলিত চন্দনতিলক; ইহা অনেক স্মার্ত আহারের পূর্বে ললাটে অঙ্কিত করেন। ভস্ম বা বিভূতির দ্বারা চিত্রিত রেখাগুলি অপেক্ষা ইহা অধিকতর স্থায়ী।

(3) মধ্যে 'অক্ষত চিহ্ন' সহ ত্রিরেখাযুক্ত চন্দনতিলক; ইহা যুগপৎ শিব ও দেবী ভক্তির স্মারক। অন্ধ্র প্রদেশের স্মার্তগণ এই তিলকচিহ্ন তাঁহাদের ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন। ঈষৎ লাল শুষ্ক কদলী পুষ্পের চূর্ণ চূণের সহিত মিশাইয়া 'অক্ষত' প্রস্তুত করা হয়।

(4) শশিকলাকার ত্রিপুণ্ড্র; ইহা মহারাষ্ট্র দেশে এবং উত্তর ভারতের কোনও কোনও স্থানে স্মার্তগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

(5) 'গোপালম্' বলিয়া পরিচিত ঊর্ধ্বপুণ্ড্র; ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতে এমন স্মার্তমতাবলম্বিগণ ব্যবহার করেন, যাঁহারা প্রকৃত বৈষ্ণব না হইয়াও বিষ্ণুপূজায় বিশেষ আস্থাশীল।

(6) এই অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দনতিলকও 'গোপালম্' নামে পরিচিত; ইহা তাঞ্জোর জিলার স্মার্তগণ ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমভাবে পঞ্চ দেবতার উপাসক।

(7) দক্ষিণ ভারতীয় স্মার্তগণ দ্বারা ব্যবহৃত ডিম্বাকৃতি সহজ চন্দন-তিলক।

(8) চতুর্থ তিলকচিহ্নের সহিত সাদৃশ্যযুক্ত; তির্যক্‌পুণ্ড্র রেখাগুলির মধ্যে বৃত্তাকার চন্দনচিহ্ন ইহার বৈশিষ্ট্য। ইহা সাধারণতঃ শৈবগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(9) বড়কলইপন্থী শ্রীবৈষ্ণবদিগের তিলক। ইংরাজী "V" অক্ষরের অনুরূপ শ্বেতবর্ণ চিহ্নের মধ্যভাগস্থ ঊর্ধ্বরেখাটি সিন্দূরচর্চিত,

ও উহার নাম "শ্রীচূর্ণম"। শ্বেতবর্ণ "V" চিহ্নটির নাম "তিরুমন্ন্"।

(10) তেনকলই শাখাভুক্ত শ্রীবৈষ্ণবগণের তিলক। ইহা অনেকাংশে পূর্ববর্তী তিলকের অনুরূপ ; মধ্যরেখা উভয় চিহ্নেই এক, কেবল নীচের দিকেই পার্থক্য। ইহার নিম্নভাগ প্রশস্ততর, এবং নিম্নমধ্যভাগ স্থূল রেখাকারে নাসিকামূল পর্যন্ত বিস্তৃত।

চিত্র নং ২

(11) ভিন্ন আকারের তেনকলই নামম্ ; ইহার পার্শ্বের দুইটি শ্বেতবর্ণ রেখার পরিবর্তে দুইটি বিষ্ণুপদ চিহ্ন, এবং নিম্নাংশ পদাধাররূপে চিত্রিত পদ্মাসন। ইহা সাধারণতঃ দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণেতর মন্দিরসেবক মালাকর ইত্যাদি জাতিভুক্ত রামানুজ মতাবলম্বিগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(12) বল্লভাচারিগণের একাংশ কর্তৃক ব্যবহৃত তিলক ; ইহা ইংরাজী 'U' অক্ষরের আকারে ললাটের নিম্নভাগ হইতে কেশরেখার উপরিভাগ অবধি বিস্তৃত। গুজরাটী বৈশ্যগণ এবং চতুর্ভুজদাস ও কুশলদাস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ এই প্রকার চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন।

(13) মাধ্ব সম্প্রদায়ের তিলক ; মধ্যস্থলে বৃত্তাকার রক্তচন্দন চিহ্ন, ও উহা হইতে উর্ধ্বাধরূপে দীর্ঘায়ত কৃষ্ণরেখা।

(14) বৈষ্ণবমতাবলম্বিনী মহিলাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত রক্তবর্ণ হ্রস্ব-রেখাযুক্ত "V" আকারের শ্বেত চিহ্ন ; সম্পূর্ণ তিলকটি ইঁহারা বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

(15) সাধারণ বৈষ্ণবগণের রক্তবর্ণ শ্রীচূর্ণ তিলক।

(16) কানাড়ী, মারাঠী এবং কোনও কোনও অন্ধ্রজাতীয়া শৈব-শাক্ত মতাবলম্বিনী মহিলাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ললাটবিস্তৃত সিন্দুর-রেখাচিহ্ন।

(17) কুঙ্কুম বিন্দুসহ চন্দনাঙ্কিত একজাতীয় উর্ধ্বপুণ্ড্র ; ইহা কোনও

কোনও স্মার্ত ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন। মধ্যস্থ কুঙ্কুম বিন্দুটি শক্তিসাহচর্য প্রকাশ করে।

(18) পূর্ববর্তী চিহ্ন হইতে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির এই তিলকও শঙ্করমতাশ্রয়ী এক জাতীয় স্মার্তগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা পাশাপাশি বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থ কুঙ্কুমবিন্দুটি ডিম্বাকৃতি। ১৭নং চিহ্নটি শক্তিসাহচর্য প্রকাশ করিলেও, ঈষৎ বৈষ্ণবধর্মী, কিন্তু এই চিহ্ন বিশুদ্ধ শৈবধর্মী স্মার্তদিগের অন্যতম তিলক।

(19) কুঙ্কুমবিন্দু চিহ্ন; ইহা দেবীভক্ত স্মার্তগণ কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(20) বৃত্তাকৃতি কুঙ্কুমচিহ্ন; ইহা সর্বভারতীয়া জীবৎভর্তৃকা সুমঙ্গলী হিন্দু মহিলাগণ ললাটে ধারণ করিয়া থাকেন।

(এই রেখাচিত্রগুলি শ্রীযুক্ত সি, শিবরামমূর্তি মহাশয়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত)

চিত্র নং ৩

(1) গাণপত্য সম্প্রদায়ের তিলক (Mrs. S. C. Belnos এর *The Sandhya or the Daily Prayers of the Hindus*এ মুদ্রিত চিত্রের আদর্শে অঙ্কিত)।

(2) শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত রামানুজপন্থী বৈষ্ণবগণের তিলক।

(3) ঐ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির।

(4) ঐ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন আকারের।

(5) শ্রীসম্প্রদায়ের বড়কলই শাখার একপ্রকার তিলক।

(6) ঐ, কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকৃতির।

(7) শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তেনকলই শাখার নামম্।

(8) ঐ, ঈষৎ ভিন্ন প্রকারের।

(9) রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত একজাতীয় বৈষ্ণবগণের তিলক।

(10) মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের তিলক।

(11) ঐ, ভিন্ন আকারের।

(12) রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বারকাবাসী এক শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের তিলক। (এই চিত্রের ২ হইতে ১২ সংখ্যক তিলক D. A. Pai মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যস্থ চিত্রাদির আদর্শে অঙ্কিত)

চিত্র নং ৪

(13) রামানন্দ শিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বারকাবাসী এক শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ দ্বারা ব্যবহৃত তিলকচিহ্ন।

(14) জানকীর উপাসক এক শ্রেণীর রামায়ৎ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সাম্প্রদায়িক চিহ্ন।

(15) নিম্বার্ক প্রতিষ্ঠিত সনকাদি সম্প্রদায়ের তিলক।

(16) বল্লভাচারী বা রুদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের একজাতীয় তিলক।

(17) ঐ,—ভিন্ন প্রকৃতির।

(18) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিলকচিহ্ন।

(19—22) রামায়ৎ বৈষ্ণবদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিলক।

(23) তান্ত্রিক শৈব তিলক,—অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয়।

(24) তান্ত্রিক শৈব চিহ্ন,—ত্রিপুণ্ড, অর্ধচন্দ্র ও বিন্দুর সমন্বয়।

(25) শৈব তিলক—বিল্বপত্রাকৃতি।

(26) ঐ,—একজাতীয় প্রস্তর গুটিকাকৃতি।

(27) ঐ,—অর্ধচন্দ্রাকৃতি।

চিত্র নং ৫

(28) মহাকালীপূজক শাক্ত তিলক।

(29) দক্ষিণাচারী তান্ত্রিক শাক্ত সম্প্রদায়ের তিলক।

(30) বামাচারী তান্ত্রিক শাক্ত উপাসকগণের তিলক।

(31, 32) শিব-শক্তি উপাসকগণের তিলক।

(33) শৈব—ত্রিপুণ্ড্র।

(34) এক শ্রেণীর শৈব তিলক।

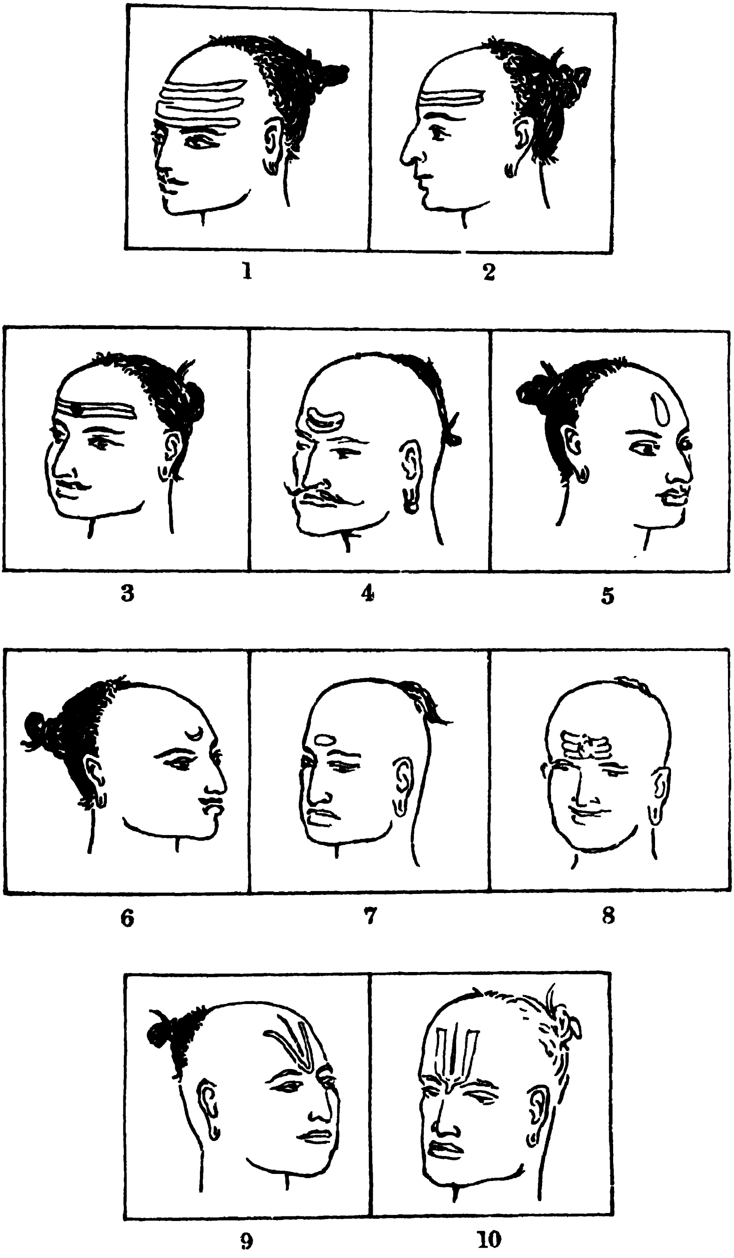
(35—38) ত্রিপুণ্ড্র ও বিন্দু ইত্যাদি সম্বলিত শৈব-স্মার্ত তিলক। ইহাদিগের সহিত প্রথম চিত্রের তৃতীয় চতুর্থ ও অষ্টম সংখ্যক চিহ্নের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

(39) শিবের তৃতীয় নয়নের অনুকৃতি,—ইহা এক শ্রেণীর শৈবগণ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

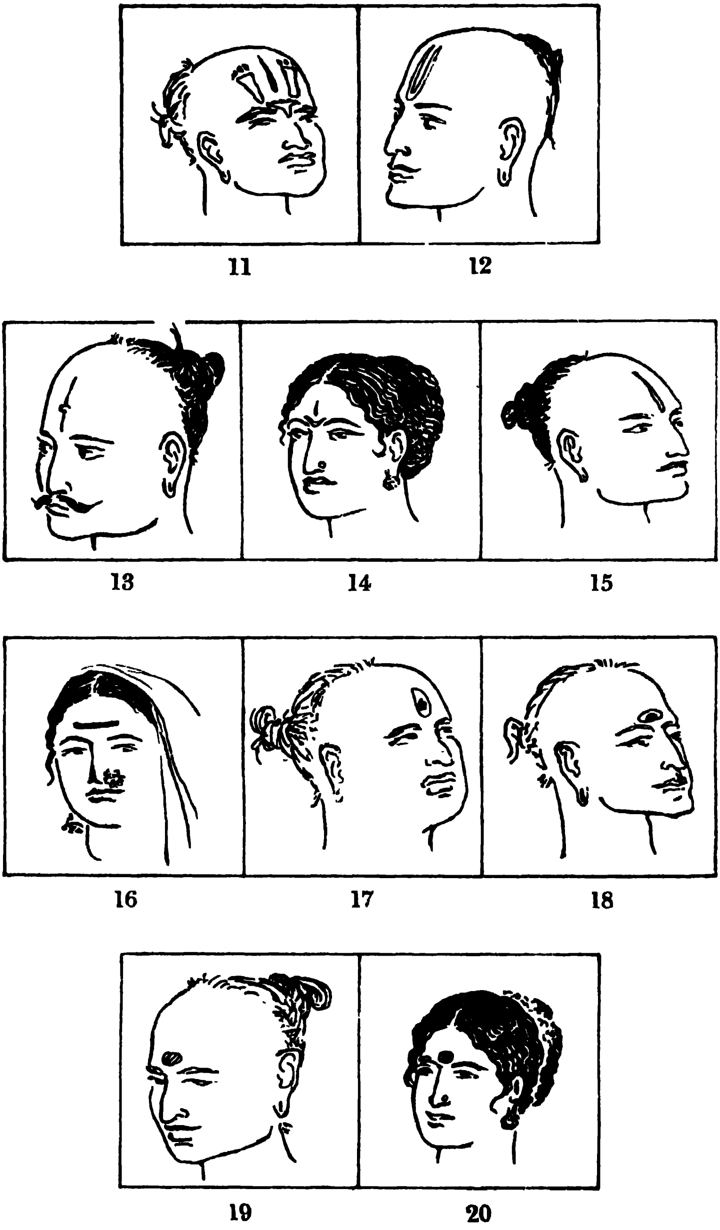
(40, 41) এই দুইটিও শৈব তিলক,—প্রথমটি কতকটা বিষাণাকৃতি ও দ্বিতীয়টি বিন্দু ও অর্ধচন্দ্রের সমন্বয়াত্মক।

(42) সৌর সাম্প্রদায়িক চিহ্ন।

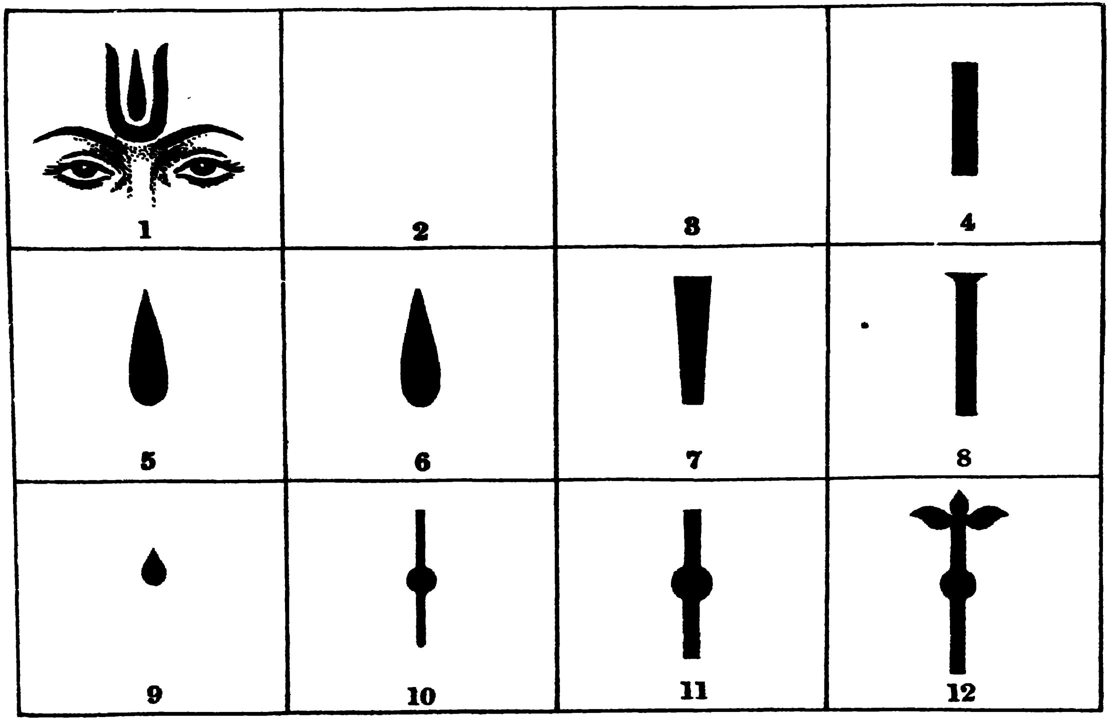
(চতুর্থ ও পঞ্চম চিত্রদ্বয়ের তিলকচিহ্নগুলির প্রায় সব কয়টিই D. A. Pai মহাশয়ের *Religious Sects in India among the Hindus* নামক গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রাবলীর আদর্শে অঙ্কিত। 42 নং চিত্রটি Mrs. S. C. Belnos এর পূর্বোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের আদর্শে অঙ্কিত। আমি এজন্য উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের প্রকাশকগণের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।)



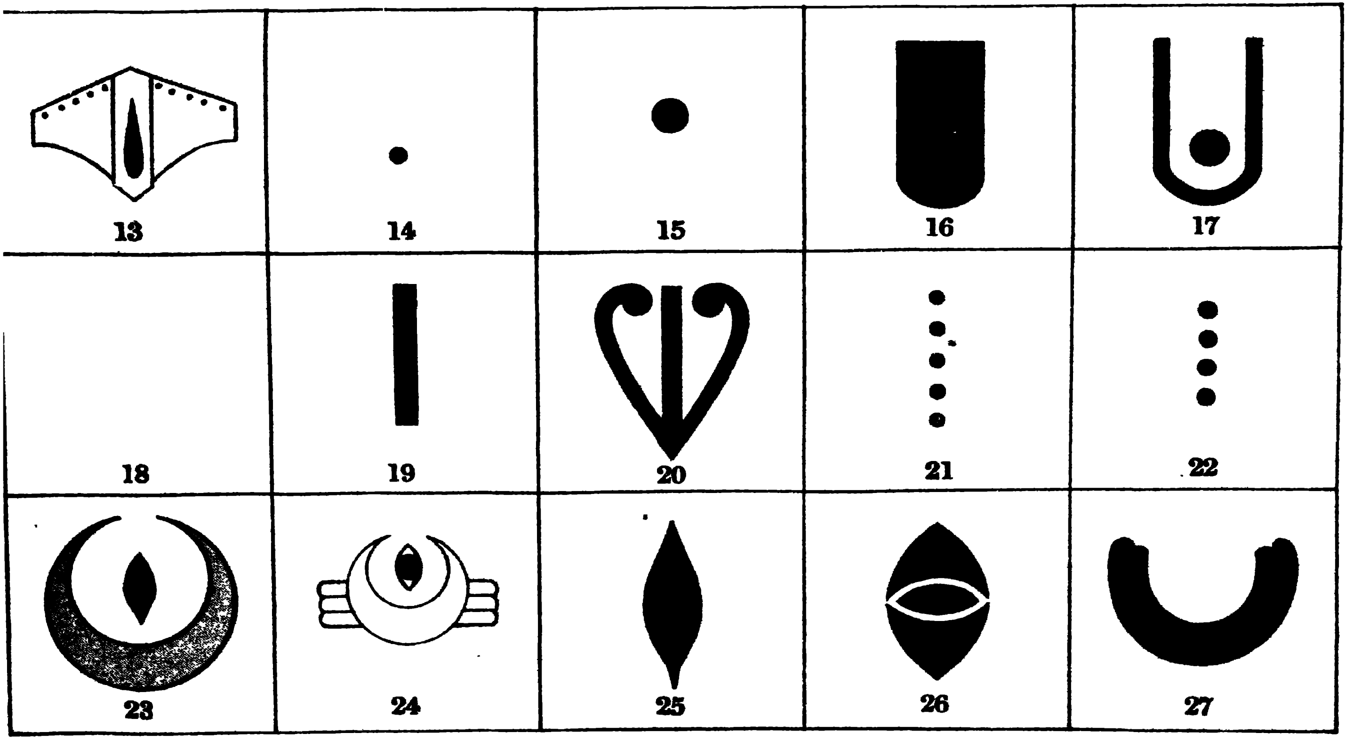
চিত্রসংখ্যা ১



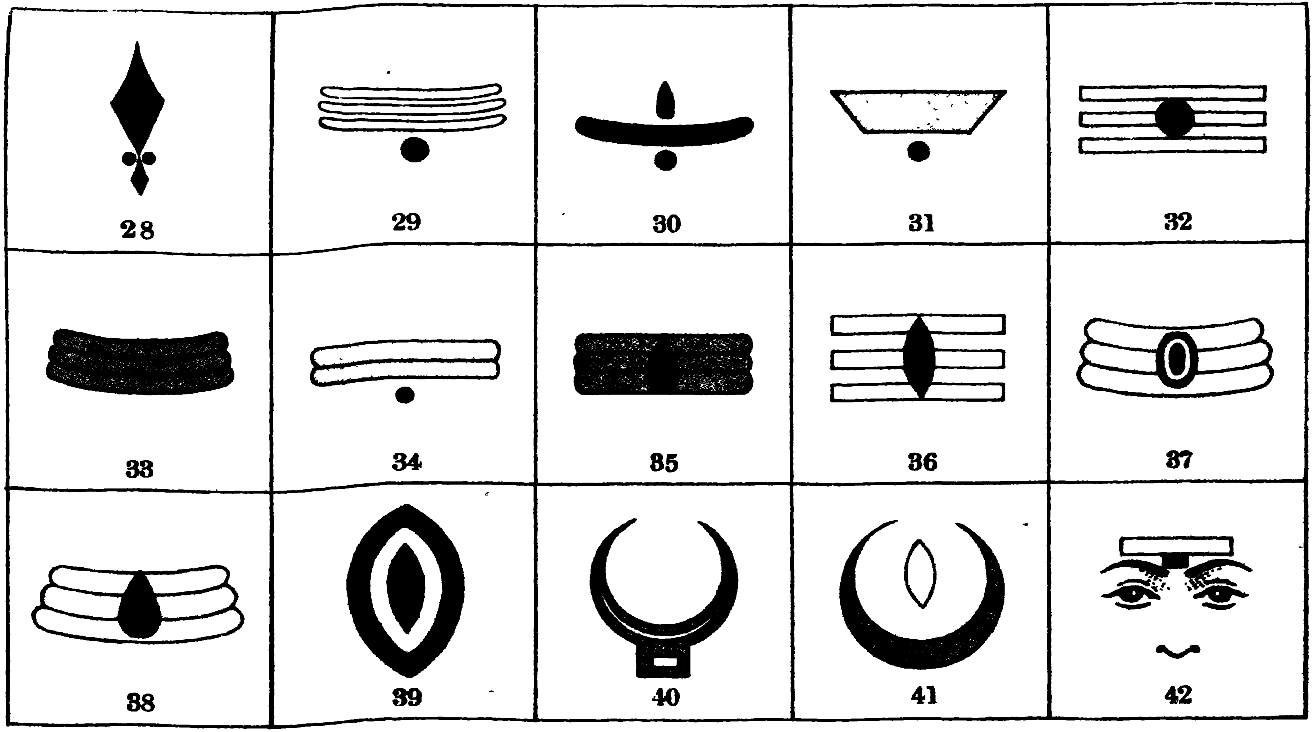
চিত্রসংখ্যা ২



চিত্রসংখ্যা ৩



চিত্রসংখ্যা ৪



চিত্রসংখ্যা ২

শব্দসূচী

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

খ

গ

থ

দ

ধ

ন

ফ

ব

ভ

ম

য

র

ব

শ

হ

ক্ষ